মন

ডা. মোহিত কামাল

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

মনোচিকিৎসক ও কথাশিল্পী ডা. মোহিত কামালের ভিন্ন রকম উপন্যাস 'মন'। সাহিত্যের শব্দ গাঁথুনিতে তিনি ব্যবহার করেছেন মনস্তাত্ত্বিক উপাদান। মনোবিজ্ঞানের কলকব্জায় চড়ে উপন্যাসের জীবনধারা বিস্তৃত হয়েছে, মনের সাহিত্য রচিত হয়েছে। ভালোবাসায় পূর্ণ জীবনে ফাটল তৈরি হয়। বদলে যায় মনের গতি-প্রকৃতি। বিপর্যয় নেমে আসে, সুখি পরিবারের ভিত ভেঙে যেতে থাকে। ভুল বোঝাবুঝি, সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং ক্রোধের আগুনে পুড়তে থাকে মন। পুড়তে থাকে দেহ। ঝলসে যায় সামাজিক সমৃদ্ধি।

সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যা চিত্রনের আলোকে মোহিত কামাল তুলে ধরেছেন জীবন যন্ত্রণার গোপন হাহাকার। ভালোবাসার গোপন শক্তিকে তিনি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সমাজ সংস্কারের জন্য নৈতিকতা ব্যবহার করেছেন বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে। উপন্যাসের শব্দ বিন্যাসের ধাপে ধাপে মনোথেরাপির বিষয়-আশয় ব্যবহার করে চরিত্রগুলোর ভেতরগত শুদ্ধির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। পাঠকের সামনে উন্মোচিত হবে সামাজিক দগদগে ঘা নিরাময়ের কৌশল। সাম্প্রতিক জীবন ধারায় মোবাইল ফোনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এটির সুফলের পাশাপাশি ভয়াবহ কুফল প্রত্যক্ষ করেছেন মনোচিকিৎসক। সমাজের নারী পুরুষের মধ্যে গেঁড়ে বসতে চলেছে মারাত্মক ধরনের ক্ষত। একজন প্রফেশনাল মনোচিকিৎসক হিসেবে সমাজকে তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সমস্যার গভীরতা। মোবাইল শব্দ তরঙ্গ হানা দেয় নারী পুরুষের শয়ন কক্ষে। আলোড়িত হয় মন। আলোড়িত হয় দেহ, যৌনতার গোপন কক্ষে নামে ঢল । গড়ে উঠে পরকীয়া, সর্বনাশ হয়ে যায় পারিবারিক আবহ। অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় সন্তানের ভবিষ্যৎ। মা-বাবার অনৈতিক স্খলনের কারণে সন্তানের ব্যক্তিত্বের কাঠামোয় গেঁড়ে বসে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য। অনিয়ন্ত্রিত হয় আচরণ ও মেজাজ। বেড়ে যায় তাদের মাদকাসক্তির ঝুঁকি।

একজন পুরুষের মধ্যে থাকে পুরুষ সত্ত্বা। থাকে পিতৃসত্ত্বা। নারীর মধ্যে থাকে নারীত্বের আদিম শেকড়ের টান, থাকে মাতৃত্ববোধ। মাতৃসত্ত্বার ঔজ্জ্বল্যে ম্লান হয়ে যায় আদিমটান। বিজয় হয় মাতৃত্বের। বিজয় হয় পিতৃত্বের। বিজয় হয় তরুণ তরুণীর ভালোবাসার।

'মন' উপন্যাস শেষ হওয়ার পর মনোবিশ্লেষণ দেখা যাবে ভিন্ন একটি অধ্যায়ে। এই অধ্যায় পাঠে পাঠক দেখতে পাবেন মনোসামাজিক ব্যবচ্ছেদ, বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত হবে পাঠকের চোখ। সমৃদ্ধ হবে মন।

প্রচ্ছদ : রাজীব নূর

মনের সাহিত্য মনের বিজ্ঞান

মন

একটি মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস

ডা. মোহিত কামাল

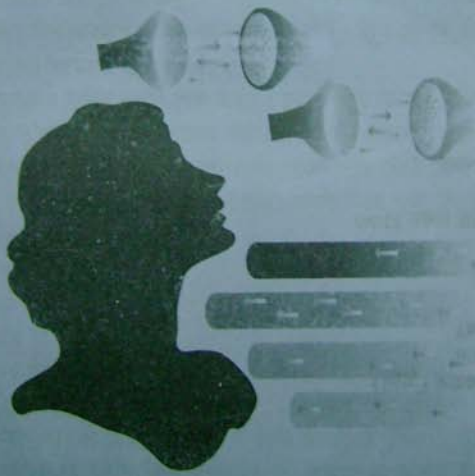

বিদ্যা প্রকাশ

প্রকাশক
মজিবর রহমান খোকা
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬
স্বত্ব
জিনদনি মযূখ (স্বচ্ছ)
মাহবুব মযূখ বিশাদ
ডা. মাহফুজা আখতার (মিলি)
প্রচ্ছদ
রাজীব নূর
বর্ণবিন্যাস
শাওন কম্পিউটারস্
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
দাম
দুইশ' টাকা
ISBN 984-422-212-1

উৎসর্গ

তখন আমি চট্টগ্রামে।

ঢাকায় এলে সপরিবারে মাঝে মাঝে তাঁর বাসায় উঠি।

আমরা আসবো বলে টাকি মাছের ভর্তা করে রাখেন, পুঁই শাকের কচি ডাটা দিয়ে ইলিশ মাছ রেঁধে রাখেন।

যখন পিজি হাসপাতালের হোস্টেলে, প্রায়ই ডাক পেতাম, ভালো কোনো আইটেম রান্না হলে, খবর পাঠাতেন। ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মিলে দল বেঁধে খেয়ে আসতাম।

প্রতি বছর বাংলা একাডেমির একুশে বইমেলায় লেখক-প্রকাশক-পাঠকের মিলন মেলা বসে। আমরা বিদ্যাপ্রকাশের স্টলে বসে আড্ডা দেই। প্রিয় লেখক, প্রিয় শিল্পী, অনেক প্রিয় পাঠক সেই আড্ডায় হাজির থাকেন।

আমাদের আড্ডায় মজার মজার পিঠা আসে। ভুনা খিচুড়ি আসে। বিরিয়ানী আসে। নিজ হাতে রেঁধে দু'হাতে ঢাউস সাইজের ক্যারিয়ার নিয়ে দোয়েল চত্বর, টিএসসি মোড় কিংবা একুশে ফেব্রুয়ারির দিন শাহবাগ মোড় থেকে পায়ে হেঁটে মেলা চত্বরে আসেন। নিজ হাতে সবাইকে খাবার পরিবেশন করেন। সবাই মিলে খাই, উল্লাসে কাটাই সময়। তাঁর মুখে লেগে থাকে স্বতঃস্ফূর্ত হাসি।

তিনি প্রিয়'র মা

তিনি দ্বিতীয়া'র মা

তিনি মাল্টা'র মা

তিনি মজিবর রহমান খোকা'র স্ত্রী।

তিনি নেই। চলে গেছেন। অসময়ে আচমকা তাজা প্রাণ ঝরে গেছে।

কী অবিশ্বাস্য সত্য! কী বিস্ময়! হায় কতো ছোট আমাদের জীবন!

এবারের একুশে বইমেলায় তিনি থাকবেন না। বইমেলায় আমরা সবাই তাঁকে স্মরণ করছি, শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

তিনি আমাদের প্রিয় ভাবী, সবার প্রিয় মানুষ– **নাসরিন সুলতানা**

ভূমিকা

'উপন্যাসের পূর্বে একটি বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি বসিয়ে দিয়ে কি উপন্যাসের মূল ধারায় শেকল পরানো হলো না?'

'মন' উপন্যাসটি প্রকাশের পূর্বে আড্ডার টেবিলে প্রশ্নটি করেছেন একজন গুণী পাঠক। একজন বই সমালোচক। প্রশ্নটির উত্তরে বলতে চাই, ইতিপূর্বে নিরীক্ষাধর্মী কিছু কাজ করেছি আমি। 'গল্পবিজ্ঞান' শব্দটি চালু করেছি। ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে মনের বিজ্ঞান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

সমালোচকরা বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন 'মনের সাহিত্য মনের বিজ্ঞান' হিসেবে।

মন নিয়ে কাজ করি। প্রফেশনাল ফিল্ডে বিশেষজ্ঞ মনোচিকিৎসক হিসেবে প্রতিদিন দেখতে পাই মানব মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা অবিশ্বাস্য কষ্ট, দহন যন্ত্রণা কিংবা গোপন ভালোবাসার আলো আঁধার। এভাবে জীবন খোঁড়া মনের সাহিত্য রচনা করার সহজ চিত্র দেখতে পাই। আমার লেখা কয়েকটি বই– মানব মনের গতি-প্রকৃতি (বিদ্যাপ্রকাশ), মনোসমস্যা মনোবিশ্লেষণ (অবসর), কিশোর-কিশোরীর মনে ঝড় (সময় প্রকাশন), মানব মনের উদ্বেগ ও বিষণ্নতা (বিদ্যাপ্রকাশ) ইত্যাদি বইতে ইতিমধ্যে 'গল্পবিজ্ঞান' ধারাটির পাঠকপ্রিয়তা দেখতে পেয়েছি। এছাড়া গল্পের বই, কাছের তুমি দূরের তুমি (সময় প্রকাশন), জোছনারাতে বাড়িয়েছি হাত (সময় প্রকাশন), বই দু'টির অন্তর্নিহিত বক্তব্যের মধ্যেও রয়েছে মনের কলকব্জার নানান রকম শাখা-প্রশাখা।

অনেক পাঠক, সমালোচক এবং কয়েকজন প্রকাশক উৎসাহ দিয়েছেন 'মনের সাহিত্য মনের বিজ্ঞান' লেখালেখি করতে। সবার উৎসাহে 'মন' লেখা সম্ভব হয়েছে, মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাসটি দাঁড় করাতে পেরেছি।

'মন' পড়তে গিয়ে পাঠক একটি নির্মল উপন্যাসের স্বাদ পাবেন বলে বিশ্বাস করি। পাঠক হয়ত টেরই পাবেন না যে মনস্তত্ত্বের কলকব্জার বুনোটে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। পাঠক দেখতে পাবেন ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পারিবারিক পরিবেশ, নিত্যদিনের অফিসের চিত্র, আড্ডায় রসালো সংলাপ, জীবন যন্ত্রণার কঠিন আর্তনাদ, মোবাইল কালচার এবং সাম্প্রতিক বদলে যাওয়া জীবনের গতি-প্রকৃতি, পরকীয়ার ছোবল। দেখতে পাবেন মাতৃত্বের জয়, পিতৃত্বের জয়, দুর্বিষহ জীবনের পচা গর্ত থেকে তুলে আনার বিজয়। মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দুর্বিনীত প্রতিজ্ঞা। জয়, বন্ধুত্বের জয়। সর্বোপরী দেখতে পাবেন ভালোবাসার জয়।

উপন্যাসটি শেষ হওয়ার পর আলাদা একটি অধ্যায়ের সংযোজন পাবেন পাঠক। 'মনোবিশ্লেষণ-মনোসামাজিক ব্যবচ্ছেদ' চিত্রে চরিত্রগুলোর মনোজগতের সূক্ষ্ম বিষয়-আশয়গুলো বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। মনের বিজ্ঞান এখানে স্পষ্ট হবে। মনোথেরাপির কলাকৌশলের মাধ্যমে মনের জটিলতা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের চিকিৎসার ব্যাখ্যায় পাঠক মন আলোড়িত হবে বলে বিশ্বাস।

এতোসব কারণে উপন্যাসের পূর্বে মনোবৈজ্ঞানিক শব্দটি ব্যবহার করেছি। বিষয়টি নিয়ে পাঠকের মতামত, সমালোচনা লেখকের উৎসাহের পথ প্রশস্ত করবে।

সবার জন্য ভালোবাসা।

ডা. মোহিত কামাল
১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

লেখকের প্রকাশিত বই

মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস মন ঃ (২০০৬)– বিদ্যাপ্রকাশ

মানবমন : মানব মনের গতি-প্রকৃতি (গল্পবিজ্ঞান) (২০০১)– বিদ্যাপ্রকাশ

: মানবমনের উদ্বেগ ও বিষণ্নতা (২০০৫)– বিদ্যাপ্রকাশ

শিশুর মন : শিশুর মনোজগৎ, শিশুর সৃজনশীল বেড়ে ওঠা (২০০২)– বিদ্যাপ্রকাশ

: শিশুর বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি, কীভাবে ধারালো করা যাবে (১৯৯৯)– বিদ্যাপ্রকাশ

গবেষণা : The Mind of War-Injured Freedom Fighters of Bangladesh (2001)– বিদ্যাপ্রকাশ

স্বাস্থ্য : ব্রেইন অ্যাটাক, অনিদ্রা ও মাথাব্যথা (২০০০)– বিদ্যাপ্রকাশ

মন : মনোসমস্যা মনোবিশ্লেষণ (গল্পবিজ্ঞান) (২০০৫)-অবসর।

গল্প : কাছের তুমি দূরের তুমি (১৯৯৫)– সময় প্রকাশন

: জোছনা রাতে বাড়িয়েছি হাত (২০০১)– সময় প্রকাশন

শিশু-কিশোর সাহিত্য : হুমায়ূন আহমেদের সমুদ্র যাত্রায় অদ্ভূত এক মাছের কাণ্ড (২০০৩)– সময় প্রকাশন

কিশোর-কিশোরীর মনস্তত্ত্ব : কিশোর-কিশোরীর মনে ঝড় (২০০৪)– সময় প্রকাশন

আমার একার বলে কিছু নেই। আমার যা আছে সব তোমার। বুঝেছ?

কথা শেষ করে চট করে ঘুরে দাঁড়ায় মীরান। জানালার পর্দা সরিয়ে বাহিরে তাকায়।

বাহিরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঝরছে, একটানা বৃষ্টি। যেন শ্রাবণের কান্না। দু'দিন ধরে এই ধারা ঝরছে। অথচ কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ চলছে। প্রকৃতিতে হেমন্তের হিম থাকার কথা, শিশির ঝরার কথা। হিম নেই, শিশির নেই। তবে মীরানের ঘরের পরিবেশ হিম হয়ে আছে। ধোঁয়াটে হয়ে আছে।

কারিনা চুপ হয়ে আছে। মুখে নির্মম অভিব্যক্তি। স্বামীর কথায় মন ভরছে না। কোনো কথাও বলছে না। ক্ষুব্ধ চোখে বেড রুমের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। বুকের মাঝে জমাট বেঁধেছে লঘুচাপ।

প্রকৃতিতে হিম থাকার কথা থাকলেও কারিনার চোখ থেকে ঝরছে আগুন। কখন পানি ঝরবে বলা যাচ্ছে না। মীরান স্ত্রীর দিকে একবার তাকায়। দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে নেয়। বাথরুমের দিকে এগোতে থাকে। আর একবার ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছেটাকে হল্ট করায়। বাথরুমে ঢুকে বসে থাকে।

নতুন এপার্টমেন্টে উঠেছে তারা। কথা ছিল দু'জনের নামে রেজিস্ট্রেশন হবে। কথা রাখে নি মীরান। নিজের নামেই রেজিস্ট্রেশন করেছে। কারিনা তাই ক্ষুব্ধ। ভীষণ ক্ষুব্ধ। ছেলেমেয়ের সামনে এই ক্ষুব্ধতা দেখায় নি সে। এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে ওদের সংসার। একজন পাশের বাসায় গেছে। একজন বাহিরে। এই সুযোগে কারিনা স্বামীর ওপর ক্রোধের আগুন ছড়িয়ে দেয়।

দেয়ালের দিক থেকে চোখ ঘোরায় সে। মীরান নেই। আরো ক্ষেপে ওঠে কারিনা। দেখতে বলিউড নায়িকা কারিনার মতো। মেজাজেও যেন এক জীবন্ত বলিউড নায়িকা এখন মীরানের বেডরুমে ঢুকে বসে আছে।

চেয়ার থেকে উঠে বাথরুমের সামনে আসে। দরজায় সজোরে লাথি দেয় কারিনা। দরজা ভেজানো ছিল। খুলে যায় এক লাথিতে। পায়ে চোট লেগেছে। সেদিকে খেয়াল নেই। ক্রোধান্ধ গলায় বলে, বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসো।

আয়নায় ক্রিমিনাল মুখটি না দেখে আমাকে দেখো। বলো, কথা রাখো নি কেন? পেটে পেটে কি দূরভিসন্ধি লুকিয়ে রেখেছ?

পেটে কোনো দূরভিসন্ধি থাকে না। থাকে মনে। চটুল হাসি মুখে জবাব দেয় মীরান।

হাসিমুখের জবাব উদ্যত ফণার ছোবল আরো বাড়িয়ে দেয়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসো। প্রশ্নের জবাব দাও। নইলে আজই ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে যাবো আমি।

ছেলে মেয়ে নিয়ে যাবে মানে? ওদের কি দোষ?

ওদের দোষ নেই। দোষ তোমার।

আমার বাড়ি তো তোমারও বাড়ি। আমাদের সন্তানরা এর উত্তরাধিকারী। আমার দোষ হবে কেন?

কথা বাড়িয়ো না। উত্তর পাশ কেটে যেও না। আসল কথা বলো।

আসল কথা আবার কি? যা বলছি তাই তো আসল। নকল বলে তো কিছু নেই।

তাহলে রাত জেগে কার সাথে ফুসুর ফুসুর মোবাইলে কথা বলো। এমন রোমান্টিক এসএমএস আসে কার কাছ থেকে?

প্রশ্ন শুনে চট করে ধাক্কা খায় মীরান। তবুও স্বাভাবিক থাকে। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, বাহ্ কেউ রোমান্টিক এসএমএস পাঠালে আমার দোষ কি? তার সাথে বাড়ি রেজিস্ট্রেশনের কী সম্পর্ক?

সম্পর্ক আছে। তোমরা সব পারো। সব পুরুষ এক রকম। মধ্যবয়সের পর সবার ভীমরতি হয়। টীনএজের দিকে চোখ যায়। আবেগের বশে সব কিছু লিখে দেয় তখন।

এবার উচ্চস্বরে হো হো করে হেসে ওঠে মীরান। হাসির দাপটে কারিনার রাগ চাপা পড়ে যায়।

ক'জন পুরুষের সাথে তোমার সম্পর্ক? ক'জন পুরুষ দেখেছ? তুমি তো একজন পুরুষ ছাড়া আর কাউকে চেনো না। সে হচ্ছে আমি। ভবিষ্যতের কথা জানো কীভাবে? কীভাবে বলতে পারো ফ্ল্যাট অন্যের নামে লিখে দেবো। তোমার টীনএজের সময় কেউ লিখে দিয়েছিল নাকি?

কেউ ঠেকে শেখে। কেউ অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শেখে। আমি অন্যের অভিজ্ঞতা দেখে সচেতন হয়েছি।

একটু বেশি সচেতনতা নয় কি?

না। বেশি না। যথেষ্ট কারণ আছে।

কী কারণ? মীরান হাসিমুখে জানতে চায়।

কারিনার রাগ সামলে উঠেছে। কথা চালিয়ে যেতে পারলে, প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারলে, হাসি মুখে কৌতুক করতে পারলে ওর রাগ কমানো যায়, জানে মীরান। আজ সেই জানা কৌশলটি ব্যবহার করছে।

ইদানিং তুমি আমার প্রতি নজর দাও না। আমি ঘুমিয়ে গেলে তোমার মোবাইল বাতিক বেড়ে যায়। মধুর স্বরে কথা বলো। একদম প্রেমালাপ। শুনেছি আমি। নিজের কানে শুনেছি। তোমাকে বলি নি যে শুনি আমি। সতর্কতার জন্য বলেছিলাম, ফ্ল্যাটটি দু'জনার নামে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

ওহ। তাহলে আমার প্রয়োজন নেই। আমি অন্যের সাথে ইয়ে চালিয়ে যেতে পারবো। তোমার ফ্ল্যাট হলেই চলবে। এই কথা? হাসতে হাসতে বলে মীরান।

এই কথা হবে কেন? এটা হচ্ছে নির্ভরতা। সম্পর্কের মাঝে নির্ভরতার ব্যাপার থাকতে হয়। নিজের অধিকার জোরালো রাখতে হয়। তুমি সেই জোরালো অধিকার হরণ করেছ। এতোই যদি সাধু হয়ে থাকো তাহলে গোপনে কেন ফ্ল্যাটটি নিজের নামে করলে?

বিষয়টি খেয়ালে রাখি নি। রেজিস্ট্রেশনের সময় মনে ছিল না। এ কারণেই করেছি।

না। এটা তোমার অজুহাত। অন্য কোনো কারণ আছে। বলো, পেটে পেটে কী ইচ্ছে লুকিয়ে রেখেছ? আবার বললো কারিনা।

অবশ্য আরো একটি বিষয় বোধ হয় অবচেতনে কাজ করেছে, যেভাবে হুটহাট সুটকেস নিয়ে বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে দৌড় দাও। ভরসা করতে পারি না তোমাকে। এজন্য আমার নামে রেজিস্ট্রেশন। আমার নামে মানে তোমাদের নামে। বুঝলে?

বোঝার দরকার নেই। আমি আজই চলে যাবো নিজেদের বাড়িতে। তোমার করুণায় বেঁচে থাকার অর্থ নেই।

বাবা-মার সমস্যা বাড়তে থাকলে সন্তানের কী ধরনের ক্ষতি হবে জানো না?

সমস্যা আমি বাড়াই নি, বাড়িয়েছ তুমি। পাশের বাসায় আছে কর্নী। রূপক ফিরলে ওদের নিয়ে আজই সে এ ফ্ল্যাট ত্যাগ করবে। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয় কারিনা।

সমস্যা যেই বাড়াক না কেন? বাচ্চাদের ক্ষতি হবে। এটি তো মাথায় রাখতে হবে।

তুমি রাখো মাথায়। আমি আজ ওদের নিয়ে চলে যাচ্ছি।

ওদের দেবো না আমি। মীরান দৃঢ় স্বরে কথাটি বললো।

ঘুরে দাঁড়ায় কারিনা। ওদের দেবার তুমি কে?

আমি ওদের বাবা।

আমি ওদের মা। দেখি ওরা কার কাছে থাকে? দেখি কার সাথে যেতে চায়?

কারিনার আত্মপ্রত্যয়ী জবাব শুনে শীতল হয়ে যায় মীরান। জানে, ছেলেমেয়ে দু'টি মা ছাড়া কিছু বোঝে না। এক পায়ে খাড়া হয়ে যাবে মার সাথে যাবার জন্যে। নিজের প্রতি বিশ্বাস ক্ষীণ। যদিও নিজের মনে সন্তানদের জন্য মায়ার ঘাটতি নেই, ভালোবাসার কমতি নেই। তবুও বাচ্চারা মা ন্যাওটা। মা ছাড়া কিছু বোঝে না। এ প্রতিযোগিতায় নিশ্চয় হেরে যাবে মীরান। ভেবে কাতর হয়ে যায় মন। শীতল হতে থাকে, পরাজিত হতে থাকে। মীরানের এই পরাজয় টের পায় না কারিনা। তার ভেতর এখন কাজ করছে ক্রোধ, ক্ষোভ। উগ্র আচরণের বিস্ফোরণ ঘটছে। এই বিস্ফোরণের জন্য কি মীরান দায়ী? নাকি দায়ী বাস্তবতা। মীরানের আচরণ? নাকি কারিনার আচরণ? ফ্ল্যাটটি কেনার অর্থ উপার্জন করতে জীবনের ঘাম ঝরিয়েছে মীরান। বউ সন্তানদের জন্য সব করা। এখন মনে হচ্ছে জীবনের প্রধান শত্রু হচ্ছে নতুন ফ্ল্যাটটি।

হায়! মানুষ চায় কী, হয় কী।

ইন্টারকম বেজে ওঠে।

কারিনা পাশের বাথায় চলে গেছে। মীরান ইন্টারকমের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আবার বেজে ওঠে ইন্টারকম।

কাজের বুয়া শেলী দ্রুত এসে তুলে নেয় রিসিভার।

নিচ থেকে সিকিউরিটি গার্ড ফোন করেছে। একজন মেহমান এসেছেন। নতুন মেহমান। আগে কখনো আসে নি। বাথায় আসার অনুমতি চাচ্ছেন।

শেলী রিসিভারটি মীরানের হাতে তুলে দেয়।

হ্যালো, কে এসেছে? মীরান জানতে চায়।

শ্বশুরের দেশের বাড়ি থেকে এসেছেন। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। গার্ড বললো।

সম্পর্কে কী হয়?

জ্বি, উনি বলছেন শ্বশুরের চাচা হন। দেশের বাড়িতে থাকেন। চিকিৎসার জন্য ঢাকায় এসেছেন।

কী নাম, জিজ্ঞেস করেছ?

জ্বি, সালামত মাওলা।

পাঠাও। দ্রুত পাঠিয়ে দাও। আর শোনো, লিফটে ঢুকে তুমি বাটন টিপে দিও। আমি পঞ্চম তলায় লিফটের মুখ থেকে রিসিভ করবো।

আচ্ছা। বলেই লাইন কেটে দেয় গার্ড।

মীরান এখনো রিসিভার রাখে নি। মনে মনে খুশি হয়। যাক এই মুহূর্তে ক্রাইসিস সামাল দেওয়া যাবে। নিজেদের আত্মীয় স্বজন কেউ এলে কারিনার মুখ আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। সব রাগ ক্ষোভ ভুলে যায়। চাচাজানের সামনে সে নিশ্চয় আর মেজাজ দেখাতে পারবে না। ভেবে স্বস্তি পায়।

শেলী।

জ্বি, খালুজান।

শোনো, পাশের বাসায় যাও। দ্রুত তোমার খালাম্মাকে, রুনিকে নিয়ে এসো। আমার চাচা শ্বশুর আসছে। বলো গিয়ে।

জ্বি। শেলী বাসা থেকে বের হয়।

মীরান বেড রুমে আসে। হ্যাঙ্গার থেকে একটি পাঞ্জাবি টেনে পরে নেয়। চুল আঁচড়ে নেয়। সুবোধ বালকের মতো এগিয়ে যায় লিফটের দিকে।

টুং করে শব্দ হয়। লিফট পঞ্চম তলায় উঠে এসেছে। খুলে গেছে লিফট।

একি? একজন সুন্দরী মহিলা নামছে। কাকে রিসিভ করতে এলো সে? পারফিউমের গন্ধ ছড়িয়ে মৃদু হেসে মহিলাটি চলে গেল পাশের ফ্ল্যাটের দিকে।

মীরান নিজেকে সামলে নেয়। এ মুহূর্তে মাথা দখল করে আছে চাচাজান। আল্লাহ নিশ্চয় দুর্যোগের সময় চাচাজানকে প্রেরণ করেছেন।

লিফটে ঢুকে গ্রাউন্ড ফ্লোরের বাটন টিপে সে। নিচে নেমে দেখে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। বয়স পঞ্চাশের ওপর। কালো চিটচিটে মুখ। মাঝারি পাঞ্জাবি গায়ে। হাতে একটি পুরনো ব্যাগ। গার্ড পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনিই কি জনাব সালামত মাওলা?

জ্বি। ঘতমত হয়ে জবাব দিলেন চাচাজান।

টুপ করে পায়ের কাছে বসে পড়ে মীরান। কদমবুচি করে উঠে দাঁড়ায়।

আমি মীরান। আপনার ভাজতি জামাই।

ওহ। বেঁচে থাকো বাবা। তোমার কথা শুনেছি কতো। দেখি নি, আমাদের কারিনা মা-জানকেও ছোট বেলায় দেখেছি। আর দেখা হয় নি। গ্রামে থাকি, বিয়েতেও আসতে পারি নি।

কোনো অসুবিধে নেই চাচাজান। আসেন, বাসায় আসেন। বলতে বলতে ব্যাগটি হাতে নেয় মীরান। লিফটে ঢুকে পাশাপাশি দাঁড়ায়।

একটু আগে পেয়েছে পারফিউমের গন্ধ। এখন নাকে ঢুকছে অজানা এক গন্ধ। বমি আসতে চায় মীরানের। নিজেকে আবারও সামলে নেয়। নিজে কখনও কাউকে কদমবুচি করে না। কারুর ব্যাগ নিয়ে নিচ থেকে রিসিভ করে না।

আজ ভিন্ন কথা। ব্রেইন ভিন্নভাবে নিজের ভেতর গতি তৈরি করে দিয়েছে। এই গতির টানে দুর্গন্ধ ও সুগন্ধীতে বদলে গেছে। নিজের ভেতর থেকে অলৌকিক এক আন্তরিকতার জোয়ার আসছে। এই জোয়ারে বেশি বেশি করে ফেলছে মীরান। নিজেও যেন নিজেকে বুঝতে পারছে না। আসলে কি মীরান চরিত্রটি এমন? পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কী মানুষ এমন বদলে যেতে পারে?

বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না মীরান।

টুং করে শব্দ হয়ে লিফট খুলে যায়।

পঞ্চম তলার খোলা বারান্দায় চলে এসেছে ওরা। সামনে সারিসারি ফুলের টব। সালামত মাওলা অবাক হয়ে ফুলের টব দেখছে। পঞ্চম তলার বারান্দা যেন একটি ফুলের বাগান। টবের মাটিতে স্যাঁতস্যাতে পানি। এই পানিতে ডেঙ্গু মশার জন্ম হয়। বড়লোকী জ্বর হচ্ছে ডেঙ্গুজ্বর। বড়লোক পাড়ায় বাস করে ডেঙ্গু মশা। সালামত মাওলা অবাক হয়ে একবার স্যাঁতস্যাঁতে মাটির দিকে তাকায়। গ্রামে থাকলেও পত্রিকায় ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে হৈচৈ -এর খবর পড়েছে। ফুলের টব সরানোর জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের খবরও জানা স্কুল টিচার সালামত মাওলার। তবুও এতো টব! মাথায় কিছু ঢুকতে চায় না। সৌন্দর্য দেখে তিনি এর কুফল ভুলে যান। ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আচমকা পাশের ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে কারিনা। সাথে রুনি। বেরিয়ে দেখে ব্যাগ হাতে মীরান বাসায় ঢুকছে। পাশে একজন বয়স্ক লোক। চেনাচেনা লাগছে। চিনতে পারছে না।

চট করে রাগ কমে আসে কারিনার। অতি সজ্জন কারিনা কারো সামনে রাগ দেখায় না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণের অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। মীরানের সামনে সেই ক্ষমতা থাকে না। ভয়াবহ ক্রোধ মীরানের সামনে সামাল দিতে পারে না সে।

মীরান উল্লাসের সাথে রুনির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, আমাদের ছোট জন রুনি। তোমার নানাজানকে সালাম করো।

নানাজান শব্দটি ড্রিম করে কারিনার বুকে ধাক্কা দেয়। চিনতে পারে সে। ছোটবেলায় তাকে পড়িয়েছে গরীবুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের হেড টিচার। বাবার আপন চাচাতো ভাই সালামত স্যার। ওরা সালামত চাচ্চু বলে ডাকতো। ভীষণ আদর করতো ওকে।

কারিনাকে পরিচয় করিয়ে দেয়নি মীরান। তবুও চট করে সে চাচার সামনে বসে পড়ে। সালাম করে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি কারিনা। আপনার ছোটবেলার আদরের কারিনা।

সালামত চাচা অবাক হয়ে কারিনাকে দেখে। পনেরো বছর পর দেখে আনন্দে চোখে পানি চলে আসে। কোনো কথা বলতে পারলেন না।

মুখ একটু ভেংচি দেয় রুনি। তারপর ছুটে আসে নিজেদের রুমে। এসময় বাহির থেকে রূপক ফিরে আসে। মীরান রূপককেও পরিচয় করিয়ে দেয়। তেমন প্রতিক্রিয়া দেখায় না রূপক। কম্পিউটার পাগল সে। কম্পিউটার অন করে বসে পড়ে চেয়ারে। বাসায় কোনো নতুন লোক এসেছে, এসব কিছু তার মাথায় ঢোকে না। কম্পিউটারের মাউস টিপে টিপে খেলায় মেতে ওঠে। ক্লাস সেভেনে পড়ে রূপক। কারিনা ভুলে গেছে ঝগড়ার কথা। এখন মনে মনে শংকিত মীরানকে নিয়ে। যদি গুরুজনকে সম্মান না করে। যদি কোনো অপমান করে! চাচাজানের বেহাল অবস্থা নিয়েও লজ্জিত।

অপ্রত্যাশিত আদর যত্ন পেয়ে সালামত মাওলার মন ভরে গেছে আনন্দে। আনন্দের কান্না তার চোখে নেমে আসে। আচমকা এমন আন্তরিকতার ধাক্কা সামাল দিতে পারছেন না তিনি। অসুস্থ হয়ে ঢাকায় এসেছেন। শুনেছিলেন জামাই বেশ রাশভারি, মেহমান পছন্দ করে না। মনে শংকা নিয়ে এসেছেন। বড় বিপদে পড়ে এসেছেন। বিপদের কথা এখন মনে আসছে না। একটু ভালোবাসার ছোঁয়া পেয়ে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি।

মীরান নিজের বেডরুমে এসে ঢোকে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কারিনা রাগের কথা ভুলে গেছে। চাচাজানকে নিয়ে গেস্টরুমে ঢোকে। গেস্টরুমের সব কিছু দেখিয়ে দেয়। সব দেখিয়ে চাচাজানকে সহজ করার চেষ্টা করে। মনে মনে সহজ হতে পারে না। কারণ জানে সে, ওর আত্মীয় স্বজনকে মোটেই সহ্য করতে পারে না মীরান। এ মুহূর্তে তার ব্যবহার ভালো। সুবোধ জামাই-এর মতো আচরণ করেছে। মনে কী ঘুঁটি চালাচাল করছে কে জানে। যাই-ই করুক না কেন, চাচাজানের মন জয় করেছে । পরিস্থিতি সামলে নিয়েছে।

উদ্দেশ্য নিয়েই কী এমন আচরণ করলো না?

আসলে কী চাচাকে সম্মান করেছে?

নাকি, এটা ধূর্ত কৌশল। বুঝেও না বোঝার ভান করছে কারিনা। এ মুহূর্তে মেজাজ সামলে চলতে হবে। নইলে ঝগড়া বেঁধে যেতে পারে। ঝগড়া বাঁধলে চাচাজান কষ্ট পাবেন। চাচাজানকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। উনি খুব গুণী লোক।

সম্মানিত লোক। গ্রামের মানুষ তাঁকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। এখনকার অবস্থা নিয়ে তার আসল অবস্থা বোঝা যাবে না।

হেমন্ত মাস চলছে। প্রকৃতিতে তেমন শীত আসে নি। এখনো ওরা গোসলের জন্য গরম পানি ব্যবহার করে না। তবুও বলে, চাচাজান গোসলের জন্য কি গরম পানি লাগবে?

না মা থাক। কষ্ট করতে হবে না মা।

কষ্টের কিছু নেই। গরম লাগলে গরম ব্যবহার করবেন। এই লাল ট্যাপ ঘোরালে গরম পানি আসবে, আর নীল ট্যাপ ঘোরালে ঠান্ডা বের হবে। আপনি বালতিতে ইচ্ছে মতো মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। চাচাজানকে বাথরুমের কাছে নিয়ে বুঝিয়ে দেয় সব।

আচ্ছা মা।

কারিনা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। নিজের রুমে ঢোকে। মীরান রুমে নেই। নিজের বাথরুমের সামনে আসে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অর্থাৎ এখন বাথরুমে মীরান।

নিজের বেডরুমে চোখ বোলায়। ওয়ারড্রব থেকে প্যান্ট বের করেছে, শার্ট বের করেছে মীরান, চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ বাহিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মাথাটি আবার শিরশির করে ওঠে। ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টি সুরাহা হয় নি। এর মধ্যে বাহিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেছে মীরান। পরিস্থিতি জানতে পারছে না। তবুও উপায় নেই। এখন ওকে কিছু বলার সুযোগ নেই। আজকাল বেশ সেজে বের হয়। সেন্ট মাখে গায়ে। রোজ সেভ করে। সকালে জগিং করতে বের হয়। ফিটনেস কেন? কার জন্য? ওর জন্য তো টান নেই বললেই চলে। ভাবতে ভাবতে ডাইনিং রুমে ডীপ ফ্রিজের সামনে এসে দাঁড়ায়। ফ্রিজ খুলে মুরগী বের করে। রুই মাছ বের করে। রূপক রুনির জন্য বের করে শিং মাছের প্যাকেট।

শেলী, এই শেলী। কাজের মেয়েটিকে ডাক দেয় কারিনা।

নে, এগুলো ঠিকঠাক কর। আমি রাঁধবো আজ।

খালাম্মা, আদা নেই। আদা শেষ হয়ে গেছে।

চুপ! বেয়াদপ মেয়ে। নেই আবার কিরে। তোকে বলেছি না, কোনো কিছু শেষ হওয়ার একদিন আগে জানাবি।

খেয়াল করি নি খালাম্মা। বলতে বলতে প্যাকেটগুলো রান্না ঘরে নিয়ে যায় শেলী।

রেগেও শান্ত হয়ে যায় কারিনা। রান্না ঘরে আসে। এখন রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে সে। চাচাজানের জন্যে নিজ হাতে রাঁধবে। শেলীর রান্না একদম খাওয়া যায় না।

রুনিকে আদর দিয়ে তাড়াহুড়ো করে নিচে নেমে আসে মীরান। গাড়ির চাবি নিয়ে এসেছে। নিজে ড্রাইভ করবে। ড্রাইভার ঈদের ছুটিতে বাড়ি গেছে। এখনো তার ছুটি শেষ হয় নি। ঈদের ছুটি ওদের শেষ হতে চায় না। শেষ না হলেও ঢাকা শহর থেমে নেই। ছুটিবে ঢাকার মানুষ।

রাস্তায় নেমে মাথায় বাজ পড়ে। রাস্তা প্রায় ফাঁকা।

মনে পড়ে আগামীকাল বাংলাদেশে শুরু হচ্ছে ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন। জঞ্জালের চিরচেনা ঢাকার চেহারা বদলে গেছে। যানজট নেই, জনজট নেই। ফাঁকা রাস্তাঘাট, ফাঁকা ফুটপাথ। রাস্তার পাশে এলোমেলো গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উধাও হয়ে গেছে। বিস্ময়ের শেষ নেই নগরবাসীর। মাথার উপর ঘুরছে হেলিকপ্টার, বুড়িগঙ্গায় ঢেউ তুলছে নিরাপত্তা রক্ষীদের জলযান। যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত। সাধারণ মানুষের চেয়ে কোনো কোনো রাস্তায় পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীদের সংখ্যা বেশি। কালো পোষাক পরা র‍্যাব, সাদা পোষাকের গোয়েন্দা, মেটাল ডিটেকটর। উঁচু দালানে নিরাপত্তাকর্মী, ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা, রেড এলার্টে বন্দি ঢাকার জীবন।

কোনো বাসায় অতিথি না রাখার ঘোষণা দিয়েছে নিরাপত্তা বিভাগ। সর্বনাশ। আজ এসেছে মেহমান। কীভাবে এলেন তিনি। না, মেহমানকে কিছু বলা যাবে না। কারিনাকে কিছু বলা যাবে না। তাছাড়া বাসা নিরাপদ জায়গায়। ভিআইপি রোড বা ভেন্যুর জোনে নয়। এখানে অতিথি নিষিদ্ধ নয়।

আকাশ এখন বেশ পরিচ্ছিন্ন। ঝলমলে। রাজধানীও এখন মায়াবী স্বপ্নপুরীতে পরিণত হয়েছে। রাজধানীতে এখন জ্বলছে অর্ধকোটি মরিচাবাতি, ছয় হাজার নয়নাভিরাম গাছ লাগানো হয়েছে, রয়েছে তিন হাজার স্টিল স্ট্রাকচার, দশ হাজার রোলার স্টোন, বইছে পাহাড়ি ঝরনা, বিভিন্ন সড়কদ্বীপে ছুটে চলেছে আটটি দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারা। স্বপ্নপুরী ঢাকা এখন স্বপ্নচারী মানুষের অহংকারের ঢাকা।

নতুন ফ্ল্যাট কিনে নিজের মাঝেও অহংকার এসেছিল। অহংকার এখন দুর্ভিক্ষপীড়িত। কারিনার ক্ষোভ সামাল দিতে পর্যুদস্ত। ঠিক যেন দরিদ্র ঢাকাবাসীর অবস্থা। কারওয়ান বাজার বন্ধ। জিনিসপত্রের দাম চড়া। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে সব। তবুও অধিকাংশ মানুষ স্বপ্ন দেখছে। আসার আলো দেখছে।

সুদিনের অপেক্ষা করছে। মীরানও আশাবাদী। সুদিন আসবে। কারিনা শীতল হবে। বাসার পরিবেশ সহজ হবে। এ আশা নিয়ে ইউ টার্ন নিয়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরীর মোড় থেকে আবার বাসার দিকে ঘুরিয়ে দেয় গাড়ি।

সামনে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস খোলা। স্টরে আঙুরও বিক্রি হয়। মীরান ভাবে, আঙুর নিলে কেমন হয়। চাচাজানের জন্য আঙুর ভালোই হবে। তাছাড়া বাসা থেকে বের হবার সময় শুনেছে শেলীর সাথে কারিনার কথোপকথন। আদা নেই। আদাও নেওয়া যেতে পারে। দুটি অস্ত্র এখন ব্যবহার করতে হবে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত অস্ত্র ব্যবহার করা গেলে সফল হওয়া যাবে। চাচাজান আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরীত হয়েছেন। ধন্যবাদ চাচাজান। ভাবতে ভাবতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-এর সামনে গাড়ি পার্ক করে সে।

আঙুর এবং আদা নিয়ে ফিরে আসে মীরান। রূপকের জন্য নেয় বেব্রেড। রূপক এখন বেব্রেড যুগের ছেলে। ছোট বেলায় লাটিম ঘোরাতো মীরান। চার আনা দামের লাটিম। এখন ওরা ঘোরায় একুশ' টাকা দামের বেব্রেড। কী ভয়াবহ ক্রেজ। স্কুলে বাচ্চারা বেব্রেড নিয়ে যায়। প্রতিযোগিতা চলে কারটা কতো শক্তিশালী। যতো দাম ততো শক্তিশালী। রূপকেরও ব্যায়নার শেষ নেই। বাপিকে বলেছে তার জন্য যেন একুশ' টাকা দামের দামী জাপানী বেব্রেডটি আনা হয়। ছেলের খুশির জন্য সেটিই নিয়েছে মীরান। এতো টাকা দিয়ে এমন ছোট্ট খেলনা কিনতে কষ্ট হয়েছে। অন্যদিন হলে কিনতো না। আজ কিনেছে। আজ হচ্ছে ব্যতিক্রম দিন। কারিনার উগ্র মেজাজ সামাল দেওয়ার দিন। এই মেজাজ মোকাবেলা করতে পারলে ঘরের পরিবেশ শান্ত হবে। নইলে শান্তি নেই। ঘ্যানর ঘ্যানর চলতে থাকবে। কখন সুটকেস নিয়ে নিজেদের বাড়িতে চলে যাবে, ঠিক ঠিকানা নেই।

বাসায় ঢুকতে গিয়ে কিছুটা অবাক হয় মীরান।

বাহিরের দরজা খোলা। এটাও একটা ভয়াবহ ঘটনা। কারিনা বাসায় থাকবে, বাহিরের দরজা খোলা থাকবে, অকল্পনীয় ব্যাপার। ব্যাপারটিও ঘটেছে আজ। অর্থাৎ এখনো কারিনা নিজের মধ্যে ফিরে আসে নাই। এখনো কারিনার মধ্যে উগ্রমূর্তির আর এক কারিনা ঢুকে আছে। উগ্র মেজাজ এখন ঠান্ডা মেজাজে রূপ নিয়েছে। বরফ হয়ে থাকবে। সুযোগ পেলে বরফ আগুনের রূপ নেবে। বুঝতে অসুবিধে হয় না মীরানের। এতোদিনের চেনা কারিনা কি একদিনে বদলে যাবে? যাবে না।

ধীরে ধীরে পা ফেলে একবার নিজেদের রুমের দিকে উঁকি দেয় মীরান। না

কেউ নেই। রান্না ঘরের দরজা ভেজানো। নব ঘোরালেই খুলে যায়। কারিনা দাঁড়িয়ে আছে। রাঁধছে।

চোখ ঘুরিয়ে কারিনা দেখে মীরানকে।

হাতে পোটলা দেখে অবাক হয়।

নাও। এগুলো আদা। বাসায় বোধ হয় আদা নেই। তাই নিয়ে এলাম।

কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে হাত বাড়ায় কারিনা।

আদার পোটলা হাতে নিয়ে পাশে রাখে।

জালের প্যাকেটে আঙুর। নাও। চাচাজানের জন্য আনলাম। ওনাকে খেতে দাও।

এবারও কারিনা হাত বাড়ায়। হাতে নিয়ে পাশে রাখে আঙুরের প্যাকেট।

দ্রুত সরে আসে মীরান। কোনো কথা বলার প্রয়োজন হয় নি। ভেতরে ভেতরে রেগে থাকলেও কারিনার রাগের বহিঃপ্রকাশ দেখে নি বরং মনে হচ্ছে খুশি হয়েছে।

রূপকের রুমে ফিরে এসে দেখে কম্পিউটারে গেমস্ খেলছে সে। রুনি পাশে বসে খেলা দেখছে।

একবার বাপির দিকে তাকায় রূপক। আবার কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে চোখ সেঁটে দেয়।

রুনি উঠে আসে বাপির কাছে।

নাও। ভাইয়াকে দাও। বেব্রেডটি এগিয়ে দেয় রুনিকে।

রূপক লাফ দিয়ে উঠে এবার। মোঁ মেরে রুনির হাত থেকে বেব্রেডটি নেয়। খুশির আচমকা জোয়ার আসে রূপকের চোখে। ঘরের পরিবেশ পাল্টে যায়। খুশির বন্যায় যেন ভাসতে থাকে রূপক। সবাই।

রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে আসে কারিনা। ছেলেদের আনন্দময় ঝিকঝিক করা চোখ দেখে তারও মন ভরে যায়। সেও আনন্দে শরিক হয়। মৃদু হাসি দেয়। কিছুক্ষণ রুমে থাকে। আবার ফিরে আসে রান্না ঘরে।

নিজের রুমে ফিরে আসে মীরান। আপাতত বিজয়ী সে। পুরো পরিস্থিতি দখলে নিয়ে এসেছে। কাজটি ভালো করে নি বুঝতে পারে। কথা ছিল এপার্টমেন্ট দু'জনের নামে রেজিস্ট্রেশন হবে। ভুলে গেছে বললেও ভুল হবে। ভুলে নি। ইচ্ছেকৃত করেছে কাজটি। কারিনার বুঝতে বাকি নেই। সাথে যুক্ত হয়েছে ইদানিংকালে মীরানের আচমণ। আগের মতো কারিনাকে সময় দেয় না। বেশির

সুদিনের অপেক্ষা করছে। মীরানও আশাবাদী। সুদিন আসবে। কারিনা শীতল হবে। বাসার পরিবেশ সহজ হবে। এ আশা নিয়ে ইউ টার্ন নিয়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরীর মোড় থেকে আবার বাসার দিকে ঘুরিয়ে দেয় গাড়ি।

সামনে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস খোলা। স্টরে আঙুরও বিক্রি হয়। মীরান ভাবে, আঙুর নিলে কেমন হয়। চাচাজানের জন্য আঙুর ভালোই হবে। তাছাড়া বাসা থেকে বের হবার সময় শুনেছে শেলীর সাথে কারিনার কথোপকথন। আদা নেই। আদাও নেওয়া যেতে পারে। দুটি অস্ত্র এখন ব্যবহার করতে হবে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত অস্ত্র ব্যবহার করা গেলে সফল হওয়া যাবে। চাচাজান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরীত হয়েছেন। ধন্যবাদ চাচাজান। ভাবতে ভাবতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-এর সামনে গাড়ি পার্ক করে সে।

আঙুর এবং আদা নিয়ে ফিরে আসে মীরান। রূপকের জন্য নেয় বেব্লেড। রূপক এখন বেব্লেড যুগের ছেলে। ছোট বেলায় লাটিম ঘোরাতো মীরান। চার আনা দামের লাটিম। এখন ওরা ঘোরায় একুশ' টাকা দামের বেব্লেড। কী ভয়াবহ ক্রেজ। স্কুলে বাচ্চারা বেব্লেড নিয়ে যায়। প্রতিযোগিতা চলে কারটা কতো শক্তিশালী। যতো দাম ততো শক্তিশালী। রূপকেরও বায়নার শেষ নেই। বাপিকে বলেছে তার জন্য যেন একুশ' টাকা দামের দামী জাপানী বেব্লেডটি আনা হয়। ছেলের খুশির জন্য সেটিই নিয়েছে মীরান। এতো টাকা দিয়ে এমন ছোট্ট খেলনা কিনতে কষ্ট হয়েছে। অন্যদিন হলে কিনতো না। আজ কিনেছে। আজ হচ্ছে ব্যতিক্রম দিন। কারিনার উগ্র মেজাজ সামাল দেওয়ার দিন। এই মেজাজ মোকাবেলা করতে পারলে ঘরের পরিবেশ শান্ত হবে। নইলে শান্তি নেই। ঘ্যানর ঘ্যানর চলতে থাকবে। কখন সুটকেস নিয়ে নিজেদের বাড়িতে চলে যাবে, ঠিক ঠিকানা নেই।

বাসায় ঢুকতে গিয়ে কিছুটা অবাক হয় মীরান।

বাহিরের দরজা খোলা। এটাও একটা ভয়াবহ ঘটনা। কারিনা বাসায় থাকবে, বাহিরের দরজা খোলা থাকবে, অকল্পনীয় ব্যাপার। ব্যাপারটিও ঘটেছে আজ। অর্থাৎ এখনো কারিনা নিজের মধ্যে ফিরে আসে নাই। এখনো কারিনার মধ্যে উগ্রমূর্তির আর এক কারিনা ঢুকে আছে। উগ্র মেজাজ এখন ঠান্ডা মেজাজে রূপ নিয়েছে। বরফ হয়ে থাকবে। সুযোগ পেলে বরফ আগুনের রূপ নেবে। বুঝতে অসুবিধে হয় না মীরানের। এতোদিনের চেনা কারিনা কি একদিনে বদলে যাবে? যাবে না।

ধীরে ধীরে পা ফেলে একবারে নিজেদের রুমের দিকে উঁকি দেয় মীরান। না

কেউ নেই। রান্না ঘরের দরজা ভেজানো। নব ঘোরাতেই খুলে যায়। কারিনা দাঁড়িয়ে আছে। রাঁধছে।

চোখ ঘুরিয়ে কারিনা দেখে মীরানকে।

হাতে পোটলা দেখে অবাক হয়।

নাও। এগুলো আদা। বাসায় বোধ হয় আদা নেই। তাই নিয়ে এলাম।

কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে হাত বাড়ায় কারিনা।

আদার পোটলা হাতে নিয়ে পাশে রাখে।

জালের প্যাকেটে আঙুর। নাও। চাচাজানের জন্য আনলাম। ওনাকে খেতে দাও।

এবারও কারিনা হাত বাড়ায়। হাতে নিয়ে পাশে রাখে আঙুরের প্যাকেট।

দ্রুত সরে আসে মীরান। কোনো কথা বলার প্রয়োজন হয় নি। ভেতরে ভেতরে রেগে থাকলেও কারিনার রাগের বহিঃপ্রকাশ দেখে নি বরং মনে হলো খুশি হয়েছে।

রূপকের রুমে ফিরে এসে দেখে কম্পিউটারে গেমস্ খেলছে সে। রুনি পাশে বসে খেলা দেখছে।

একবার বাপির দিকে তাকায় রূপক। আবার কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে চোখ সেঁটে দেয়।

রুনি উঠে আসে বাপির কাছে।

নাও। ভাইয়াকে দাও। বেব্লেডটি এগিয়ে দেয় রুনিকে।

রূপক লাফ দিয়ে উঠে এবার। ছোঁ মেরে রুনির হাত থেকে বেব্লেডটি নেয়। খুশির আচমকা জোয়ার আসে রূপকের চোখে। ঘরের পরিবেশ পাল্টে যায়। খুশির বন্যায় যেন ভাসতে থাকে রূপক। সবাই।

রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে আসে কারিনা। ছেলেদের আনন্দময় চিকচিক করা চোখ দেখে তারও মন ভরে যায়। সেও আনন্দে শরিক হয়। মৃদু হাসি দেয়। কিছুক্ষণ রুমে থাকে। আবার ফিরে আসে রান্না ঘরে।

নিজের রুমে ফিরে আসে মীরান। আপাতত বিজয়ী সে। পুরো পরিস্থিতি দখলে নিয়ে এসেছে। কাজটি ভালো করে নি বুঝতে পারে। কথা ছিল এপার্টমেন্ট দু'জনের নামে রেজিস্ট্রেশন হবে। ভুল গেছে বললেও ভুল হবে। ভুলে নি। ইচ্ছেকৃত করেছে কাজটি। কারিনার বুঝতে বাকি নেই। সাথে যুক্ত হয়েছে ইদানিংকালে মীরানের আচরণ। আগের মতো কারিনাকে সময় দেয় না। বেশির

সুদিনের অপেক্ষা করছে। মীরানও আশাবাদী। সুদিন আসবে। কারিনা শীতল হবে। বাসার পরিবেশ সহজ হবে। এ আশা নিয়ে ইউ টার্ন নিয়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরীর মোড় থেকে আবার বাসার দিকে ঘুরিয়ে দেয় গাড়ি।

সামনে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস খোলা। স্টরে আঙুরও বিক্রি হয়। মীরান ভাবে, আঙুর নিলে কেমন হয়। চাচাজানের জন্য আঙুর ভালোই হবে। তাছাড়া বাসা থেকে বের হবার সময় শুনেছে শেলীর সাথে কারিনার কথোপকথন। আদা নেই। আদাও নেওয়া যেতে পারে। দুটি অস্ত্র এখন ব্যবহার করতে হবে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত অস্ত্র ব্যবহার করা গেলে সফল হওয়া যাবে। চাচাজান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরীত হয়েছেন। ধন্যবাদ চাচাজান। ভাবতে ভাবতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-এর সামনে গাড়ি পার্ক করে সে।

আঙুর এবং আদা নিয়ে ফিরে আসে মীরান। রূপকের জন্য নেয় বেব্লেড। রূপক এখন বেব্লেড যুগের ছেলে। ছোট বেলায় লাটিম ঘোরাতো মীরান। চার আনা দামের লাটিম। এখন ওরা ঘোরায় একুশ' টাকা দামের বেব্লেড। কী ভয়াবহ ক্রেজ। স্কুলে বাচ্চারা বেব্লেড নিয়ে যায়। প্রতিযোগিতা চলে কারটা কতো শক্তিশালী। যতো দাম ততো শক্তিশালী। রূপকেরও ব্যয়নার শেষ নেই। বাপিকে বলেছে তার জন্য যেন একুশ' টাকা দামের দামী জাপানী বেব্লেডটি আনা হয়। ছেলের খুশির জন্য সেটিই নিয়েছে মীরান। এতো টাকা দিয়ে এমন ছোট্ট খেলনা কিনতে কষ্ট হয়েছে। অন্যদিন হলে কিনতো না। আজ কিনেছে। আজ হচ্ছে ব্যতিক্রম দিন। কারিনার উগ্র মেজাজ সামাল দেওয়ার দিন। এই মেজাজ মোকাবেলা করতে পারলে ঘরের পরিবেশ শান্ত হবে। নইলে শান্তি নেই। ঘ্যানর ঘ্যানর চলতে থাকবে। কখন সুটকেস নিয়ে নিজেদের বাড়িতে চলে যাবে, ঠিক ঠিকানা নেই।

বাসায় ঢুকতে গিয়ে কিছুটা অবাক হয় মীরান।

বাহিরের দরজা খোলা। এটাও একটা ভয়াবহ ঘটনা। কারিনা বাসায় থাকবে, বাহিরের দরজা খোলা থাকবে, অকল্পনীয় ব্যাপার। ব্যাপারটিও ঘটেছে আজ। অর্থাৎ এখনো কারিনা নিজের মধ্যে ফিরে আসে নাই। এখনো কারিনার মধ্যে উগ্রমূর্তির আর এক কারিনা ঢুকে আছে। উগ্র মেজাজ এখন ঠান্ডা মেজাজে রূপ নিয়েছে। বরফ হয়ে থাকবে। সুযোগ পেলে বরফ আগুনের রূপ নেবে। বুঝতে অসুবিধে হয় না মীরানের। এতোদিনের চেনা কারিনা কি একদিনে বদলে যাবে? যাবে না।

ধীরে ধীরে পা ফেলে একবার নিজেদের রূমের দিকে উঁকি দেয় মীরান। না

কেউ নেই। রান্না ঘরের দরজা ভেজানো। নব ঘোরাতেই খুলে যায়। কারিনা দাঁড়িয়ে আছে। রাঁধছে।

চোখ ঘুরিয়ে কারিনা দেখে মীরানকে।

হাতে পোটলা দেখে অবাক হয়।

নাও। এগুলো আদা। বাসায় বোধ হয় আদা নেই। তাই নিয়ে এলাম।

কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে হাত বাড়ায় কারিনা।

আদার পোটলা হাতে নিয়ে পাশে রাখে।

জালের প্যাকেটে আঙুর। নাও। চাচাজানের জন্য আনলাম। ওনাকে খেতে দাও।

এবারও কারিনা হাত বাড়ায়। হাতে নিয়ে পাশে রাখে আঙুরের প্যাকেট।

দ্রুত সরে আসে মীরান। কোনো কথা বলার প্রয়োজন হয় নি। ভেতরে ভেতরে রেগে থাকলেও কারিনার রাগের বহিঃপ্রকাশ দেখে নি বরং মনে হলো খুশি হয়েছে।

রূপকের রুমে ফিরে এসে দেখে কম্পিউটারে গেমস্ খেলছে সে। রুনি পাশে বসে খেলা দেখছে।

একবার বাপির দিকে তাকায় রূপক। আবার কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে চোখ সেঁটে দেয়।

রুনি উঠে আসে বাপির কাছে।

নাও। ভাইয়াকে দাও। বেব্লেডটি এগিয়ে দেয় রুনিকে।

রূপক লাফ দিয়ে উঠে এবার। ছোঁ মেরে রুনির হাত থেকে বেব্লেডটি নেয়। খুশির আচমকা জোয়ার আসে রূপকের চোখে। ঘরের পরিবেশ পাল্টে যায়। খুশির বন্যায় যেন ভাসতে থাকে রূপক। সবাই।

রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে আসে কারিনা। ছেলেদের আনন্দময় চিকচিক করা চোখ দেখে তারও মন ভরে যায়। সেও আনন্দে শরিক হয়। মৃদু হাসি দেয়। কিছুক্ষণ রুমে থাকে। আবার ফিরে আসে রান্না ঘরে।

নিজের রুমে ফিরে আসে মীরান। আপাতত বিজয়ী সে। পুরো পরিস্থিতি দখলে নিয়ে এসেছে। কাজটি ভালো করে নি বুঝতে পারে। কথা ছিল এপার্টমেন্ট দু'জনের নামে রেজিস্ট্রেশন হবে। ভুলে গেছে বললেও ভুল হবে। ভুলে নি। ইচ্ছেকৃত করেছে কাজটি। কারিনার বুঝতে বাকি নেই। সাথে যুক্ত হয়েছে ইদানিংকালে মীরানের আচরণ। আগের মতো কারিনাকে সময় দেয় না। দেশির

ভাগ সময় বাসার বাহিরে কাটায়। কোনো অভিযোগ মিথ্যা নয়। তবে কি পরস্পরের প্রতি আস্থাহীনতা বাড়ছে? অবিশ্বাস বাড়ছে? কে বেশি ভুগছে অবিশ্বাসে? নিজে নয় কি? তাহলে বউর নাম যোগ করতে অসুবিধে ছিল কোথায়? মীরান নিজেকে বিশ্লেষণ করে, এনালাইসিস করে। কারিনাকেও বিশ্লেষণ করে। বোঝার চেষ্টা করে। আসলে যত রাগ করুক, কারিনা কি কখনো ছেড়ে যেতে পারে? পারে না। তাহলে কি সে কারিনাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে নি? নিজের অবচেতনে কী আছে খোঁজার চেষ্টা করে। এমন সময় মোবাইলে মিসকল আসে। চেনা নম্বর। অচেনা নম্বর সাধারণত সে রিসিভ করে না।

এখন মিসকলের জবাবে কল ব্যাক করে মীরান।

খিলখিল আওয়াজ কানে ভেসে আসে।

তাহলে কল ব্যাক করলেন?

হ্যাঁ, করলাম।

অসুবিধে আছে? কথা বলা যাবে?

অসুবিধে নেই মানে? ভীষণ অসুবিধে। ঝড়-তুফানের মধ্যে আছি।

কোথায় আপনি এখন?

বাসায়।

খিলখিল হাসি এবার হো হো হাসিতে বদলে যায়।

বউ ছাড়া কারুর সাথে কি ফোনে কথা বলা হারাম? ঝড় তুফান কিসের?

তুমি বুঝবে কি? কচি মেয়ে। নাকে টিপদিলে দুধ বের হবে। তোমার বোঝার কথা নয় সব বিষয়।

কচি মেয়ে? আমাকে কচি মেয়ে বলছেন?

না তো কি? আমার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে আর তোমার এখনো আঠারো হয় নি। আমার তুলনায় কচি নও?

খিলখিল হাসির ছটা বেড়ে যায়। কানে মোবাইল চেপে বেডরুমের দরজা লক করে দেয় মীরান।

কচি-না পাকা, টিপে দেখবেন নাকি?

ধড়াৎ করে কান গরম হয়ে যায় মীরানের। বলে কি মেয়ে। কথার রস সামাল দিতে সময় লাগে। আবার হাসির কণ্ঠ। আবার একই আহবান।

কি, মাপতে চান? আসবো নাকি?

মীরানের বুক ধড়ফড় বেড়ে যায়। ফিসফিস করে বললো, হার মানলাম। কচি নও তুমি। ভীষণ পাকা। মৌ মৌ গন্ধে আমার বিভ্রম ঘটবে। পরে কথা বলবো। এখন রাখি?

না না। রাখবেন না। আর একটু শুনুন। আপনাকে আমি ফোন করি কেন জানেন?

না। জানি না।

খুউব ভালো লেগেছে। খুউব ভালো মানুষ আপনি। আমার দেখা সেরা মানুষ।

বলো কি! আমার কী আছে? বেঁটে, কালো, মুখে মাংস নেই, বাংলা পাঁচের মতো আমার চেহারা। আমাকে ভালো লাগবে কেন?

মোটেও কালো নন আপনি। উজ্জ্বল শ্যামলা। মায়াবী, লম্বা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাছাড়া...

থেমে যায় কচি মেয়ে।

তাছাড়া কি? আপনি লোভী না। বউকে খুউব ভালোবাসেন। খুব সংসারী আপনি। এসব গুণ খুব ভালো লেগেছে আমার।

আমি তো আর একজনের হাজবেন্ড। আমাকে তোমার ভালো লাগবে কেন?

এ জন্যই তো ভালো লেগেছে। বলতে বলতে আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে কচি মেয়ে। নিজের প্রেমিক বিশ্বস্ত হয় না। অন্যের দিকে চোখ দেয়। হাত বাড়ায়। অন্যের হাজবেন্ড নিজের জন্য ভালো, নিরাপদ। আবারো হাসি। তাছাড়া ... আপনি সেক্সি... হি... হি...।

বলো কি তুমি? এ দর্শন কিভাবে পেলে?

মেয়ে হলে আপনিও আঠারো বছরের পূর্বে এই দর্শন পেয়ে যেতেন। এখন পাবেন না। বুঝবেন না। বুঝেছেন?

আবার হাসি হি হি.... খিলখিল.... হি হি....।

বেডরুমের দরজা খুলে যায়। কারিনা দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। তীক্ষ্ণ চোখে কানে চেপে রাখা মোবাইলসহ স্বামীকে দেখে। মুখের পেশীতে আচমকা বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো সন্দেহের তরঙ্গ নেচে ওঠে। তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকিয়ে আবার রুম থেকে বেরিয়ে যায়।

নিজের বুকের শব্দ নিজে কানে শুনতে পায় মীরান। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। মৃদুলয়ে ঘুরছে। কোনো শব্দ ছিল না। এখন মনে হচ্ছে ফ্যানের শব্দ বেড়ে গেছে। সাঁ সাঁ আওয়াজ বেড়ে গেছে। উত্তেজিত অবস্থা সামলে ওঠে। লাইন না কেটে কানের কাছেই ধরেছিল মোবাইল।

বলো তো, আমার কাছে তুমি কী চাও?

কী চাই জানি না। তবে আপনার কাছে গিয়েছিলাম চাকরির ব্যাপারে। চাকরির প্রয়োজন আছে আমার এক বন্ধুর জন্য। আমার জন্য নয়। আপাতত বন্ধুর

চাকরিটা হলে খুশি। আর আমার জন্য কী চাই সত্যিই জানি না আমি। কথা বলতে ভালো লাগে, দুষ্টুমি করতে ভালো লাগে। এটুকুই চাই আপাতত। আপনার ব্যবহার এটুকু চাওয়ার জন্য নাড়া দিয়েছে আমাকে। আপনি কি কিছু চান?

সরাসরি প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে যায় মীরান। বলে, এখন রাখি। পরে জবাব দেবো।

আচ্ছা, রাখেন। পরে জবাব দিয়েন। শেষের কথাটুকু বেশ শান্ত। স্থির। অবিচল। কোথাও একটা বিষাদের রাগিনী ছড়িয়ে দেয়। হতাশার গোপন বার্তা ছড়িয়ে দেয়। বুঝতে পারে মীরান।

লাইন কেটে জুতো খুলে প্যান্ট শার্ট পরা অবস্থায় বিছানায় ছুঁড়ে দেয় শরীর।

মীরানের মধ্যে অজানা এক অস্থিরতা জেগে থাকে। অস্থিরতার কারণে রাতে ভালো ঘুম হয় নি। প্রতি ভোরে জগিং করতে বের হয় সে। ধানমন্ডির লেকের পাড়ে ঘেঁষে বেড়ায়। আজ উঠতে ইচ্ছে করছে না। আর একটু ঘুমাতে চাইছে মন। অলসতা চেপে ধরে। হঠাৎ পেটের মধ্যে নরম হাতের ঘুষি টের পায় সে। চোখ খুলে দেখে রুনি ড্রিমড্রিম তার পেটে ঘুষি চালাচ্ছে। দাঁত মুখ খিঁচে অনবরত মারছে ঘুষি।

মা, রুনি। স্বপ্ন দেখছো? কাকে ঘুষি মারছো? মীরানের কথার সাথে সাথে রুনির হাতের কাজ থেমে যায়। কষ্ট করে চোখ খোলে। মুখে মৃদু হাসি ছড়িয়ে দেয়। মাথা ঝাঁকি দিয়ে জানিয়ে দেয় হ্যাঁ স্বপ্ন দেখছিল। আবার বালিশে মাথা এলিয়ে দেয়। ঘুমিয়ে পড়ে সে।

মীরানের অলসতা চলে গেছে। ভোরের আলো ফুটেছে। জানালার পর্দা সরিয়ে রেখে ঘুমায় সে। ভোরের নরম আলোয় ঘুম থেকে ওঠার জন্য এ ব্যবস্থা। এটি কারিনার একদম অপছন্দ। সকালের দিকে আরামে ঘুমাতে হয় তাকে। সারারাত প্রায় জেগে থাকে। সকালের ঘুম ভালো না হলে সারাদিন মেজাজ খারাপ থাকে। তাই অন্যরুমে ঘুমায়। আজ ঘুমিয়েছে রুপকের রুমে।

মীরান জগিং এর জন্য প্রস্তুত হয়। কেডস পরে, ট্রাউজার পরে। ভারী কাপড়ের একটা ঢোলা জিনসের শার্ট পরে। বাহিরে বের হবে, এমন সময় রুনি চোখ খুলে তাকায়। মীরান ফিরে আসে রুনির কাছে।

স্বপ্ন দেখছিলে মা?

হ্যাঁ।

কী স্বপ্ন?

শেলীকে মারছিলাম।

কেন? মারছিলে কেন?

ও আমাকে ভয় দেখিয়েছে। কথা শোনে না আমার। এজন্য মারছিলাম।

শেলীকে ভয় পাও?

ভয় পাই না। ওকে দেখতে পারি না। ও আমার সাথে খেলে না। একটুও আদর করে না।

আচ্ছা আমি বকে দেবো। কেমন?

ঠিক আছে। মাথা নাড়ায় রুনি।

মেয়ের মাথায় আদর বুলিয়ে বাহিরে আসে মীরান।

বাহিরে এসে ভালো লাগতে শুরু করে। নরম বাতাস বইছে। ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগছে মুখে। বাতাসের এমন পরশ অস্থির মনে শান্তির ছোঁয়া বুলিয়ে দিচ্ছে।

ফ্লাট বাড়ির মধ্যে থেকে ঋতু বৈচিত্র্য টের পাওয়া যায় না। অথচ হেমন্তের চিহ্ন ভেসে উঠেছে প্রকৃতিতে। শুরু হয়েছে গাছের পাতা ঝরার খেলা। হলুদ পাতা ঝরে আছে রাস্তায়, চলার পথে। পায়ে পায়ে আসছে শীত। ধানমন্ডির লেকের পাড়ের চেহারা বদলে যাচ্ছে। রোজার কারণে একমাস লেকের পাড়ে আসে নি মীরান। এক মাসে কত পরিবর্তন! লেকের পাড়ে গাছ গাছালির ফাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে মিষ্টি পাখি খঞ্জনা। দারুণ দৃশ্য।

দৃশ্য দেখতে দেখতে দ্রুত হাঁটতে থাকে মীরান। গাছে গাছে নরম নরম কচি পাতা বের হচ্ছে। মসৃণ। স্বচ্ছ। সবুজ পাতাগুলো মনের ঘরেও জ্বালিয়ে তোলে কচি সোনা রোদ। পুরাতন পাতা ঝরে যায়। নতুন পাতায় ভরে ওঠে বৃক্ষরাজি।

মানুষ তো কেবল ঝরে যায়। চল্লিশের পর ক্ষয় বাড়তে থাকে। নতুন করে কিছু কি জন্মায়? কোনো কোষ? নতুন কোনো আবেগ মনের ঘরে কি কচিপাতার মতো ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে?

বেরোয় তো। নিজের মনকে প্রবোধ দেয়। হাঁটতে থাকে মীরান। তারুণ্য কলসে ওঠে ভেতর থেকে। গতি বেড়ে যায়। ধানমন্ডির আট নম্বর রোডের ব্রিজ পার হওয়ার সময় পানিতে শব্দ শুনতে পায় সে। দু'দিকে ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে। চারদিক এতো শান্ত। বাতাস নেই। বৃষ্টি নেই। অথচ পানিতে ঢেউ!

ব্রিজের গ্রিল ধরে নিচে তাকায় মীরান।

একটি ডিঙ্গী নৌকোর দাঁড় বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট একটি কিশোর নৌকোর কিনারায় বসে বড় বড় ঝরা পাতাগুলো তুলে নিচ্ছে। দারুণ ব্যাপার। লেকের পানি থেকে পাতা কুড়িয়ে নেওয়ার কৌশলটি পরিশ্রম সাধ্য হলেও বেশ শৈল্পিক কাজ বলে মনে হলো। ক্ষুদ্র পাতা ভাসছে। এতো সহস্র ক্ষুদ্র পাতা তোলা সম্ভব নয়। বড় পাতা তুলে পানি নির্মল রাখা হচ্ছে। নৌকোর দাঁড়ের টানে শান্ত পানিতে ঢেউ উঠছে। হঠাৎ অনমনা হয়ে যায় মীরান।

কয়েক মাস পূর্বের একটি ঘটনা মনে পড়ে। হঠাৎ লেকের পাড়ে চলমান মানব স্রোত থেমে যায়। সবাই লেকের দিকে তাকিয়ে আছে। লেকের পানি একবার

এদিকে আবার অন্য দিকে আছড়ে পড়ছে। চারিদিকে শান্ত পরিবেশ। পরিচ্ছন্ন সকাল। অথচ পানি অশান্ত। ভয়াবহ রকম অশান্ত। পানিতে উথাল পাতাল ঢেউ বয়ে গেছে। প্রকৃতির দানবীয় দৃশ্যটি দেখে মানুষ হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। বাসায় ফিরে মীরান বিবিসি চ্যানেলে দেখে ব্রেকিং নিউজ। সুনামির তাণ্ডব দেখে। ধ্বংসযোগ্য দেখে। পানির স্তরের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা দেখে। শিউরে উঠে শরীর।

রেলিং ছেড়ে আবার হাঁটতে থাকে মীরান। প্রকৃতির ধ্বংসলীলা ও তাণ্ডবের মতো মানব মন এবং দেহে কি এমন দানবীয় ধ্বংসযোগ্য কাণ্ড ঘটে না? ঘটে। কেউ সেই তাণ্ডবে টিকে যায়, কেউ ঝরে যায়। এই জন্য বলা হয়, 'সারভাইভেল অব দা ফিটেস্ট।'

মীরানের জীবনে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটছে। ঘটনাগুলোও তার শান্ত মন অশান্ত করছে। অস্থির করছে। উদ্বেলিত, আলোড়িত করছে।

এই আলোড়ন সামাল দিতে হবে। জয়ী হতে হবে। সকালের হাঁটা নাকি স্ট্রেস মোকাবেলার জন্য শক্তি জোগায়। মীরান এখন সেই শক্তি সঞ্চয় করছে। হাঁটার গতি বেড়ে যায়।

রাস্তা ক্রস করে লেকের পশ্চিম পাড়ে, ব্রিজের ডান দিকে চলে আসে। একটু এগোনোর পর 'ডিঙ্গি রেস্টুরেন্ট'। সামনে পানিতে এক ঝাঁক ছোট ছোট ডিঙ্গি বোট। এখানে সবগুলো বোট দড়ি দিয়ে ঘাটে বাঁধা। বোটের সামনের সিঁড়িতে বসা একজোড়া কিশোরী। হাঁটার ড্রেসে দুই কিশোরীকে দুটো কবুতরের মতো মনে হয়। সাদা ড্রেসে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। লেকের পাড়ে পা ঝুলিয়ে বসেছে তারা। পানিতে তাদের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে খিলখিলিয়ে হেসে উঠছে। সাথে সাথে মনে পড়ে যায় টেলিফোনের কচি মেয়েটির কথা।

কী এমন অভিজ্ঞতা কিশোরীটি কে ধারালো করেছে কে জানে! কথাবার্তায় সূচালো, স্ট্রেট ফরোয়ার্ড, লজ্জা সংকোচহীন কিশোরীটি নানান অভিজ্ঞতা নিয়ে বেড়ে উঠেছে। একারণে এমন ঢংগে কথা বলতে পারে।

অনেকে ঠেকে শেখে, অনেকে দেখে শেখে, অনেকে পড়ে শেখে। ঠেকে শেখার চেয়ে পড়ে এবং দেখে শেখা অনেক নিরাপদ।

কচি মেয়েটি কীভাবে শিখেছে সেও হয়তো জানে না।

এখন ইনফরমেশন মিডিয়ার যুগ, ডিশের যুগ। ইচ্ছে করলে যে কোনো বিষয়ে যে কোনো কিশোরী সব জেনে যেতে পারে। অকালে পেকে যেতে পারে।

লেকের পাড়ের দুই কিশোরীকে দেখে টেলিফোনে সংলাপের কচি মেয়েটির কথা মনে পড়ে যায়। মেয়েটির নাম জানা হয় নি। নাম বলে না। নিজেকে লুকিয়ে

রেখে মজা করছে মেয়েটি। এই মজায় সক্রিয় হওয়া ঠিক নয়। বোঝে মীরান। বুঝেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। টেলিফোন এলে কথা বলার লোভ সামাল দিতে পারে না।

হাঁটতে থাকে মীরান। আচমকা সামনে এসে দাঁড়ায় একজন মহিলা।

স্লামুয়ালাইকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

চিনতে পারছেন?

চেনা চেনা লাগছে। চিনতে পারছে না। এ কথা বলতে পারলো না মীরান। বোকার মতো হাসি ফুটে উঠলো। হ্যাঁ, না কিছুই বললো না।

বুঝেছি, চিনতে পারেন নি। মহিলাটি কপট রাগ করে সামনে পা বাড়ায়।

শুনুন। চিনতে পেরেছি। অন্য মনস্ক ছিলাম। তাই হঠাৎ মনে পড়ে নি। ভালো আছেন আপনি? মীরান বললো।

জ্বি। ভালো। এজন্যই ভোরের আলোয় বের হতে পেরেছি। ভালো না থাকলে কি মর্নিং ওয়াকের ইচ্ছে জাগে? বলেই মহিলাটি হাসতে থাকে।

লেকের পাড়ে হাঁটার রাস্তা অপ্রশস্ত। সরু। প্রায় গায়ে গায়ে লেগে ক্রস করতে হয় অন্যজনকে। এ অবস্থায় কারুর সাথে আলাপ করার সময় নেই। দ্রুত হাঁটতে থাকে সবাই। কেউ দাঁড়িয়ে কথা বললে, গল্পো করলে, বিরক্তি লাগে। বাজে রকম একটি ব্যাপার মনে হতো আগে। সেই কাজটিই এখন সে করছে। বাজে কাজ নিজে করার সময় নিজে টের পায় না মানুষ। অন্যরা টের পায়। মীরানও এ সময় টের পাচ্ছে না।

মহিলাটি একজন স্কুল টিচার। ওনার বোনের চাকরির জন্য এসেছিল তার অফিসে। সুন্দরীদের ইগো থাকে টনটনা। এই মহিলা সুন্দরী। তবে ইগো তার লতানো। গায়ে পড়ে কথা বলতে বেশি আগ্রহী। আগ্রহের সুযোগ বোকার মতো বাড়িয়ে দিয়েছে মীরান। মহিলাটি এবার গলগল করে কথা শুরু করে।

দুই যুবক দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে।

এক্সকিউজমি? একটু সরে দাঁড়ান। বলে তারা হেঁটে চলে যায়।

নিজের বাজে কাজটি বুঝতে পারে মীরান। হাঁটতে এসে গল্পো করা অশোভন। দ্রুত এবার সরে দাঁড়ায়। কোনো রকম বিদায় নিয়ে আবার হাঁটতে থাকে।

সামনে দু'জন খাকী ড্রেসের মেয়ে আনসার। শার্ট ইন করেছে, অথচ পায়ে স্যান্ডেল। হাতে একটা লাঠি। প্রায়ই দেখে ওদের। ওরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। এরাই কী লেকের পাড়ের নিরাপত্তা রক্ষী? ভাবতে গিয়ে হোঁচট খায় মীরান।

কম্পিউটারাইজড কণ্ঠ ভেসে আসে। ওয়েলকাম। ওয়েলকাম।

ওজন মাপার যন্ত্র নিয়ে বসে আসে একজন। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে ওজন নিচ্ছে। মেশিন থেকে বলে দিচ্ছে 'এইটটি কেজি। ওয়েলকাম। ওয়েলকাম।'

সব সময় দৃশ্যটি দেখে মীরান। কখনো নিজের ওজন নেওয়া হয় নি। অবশ্য ওজন ওর বেশি নয়। ফিটফাট শরীর। ওজন নেওয়ার দরকার নেই। কেবল ঝরঝরা থাকার জন্যই হাঁটতে বের হওয়া। গতিশীলতার জন্য হাঁটা।

এক মিনিটে কেউ কেউ ব্লাড সুগার দেখে নিচ্ছে। ছোট্ট একটা চেয়ারে ব্লাড সুগার দেখার যন্ত্রপাতি নিয়ে এখানে ওখানে বসে আছে অনেকে। এটা তাদের পেশা। ব্লাড প্রেসারও মেপে দিচ্ছে তারা। ভালো ইনকাম। ভদ্র পেশা। শান্তির পেশা। কাজটিকে মোটেই ছোট মনে হয় না। বড় মনে হয়। সেবাধর্মী পেশা। খারাপ কি? অসম্মানের কী আছে?

শতায়ু প্রাঙ্গণ সামনে। ওখানে চিৎকার শোনা যাচ্ছে। গ্রুপ বেঁধে সবাই ব্যায়াম করে। হু হু করে ডাক ছাড়ে। ফুসফুসের ব্যায়াম করতে এমন বিকট চিৎকার জুড়ে দেয় সবাই। প্রথম প্রথম কেমন যেন লাগতো। এখন গা সয়া হয়ে গেছে। মানব দেহে অক্সিজেনের ফ্লো ঢুকে যায়। চিৎকারও এক ধরনের ব্যায়াম। জোট বেঁধে এ ধরনের ব্যায়ামে অংশ নিতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে পূরণের সময় নেই। দ্রুত হেঁটে ফিরে যেতে হবে।

আচমকা এক যুবক কাছে এসে দাঁড়ায়। গায়ের কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, একটু এদিকে আসেন। ওই যে দেখেন, ভাইজান আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

কে? ভাইজান কে? কেন অপেক্ষা করছে?

দেখেন। সামনে দেখেন। ডাকছে আপনাকে।

এভয়েড করে চলে যাচ্ছিল মীরান।

শোনেন। প্যান্টের পকেটে পিস্তল আছে। কথা না শুনলে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের গুলিতে সব হারাবেন। ছেলেটির ডান হাত প্যান্টের ডান পকেটের ভেতর। পকেট উঁচু।

ওদিকে চোখ যাওয়ার সাথে সাথে হিম হয়ে যায় মীরানের রক্ত।

যন্ত্রচালিত রবোটের মতো মূল হাঁটার পথ থেকে নেমে সে বায়ে গাছের তলে অপেক্ষমান বড় ভাইয়ের দিকে এগোতে থাকে।

চিৎকার দেবেন না। ছেলেটি বলে।

না। চিৎকার দেবো না। মীরান কথা দেয়। বলে, কী চাও তোমরা?

নতুন ফ্ল্যাটে উঠেছেন। আমাদের নজরানা দেবেন না? ভাইজান এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেয়।

হায়! এখানেও ফ্ল্যাট! বাসায় হয়েছে শব্দবানে আক্রান্ত। এখানে কি তবে বুলেটে প্রাণ যাবে?

বোকার মতো তাকিয়ে থাকে মীরান। কী বলবে বুঝতে পারে না।

আপাতত ঘড়ি এবং মোবাইল সেট রেখে যান। সীমটি খুলে নেন। বাকি নজরানার জন্য নোটিশ পাঠাবো আমরা। নোটিশের জবাব ঠিক মতো দিয়েন। বুঝেছেন? পুলিশে জানানোর চেষ্টা করলে জানে মারা পড়বেন।

মীরানের মুখে কথা নেই। দ্রুত ঘড়ি খুলে দেয়। দামী মোবাইল সেটটি তুলে দেয় ওদের হাতে। একজন সেটটি খুলে সীম বের করে। সীম কার্ডটি ফেরত দিয়ে বলে, আসসালামু আলাইকুম। চুপচাপ চলে যান। আবার দেখা হবে। পিছনে ফিরবেন না।

মীরানের বোধ আচমকা শূন্য হয়ে যায়। কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না আচরণে। কিছুই ঘটে নি, পৃথিবী আপন নিয়মে চলছে। মীরানও তার নিয়ম মেনে এগিয়ে চলেছে। বাসার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। একবার পেছনে তাকানোর ইচ্ছে হয়েছিল। সাহস হয় নি।

সাহস করে এবার পেছনে তাকায় মীরান। দুজনে উধাও হয়ে গেছে। এতো দ্রুত কোথায় গেল! ভেবে পায় না সে। দ্রুত হাঁটতে থাকে বাসার দিকে। ঘর্মাক্ত শরীর একদম শুকিয়ে গিয়েছিল। দেহ থেকে প্রাণ উবে গিয়েছিল। আবার প্রাণ ফিরে এসেছে দেহে।

সোজা বাসায় চলে আসে মীরান।

বোকার মতো ডাইনিং টেবিলে বসে থাকে।

কারিমা রান্না ঘরে ব্যস্ত। দু'একবার এসেছে ডাইনিং স্পেসে। একবারও চোখ তুলে তাকায় নি। তাকালে হয়ত মীরানের মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারতো। সে সুযোগ ঘটে নি।

মীরানের এখনো বোধশক্তি ফিরে আসে নি। রোবোটের মতো বসে আছে টেবিলে। টেবিলে পানির মগ। পাশে একটি গ্লাস। টেবিল ম্যাটের ওপর কয়েক ফোঁটা পানি পড়ে আছে। সেই দিকে তাকিয়ে আছে মীরান।

এমন সময় কলিং বেল বেজে ওঠে। কলিং বেলের শব্দটি বিদঘুটে। বিশ্রী রকম শব্দ তুলে থেমে থেমে বাজে। রান্না ঘর থেকে শেলী বেরিয়ে এসেছে। মীরানের টনক নড়ে নি। বেলের শব্দ কানে ঢোকে নি।

দরজা খুলে চিৎকার দেয় শেলী।

ছোট খালামণি এসেছে।

ছোট খালামণির কথা শুনে লাফিয়ে ওঠে রুনি। নিজের রুমে বসে কার্টুন দেখছিল সে। উঠে এসে খালামণির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মীরানের টনক এখনও নড়ে নি। বোকার মতো বসে আছে টেবিলে। ছোট শ্যালিকা কেয়া এসেছে। আনন্দ হওয়ার কথা। আনন্দ জাগে নি মনে।

রুনিকে কোলে নিয়ে রুমে ঢোকে কেয়া।

প্রথমে দেখে দুলাভাইকে। দুলাভাইকে ওরা বলে দুলা সাহেব। দুলা সাহেব শ্যালিকাদের কাছে খুব মজার মানুষ। এমন মানুষের এমন নিরুদ্ভাপ বসে থাকা পছন্দ হবে কেন কেয়ার।

কাছে এসে দাঁড়ায় সে। কান টেনে বলে, কী হাবা সাহেব। কী ভাবছেন?

টেবিল থেকে মুখ তুলে তাকায় মীরান। কেয়ার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়। পরক্ষণেই মুখে বোকার হাসি ফুটে ওঠে। যেন অন্য জগতে ছিল মীরান। এইমাত্র নেমে এসেছে মর্ত্যলোকে।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কেয়া। এমন সময় জোরে একটা হাঁচি দেয়। শুকনো মরিচ পোড়া গন্ধ ভেসে আসে ডাইনিং রুমে। পোড়া গন্ধে নাক জ্বলে ওঠে। হাঁচি আসে।'একদিকে হাঁচি অন্যদিকে মুখে হাসি। দুয়ের মিশ্রণে কেয়ার মুখে অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি জেগে ওঠে।

এবার সজোরে পিঠে এক থাপ্পড় দেয় কেয়া। মীরান নড়ে ওঠে। অন্যদিনের মতো মীরান হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেয় নি।

কেয়ার উল্লাস থেমে যায়। 'এনিথিং রং' দুলা সাহেব?

মীরান সামনে মাথা ঝাঁকায়। মুখে জবাব দেয় না। ভীতিকর ঘটনাটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মীরানের অভিব্যক্তি দেখে কেয়ার কৌতুকও থেমে যায়। আগ্রহ বাড়ে। প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়–

কী হয়েছে?

ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনাটাই তো শুনতে চাচ্ছি। খুলে বলেন।

মীরান পুরো ঘটনা খুলে বলে।

কেয়া আঁথকে ওঠে।

ডাইনিং স্পেস থেকে রান্না ঘরে ঢোকে। মুখে আতঙ্ক। আচমকা ফ্যাকাসে।

দুলা সাহেবের এ অবস্থায় তুমি রাঁধছো? কেয়া ধমক দিয়ে কারিমার দিকে এগিয়ে যায়?

রাঁধবো না তো নাচবো? কারিনাও ধমকে ওঠে।

বলো কি? এমন জটিল সংকট। আর তুমি নাচার কথা বলছো?

জটিল সংকট আবার কি? সংকট তো তার তৈরি। ইচ্ছে করে কেউ জটিলতা বাড়ালে আমার কী করা! কারিনার স্বর উচ্চ হতে থাকে।

কী বলো আপা, এ ধরনের ভয়াবহ অবস্থা কী কেউ নিজে নিজে তৈরি করতে পারে?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। পারে। তোর দুলা সাহেব পারে না এমন কোনো কাজ নেই।

আপা! তুমি ভুল বলছো। সংকটে স্বামীর পাশে থাকতে হয়। তুমি পাশে থাকছো না। সাপোর্ট দিচ্ছো না। খুব খারাপ। খুব খারাপ।

তোকে দালালী করতে হবে না। ফ্ল্যাট রেজিস্টেশনের সময় কি তোর মতামত নিয়েছিল?

আপা! ধমকে ওঠে কেয়া। আমার মত নেবে কেন? তোমার মত নেবে। নেয় নি তোমার মত?

না। নেয় নি। নিজের নামে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে। অথচ ফ্ল্যাটটি দু'জনের নামে করার কথা ছিল।

সেটা তো তোমাদের দু'জনের ব্যাপার। এখনকার ব্যাপার তো ভিন্ন। সন্ত্রাসী হুমকি দিয়েছে, ছিনতাই করেছে। এ সময় এ ধরনের প্রশ্ন তুলে মাথা গরম করছো কেন তুমি?

কি? কে হুমকি দিয়েছে? কারিনা কিছুই জানে না এখনো। তাই চিৎকার দিয়ে ওঠে।

কেন, দুলা সাহেব তোমাকে কিছু বলে নি?

না। বলে নি। থমথমে হয়ে যায় কারিনার মুখ।

থমকে গেলে কেন? যাও পাশে যাও। বিপদের সময় ঝগড়ার কথা মনে রাখতে নেই। সাহস দাও। পাশে দাঁড়াও।

কারিনা নড়ে না। কঠিন হতে থাকে। ছিনতাই, সন্ত্রাসের কথা কানে ঢোকে না। ঢুকলেও বিশ্বাস করতে পারছে না। নিশ্চয় এটা মীরানের চালাকি। আসল ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য।

ফুলকপি এবং শীম একত্রে মিশিয়ে ভাজি রান্না করছিল সে। ওই দিকেই তাকায়। উত্তপ্ত কড়াই এর মধ্যে খুন্তি দিয়ে নাড়া দেয়। হাতের থেকে কয়েক ফোঁটা পানি কড়াইতে পড়ে ছ্যান ছ্যানিয়ে শব্দ ওঠে। গরম তেল লাফিয়ে ওঠে। কারিনার মনও তেলের ছ্যাকার মতো ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে জ্বলে ওঠে।

কেয়াকে ধাক্কা দিয়ে বলে, তুই যা। তুই পাশে দাঁড়া।

কেয়া অবাক হয়। রেগে ওঠে। তবুও গলা শান্ত করে বলে, ভুল করো না আপা। পরিস্থিতি বুঝতে হয়। বুঝতে পারছো না তুমি। কারণ রেগে আছো। রেগে থাকলে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা যায় না। তুমিও মূল্যায়ন করতে পারছো না।

মূল্যায়ন করার দরকার নেই। এসব ওর চালাকি। কাহিনী ফেঁদেছে।

না আপা। মোটেই চালাকি না। ওনার ফেস দেখে বোঝা যায় ভয়াবহ কিছু ঘটেছে। দুলা সাহেবের এ রকম মুখ কখনও আমি দেখি নি।

কারিনার মন নরম হতে থাকে। যেভাবে দ্রুত উত্তপ্ত হয়, গরম হয়, নরমও হয় দ্রুত। তাছাড়া বাচ্চাদের সামনে সে অসাধারণ ভালো একটি মা। ওদের সামনে মেজাজ সংযত রাখার চেষ্টা করে।

ঘরে আছে এখন ছেলে মেয়ে দু'জনই। চাচাজানও আছেন। কেয়া এসেছে। পরিস্থিতি এখন রাগ দেখানোর অনুকূলে নয়। বুঝতে থাকে কারিনা। ধীরে ধীরে শান্ত হতে থাকে মন।

কেয়া চাচাজানের রুমে ঢোকে। একাকী। চাচাজান তাকে চিনতে পারছেন না।

কদমবুচি করে কেয়া। নিজে থেকে পরিচয় দেয়, আমি কেয়া। কারিনা আপুর ছোট বোন।

ওঃ। অবাক হয়ে সালামত মাওলা তাকিয়ে থাকে কেয়ার দিকে। কেয়ার ড্রেস অন্যরকম। বেশি মডার্ণ। ঢোলা শার্ট গায়ে। প্যান্ট পড়া। গায়ে ওড়না নেই। কার্ল করা চুল। মনে হচ্ছে মেন্দি লাগিয়ে লালচে করেছে। আধো কালো আধো লালচে। অন্যরকম একটি নারী সামনে দাঁড়িয়ে। থতমত খেলেন সালামত মাওলা। বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছু বলতে পারছেন না।

কেয়ার সংকোচ নেই। নিজে থেকে হরবড়িয়ে কথা বলে।

চাচাজান আমার বাসা চিড়িয়াখানার পাশে। চিড়িয়াখানায় গেছেন কখনও?

না, মা। ঢাকায় আসা হয় না। মাত্র কয়েকবার এসেছি। এবার তো ঢাকায় পড়ে এসেছি। কী যেন এক খারাপ রোগ ধরেছে টাঙ্গাইলের ছাতরাবা। ঢাকায় পাঠিয়েছে রোগটি কনফার্ম করার জন্য। জাপান বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ধানমন্ডি তিন-এ হাসপাতালটি। তোমার বাবা কারিনা মা'র কাছে পাঠিয়েছে। হাসপাতালটি নাকি কারিনার বাসার কাছে।

হ্যাঁ। কারিনা আপুর বাসার কাছে। তাছাড়া আপু তো সোশ্যাল সার্ভিস করে

চিকিৎসকরা সব ভালো। বেড়ায়। হাসপাতালের সবার সাথে তার ভালো পরিচয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রথিতযশা চিকিৎসকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক এই হাসপাতালটি। আমিও কয়েকবার ফলোআপের জন্য ওখানে গিয়েছি। আপনি নিশ্চিত থাকেন, ভালো চিকিৎসা পাবেন সেখানে। নিশ্চয় রোগ ভালো হয়ে যাবে।

দোয়া করো মা। ভালো হয়ে তোমার বাসায় যাবো। চিড়িয়াখানা দেখবো।

এখন আসেন এদিকে আসেন। দুলা সাহেবের বিপদ হয়েছে। দুলা সাহেব মানে দুলাভাই। আমরা ওনাকে দুলা সাহেব ডাকি।

কী বিপদ মা?

ওনার কাছে চলেন। সব শুনি। সাহস দেন। আসেন। বলতে বলতে কেয়া চাচাজানকে নিয়ে বেরিয়ে আসে। এসে দেখে টেবিলে নাস্তা রেডি। তবে দুলা সাহেব ডাইনিং স্পেসে নেই। বেড রুমে। কারিনা'পুও বেডরুমে। রূপম ও রুনি গেমস্ রুমে। ডাইনিং টেবিলের পাশে ছোট একটি টেবিল। ওই টেবিলের ওপর পানির বড় জার। এই এলাকায় কেনা পানি পান করতে হয়। জারের ট্যাপ লুজ। ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে ফ্লোর ভিজে যাচ্ছে। কারুর সেদিকে খেয়াল নেই। কেয়া জারের ট্যাপ ঠিক করতে বসে। ঠিক করতে পারছে না। গড়গড়িয়ে আরো বেশি জোরে পানি ঝরতে থাকে। ফ্লোর একদম ভেসে যাচ্ছে।

শেলী। এই শেলীএদিকে আয়।

শেলী দৌড়ে আসে। কারিনা খালাম্মাকে ভয় পায় না সে। খালাম্মা ভুল হলে বকে। আবার আদরও করে। ওনার কথায় সিরিয়াস সাড়া দেয় না। এখন ডাক দিয়েছে কেয়া খালাম্মা। গরম খালাম্মা। উল্টাপাল্টা হলে বিপদ। বিপদ যেখানে সাবধানতা সেখানে। ছুটে আসে শেলী। ছুটতে গিয়ে ভেজা ফ্লোরে পা পিছলে ধপাস করে আছাড় খায়।

চাচাজান বোকার মতো দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখলেন। কিছুই করতে পারছেন না। কেয়া কটমটে চোখে পতিত শেলীর দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে খিঁচড়ি দিয়ে বলে, নিজের দোষে নিজে মর। বেয়াদব মেয়ে। উঠে পানির ট্যাপ বন্ধ কর।

খালাম্মা, বেয়াদব কন ক্যা। আমি কি ইচ্ছে করে পড়লাম?

ওঠ। কথা বাড়াস না। ট্যাপ খোলা। আবারো ধমক দেয় গরম খালাম্মা। ধমক খেয়ে চুপ করে যায় শেলী। উঠে ট্যাপ বন্ধ করে। ট্যাপ বন্ধ করার কৌশল আছে। কৌশলটি জানে শেলী। কেয়া জানতো না। মুহূর্তে পানি পড়া বন্ধ হয়।

কেয়া এবার কারিনা'পুর বেড রুমের দিকে এগোয়। দরজা বন্ধ। নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেলে কেয়া। ভেতর থেকে লক করা নেই। ভেজানো দরজা চট করে খুলে যায়। দরজা খুলে অবাক হয় কেয়া। লজ্জাও পায়।

খাটে দুলা সাহেব লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। কারিনা'পু পাশে বসা। আদর করে মাথায় চুল টেনে দিচ্ছে। আপুর চোখে মুখে তৃপ্তির চিহ্ন ভেসে উঠেছে। দুলা সাহেবের মুখের পেশীও শীতল। অভিব্যক্তিহীন। একটু আগে মনে হয়েছে দু'জনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। ঘোরতর যুদ্ধ। এখন দেখছে স্নিগ্ধ তারা। এতো দ্রুত কীভাবে যুদ্ধ থেমে যায়। মনের আগুন কীভাবে নেভে? জানে না কেয়া। দৃশ্যটি তার ভালো লাগে। ভীষণ ভালো লাগে। এটাকে বলে প্রেম। এই আগুন। এই পানি। আগুন পানিতে নেভে। আবার পানির মধ্যে থেকে আগুনের লাভা লাফিয়ে ওঠে। হায়! রহস্যময় মানব জীবন। জীবনের রহস্য ভেদ করার ইচ্ছে এখন নেই। দৃশ্যটি চলতে থাকুক। জনম জনম চলতে থাকুক। ভাবতে ভাবতে হালকা টানে দরজাটি ভিড়িয়ে দেয় কেয়া। মুখে মৃদু হাসি ভেসে থাকে।

ফিরতি পথে কেয়ার মুখে হাসির রেখা দেখে অবাক হয় চাচাজান। এমন বিপদে মেয়েটি হাসে কেন? একটু আগে দেখেছে ক্রোধান্ধ এক তরুণীকে। এখন দেখছে মৃদু হাসি মাখা মুখ। কোথা থেকে আসে রাগ? কোথায় চলে যায়? কোথা থেকে আসে হাসি? কেন ভেসে থাকে মুখে? সব সময় এমন হাসিমাখা হতে পারে না মানব-মানবীর মুখ?

চাচাজান, চলুন আপনার রুমে যাই। পরে টেবিলে নাস্তা খেতে ডাকবো। দুলা সাহেব শুয়ে আছেন। আসেন সব আপনাকে খুলে বলি। বলেই চাচাজানের পিছন পিছন গেস্টরুমে ঢোকে কেয়া।

ঘটনা শুনে বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন সালামত মাওলা।

হায়! কোথায় নিরাপদ মানুষ।

এমন নিরানন্দময় ঢাকা নিয়ে মানুষের এতো দ্বন্দ্ব! এতো সংঘাত! মাথা জ্যাম হয়ে ওঠে সালামত মাওলার। গেস্ট রুমের বেডে বসে পড়েন তিনি। মাথায় তীব্র ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠেন। মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন তিনি।

পাখির মতো পাখা নেই। তাতে কী। নীড়ে বাস করতে অসুবিধে নেই। নীড়ে বাস করার বাসনা পূরণ করার জন্য আর্জেন্টিনার এক নারী পুরো এক বছর গাছে বসবাস করেছেন। নারীটির নাম রোকসানা পনস।

রোকসানা বলেছে, আমি গৃহহীন নই। আমার একটি বাড়ি আছে। তবুও আমি গাছ বেছে নিয়েছি। গাছে বসবাসের মজাই আলাদা।

কারিনা এতোকাল ভাড়া বাসায় বসবাস করেছে। এখন ফ্ল্যাটে উঠেছে। নিজেদের ফ্ল্যাট। নিজেদের বাসায় থাকার মজা আলাদা। টের পাচ্ছে সে। তাই মনোযোগ দিয়ে বিচিত্র বসবাসের খবরটি পড়ছে, প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় কলাম এক-এ হাই লাইট করে ছেপেছে নিউজটি। নিউজটি পড়ে চুপ হয়ে যায় সে। নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে আছে ফ্লোরের দিকে। ফ্লোরের মোজাইক সুন্দর। গাছের পাতার মতো সাজানো মোজাইকটি চোখে পড়ার মতো। আর কোনো বাসায় এমন মোজাইক দেখে নি সে। মনে হচ্ছে নিজেও পাখির বাসার মতো গাছের ডালে বাস করছে।

মানুষের প্রান্তির শেষ নেই। একটা পেলে আর একটা পেতে চায়। এক ইচ্ছা পূরণ হলে আর এক ইচ্ছা পূরনের জন্য ছুটতে চায়। ছুটতে ছুটতে এক সময় ফুরিয়ে যায়। বুড়ো হয়। পেকে যায়। মরে যায় মানুষ। তবুও ছোটা। জীবন দর্শনটি মনের আয়নায় ফুটে ওঠে। টেনশন বোধ করে কারিনা। পেপারটি গুছিয়ে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায়। বিকেল পাঁচটা দশ। এখনো ফেরে নি মীরান। অথচ এর মধ্যে ফেরে সে। ফিরছে না কেন? টেনশন বাড়তে থাকে। মোবাইল করার কথা মনে হয়। সাথে সাথে মনে পড়ে যায় মীরানের এখনও নতুন সেট কেনা হয় নি। চাচাজান ঘুমাচ্ছে। রুনিও ঘুমাচ্ছে। রূপকের স্কুল থেকে ফেরার সময় হয়েছে। একটু পরে ওদের টিচার আসবে। তখন রুনিকে তুলে দিলে চলবে। ভাবতে ভাবতে বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে সামনে।

সামনে খোলা জায়গা। দুই ইউনিটের এপার্টমেন্টের মাঝের অংশটি খোলা। আকাশ দেখা যায় খোলা অংশ থেকে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফুলের বাগান। চমৎকার পরিবেশ। আজকালকার এপার্টমেন্টগুলোতে এমন খোলা স্পেস রাখে না

ডেভেলপাররা। এটিতে আছে। এ কারণে বাড়িটির আকর্ষণ আলাদা। দম বন্ধ হওয়ার মতো ঠাসাঠাসি নেই। শান্তি লাগছে। ভীষণ শান্তি।

শান্ত মন নিয়ে করিডোর বরাবর দক্ষিণ প্রান্তে এগিয়ে আসে সে। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। সামনে কনশাস হাসপাতাল। বাংলাদেশ আই হাসপাতাল। ধানমন্ডি থানার নতুন অফিস। একটু সামনে যমুনা ব্যাংক। বড় রাস্তা স্পেরিয়ে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল। যমুনা ব্যাংক এবং গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের মাঝের বড় রাস্তাটি মীরপুর রোড। মীরপুর রোডের ওই অংশটি দাঁড়ানো অবস্থান থেকে দেখা যায়।

কারিনা ওই দিকে তাকিয়ে আছে।

মীরানের আসার পথ এটি। এখনো আসছে না। গাড়ি নিয়ে বের হয়েছে সে। দূর থেকে নিজেদের গাড়িটি চেনা যায়। কচুপাতা রঙের টয়োটা গাড়ির জন্য অপেক্ষমাণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

একটি কালো প্রাডো মীরপুর রোড থেকে বাঁক নিয়ে এদিকে আসছে। গাড়িটি চিনতে পারে কারিনা। এটি দেশের একজন বিশিষ্ট বিউটিশিয়ান এর গাড়ি। ওদের সামনের ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি। প্রায় প্রতিদিন ওই ফ্লাটে দেশের তারকারা আসে। নাটকের সুটিং হয়। কয়েকদিন ধরে হুমায়ুন ফরিদিরও সুটিং চলছে। এ নিয়ে রুনির মধ্যে এক ধরনের উল্লাস কাজ করে। কারিনাও সেই উল্লাসে মাঝে মাঝে শরিক হয়। রূপকের প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না।

মনের উল্লাস লাগাতার থাকে না। উল্লাসে হানা দেয় টেনশন। সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়েছে। কখন কোন বিপদ আসে, এ শংকায় কাটে দিন। কেউ বাসায় ফিরতে দেরি হলে টেনশন বেড়ে যায়।

এ সময় শেলী বাইরে আসে। হাতে কারিনার মোবাইল।

খালাম্মা। আপনার ফোন। মোবাইলে রিং বাজছে। কারিনা কলটি ধরে।

হ্যালো, কারিনা বলছি। কে বলছেন প্লিজ?

ম্যাডাম, আপনাকেই চাচ্ছিলাম।

আপনি কে?

আমাকে চিনবেন না। আপনাকে আমরা ভালোভাবে জানি। কোথায় যান, কী করেন, কার সাথে আপনার দহরম মহরম সব জানি আমরা।

কোথায় যাই মানে?

মানে যেখানে যেখানে যান, সব কিছুই ভিডিওতে ধারণ করা আছে। ওরিজিনাল ভিডিও পেতে হলে দুই লাখ টাকা নিয়ে দেখা করবেন। প্রস্তুত থাকুন টাকা নিয়ে। পরে আবার ফোন করবো।

দুই লাখ টাকা দেবো কেন? সাহসের সাথে উচ্চারণ করে কারিনা।

না দিলে ভিডিও আপনার বাপের বাড়িতে পৌঁছে যাবে। স্বামীর কাছে পৌঁছে যাবে।

পৌঁছে গেলে কী হবে?

যা হবার তাই হবে। আপনার সংসার ভাঙবে।

আমি তো এমন কিছু করি নি যে আমার সংসার ভাঙবে। যন্ত্রচালিত মানবীর মতো কথা চালিয়ে যেতে থাকে কারিনা।

কিছু করেন নি? করেছেন। টের পাবেন। সঠিক সময়ে টের পাবেন। কথা না রাখলে সব ফাঁস করে দেবো।

ঠিক আছে। ফাঁস করে দেন। আমার কোনো আপত্তি নেই। জোর গলায় বলে কারিনা।

আপনার দর্প চূর্ণ হবে। স্বামীর কাছে সব ফাঁস হয়ে যাবে। ভেবে দেখবেন আমাদের প্রোপোজালটা।

ভাবার কিছু নেই। আপনাদের যা খুশি ফাঁস করে দেন। আমাকে আমি চিনি। এমন কোনো অন্যায় করি নি যে ভিডিওতে ধারণ করবেন। আত্মপ্রত্যয়ী দৃঢ় কণ্ঠে ধমক দিয়ে লাইন কেটে দেয় কারিনা।

মাথা টনটন করে ওঠে। জানে সে এগুলো অশুভ গোষ্ঠির কোনো ষড়যন্ত্র। জানে তাকে ওরা ব্লাকমেইল করতে চাইছে। সুন্দরীদের টেলিফোন নম্বর জোগাড় করে এরা। টেলিফোন করে। টেলিফোনে হুমকি দেয়। যে সকল সুন্দরীদের দু নম্বর করবার আছে তারা ঘাবড়ে যায়। পরিস্থিতি নেগোশিয়েশন করতে চায়। এভাবে ভয়াডুবি হয়েছে অনেকের। পূর্বে শোনা অভিজ্ঞতার কারণে বুঝতে পারে সব। তাছাড়া নিজের কাছে নিজে পরিচ্ছন্ন, কোনো হুমকি পরোয়া করে না কারিনা।

নিজে চাপে পড়ে স্বামীর সাথে দ্বন্দ্বের কথা ভুলে যায়। বরং স্বামীর ওপর চেনা সন্ত্রাসীদের হুমকি নিয়ে এখন ভীতি বেড়েছে। স্বামীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।

টেলিফোনের হুমকি মোটেই পাত্তা দিচ্ছে না। পাত্তা না দিলেও গোপনে মনের মাঝে ঢুকে গেল অনিশ্চিত শংকার সূক্ষ্ম সুঁচ। বিষয়টি বুঝতে পারে না কারিনা।

রাত প্রায় দশটা বাজে। কারিনা বিছানায় শুয়ে আছে। রুনি নানাজানের রুমে গল্প শুনছে। মোবাইলে হুমকির কথা কাউকে বলে নি সে। মীরানও নেই যে তাকে

বলবে। সাধারণত এতো দেরি করে না সে। আজ করছে। মন ভীত হয়ে থাকে। কোনো বিপদ হলো নাতো? মনে দোল খেতে থাকে। ভয়ের দোল। সাধারণত আনন্দিত মন আনন্দের দোল খায়। কারিনার মন আনন্দে উদ্ভাসিত হয় না। ভয় পেলে সংকুচিত হয় না। দোল খায় সে। এক চিন্তার দড়ি থেকে লাফিয়ে আর এক চিন্তায় ঢুকে পড়ে। জাম্পিং বলা চলে না। বলা যায় মনের দোল খাওয়া। একক চিন্তায় বসে থাকতে পারে না, একটার পর একটা চিন্তার গিট তৈরি হতে থাকে মনে।

আজও চিন্তার গিট বাড়ছে।

ক্রিং। ক্রিং। কলিং বেল বেজে ওঠে। নিজে উঠে না। সাধারণত শেলী দরজা খোলে। আজও খুলবে। ও আশায় শুয়ে থাকে। গায়ে হালকা লেপ টেনে দেয়। ফ্যান ঘুরছে মাথার ওপর। তবুও লেপের তলে মজা আলাদা। লেপ টেনে নিয়ে উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে শোয়।

আবারো ডোর বেল বেজে ওঠে।

শেলী উঠছে না। দরজা খোলার নাম নেই। চান্স পেলে মেয়েটি নিজের রুমে ঘুম দেয় অথবা টিভির সামনে বসে থাকবে। জি সিনেমায় প্রতিটি ছবি তার দেখা চাই। সিনেমা দেখতে থাকলে তো বেল টের পাওয়ার কথা। তাহলে নিশ্চয় ঘুমোনো শুরু করেছে।

লেপ সরিয়ে ওঠে কারিনা।

দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কীহোলে চোখ না রেখে দরজা খোলে। দরজা খুলে দেখে পাশের বাসার খালাম্মা। হাতে একটা বাটি। বাটিতে নিশ্চয় মজাদার খাবার। ওনার বাসায় ভালো কিছু রান্না হলে রূপক-রুনি সেই খাবারের ভাগ পায়। ওদের না খাইয়ে খেতে পরেন না তিনি। বয়স হয়েছে খালাম্মার। দেখে এতো বয়স্ক মনে হয় না। তিনি আন্তরিক। খুব আপন। আজকালকার ফ্লাট বাড়িতে এমন দেখা যায় না। খালাম্মার কথা আলাদা। পুরো বাড়িই যেন ওনার। সবার সাথে সখ্যতা। আপন ভেবে সব সময় তিনি বাসার খোঁজখবর রাখেন। বাটি নিয়ে ডাইনিং টেবিলে রাখেন। রূপক-রুনিকে খোঁজ করেন তিনি। রুনি নানাজানের সাথে গল্প করছে শুনে খালাম্মা চলে যেতে উদ্যত হন।

এ সময় খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে মীরান। মলিন মুখ। হাতে একটা প্যাকেট। প্যাকেটে রয়েছে আঙুর। প্যাকেটটি ডাইনিং টেবিলে রেখে বেডরুমের দিকে এগিয়ে যায়। খালাম্মার মুখোমুখি হয়। ওনাকে দেখার সাথে সাথে মলিন মুখে হাসি ফোটে।

কারিনার চোখ সরু হয়ে যায়। খেয়াল করে মীরানকে। শব্দ উচ্চারণ করে না। চুপচাপ খাদ্যাধার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটা অন্য রকম মেজাজ নিয়ে বাসায় এসেছিল মীরান। মুহূর্তে সেই মেজাজটুকু মিলিয়ে গেছে। স্বাভাবিক ঢঙে কথা বলছে সে।

ভালো আছেন খালাম্মা?

হ্যাঁ, ভালো। তোমাদের বাসায় না এলে ভালো থাকা যায় না। আমাদের বাসায় তো সব বড়দের সমাগম। ছোট নেই। আমার একমাত্র নাতনীটিও বড় হয়ে গেছে। রুপক-রুনির সাথে কতক্ষণ কাটাতে না পারলে মন ভালো থাকে না। ছোটদের সান্নিধ্যে আলাদা মজা।

কই, ওদের দু'জনকে তো দেখছি না।

রুনি নানাজানের সাথে গল্পো করছে। এই মুহূর্তে ওদের গল্পের মজায় টান দিতে চাই নি। তাই দেখা না করে চলে যাচ্ছিলাম।

ওঃ, আচ্ছা। ঠিকই বলেছেন খালাম্মা। ছোটদের সাথে আনন্দের মজাই আলাদা। তবে এটাও ঠিক মুরুব্বী কেউ ঘরে না থাকলেও ঘর শূন্য শূন্য লাগে। ভালো লাগে না।

এখন তো একান্নবর্তী পরিবারের যুগ নেই। সবাই একা থাকতে চায়। স্বামী স্ত্রী এবং বাচ্চাদের নিয়ে আলাদা সংসার পাতে। এখন কি আর আমাদের যুগ আছে?

আলাদা সংসারে কি জৌলুশ থাকে? আলাদার মজা নেই খালাম্মা। সবার মাঝে থাকাটাই সুখ। নিউক্লিয়ার পরিবারে প্রশান্তি বেশি, ঝগড়া বেশি, সন্দেহ বেশি...

কথা আর চালিয়ে যেতে পারে না মীরান। থেমে যায়। চোখাচোখি হয় কারিনার সাথে। চোখে কী আছে বুঝতে পারে না মীরান। এটা বুঝতে পারে, ক্ষুব্ধ হচ্ছে কারিনা। এ ধরনের কথাবার্তা বলা পছন্দ করে না সে। ক্ষুব্ধ চোখের সামনে কথা চালানো যায় না। থেমে যায় সে।

দু'জনের চোখাচোখির ঝগড়া বুঝতে পারে না খালাম্মা। হাসিমুখে বেরিয়ে যান তিনি।

বেডরুমে এসে ঢুকে মীরান। উষ্ণ মেজাজ এখন থমথমে।

কারিনাও থমথমে মেজাজ নিয়ে বেডরুমে ঢোকে। কেউ কোনো শব্দ ব্যবহার করছে না। নিঃশব্দতার মাধ্যমে চলতে থাকে কথাবার্তা। ঝাঁঝালো অনুভূতি জেগে ওঠে মনে। উভয়ই ঝাঁঝ এবং তেজ নিয়ে নীরব ক্ষুব্ধতায় ডুবে যেতে থাকে।

এ সময় রুনি ঢোকে বেডরুমে। কম করে বাপির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নিজের রাগের কথা ভুলে যায় মীরান। রুনিকে বুকে জড়িয়ে ধরে। আদর জেগে ওঠে মনে। রাগ এখন স্নেহের ফল্গুধারায় সিক্ত। মুখে স্বাভাবিক হাসি ফুটে ওঠে।

রুনিকে নিয়ে বেরিয়ে আসে মীরান। চাচাজানের রুমে আসে।

এখন কেমন আছেন চাচাজান?

একটু ভালো লাগছে।

রিপোর্ট সব হাতে পেয়েছেন?

না এখনো সব পাই নি। বিকেলে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। আরো কয়েকটি রিপোর্ট বাকি আছে। কারিনা মামণি আগামীকাল নিয়ে আসবে।

ওঃ, আচ্ছা। ঠিক মতো ওষুধ খাবেন। আর যতোদিন ইচ্ছে ঢাকায় থেকে যাবেন। আপনাকে পেয়ে রুপক-রুনি ভীষণ খুশি। আপনি থাকলে আমিও খুশি। কারিনাও খুশি।

বেশিদিন থাকা কি সম্ভব? বাড়িতে অনেক কাজ।

কী এতো কাজ? রিটায়ার করেছেন। সারা জীবন তো কাজ করেছেন। এখন বেড়াবেন। সহজে আপনাকে ছাড়ছি না আমরা। কী বলো রুনি?

রুনি হাততালি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। রুপকের প্রতিক্রিয়া তেমন জোরালো না হলেও সেও খুশি।

সবাই উল্লাস করছে। ওদের উল্লসিত আনন্দ ধ্বনি কারিনার কানে ঢোকে। চাচাজানের রুমে আসার ইচ্ছে জাগে। নিজের ক্রোধ কমে এসেছে। তবুও নিজের রুমে বসে থাকে।

মীরান ফিরে আসে নিজের রুমে। ওকে দেখার সাথে সাথে কারিনার মুখ আবারো থমথমে হয়ে যায়। মীরানের মুখের পেশীতেও কঠোরতা জেগে ওঠে।

গায়ের শার্ট খুলতে খুলতে থমথমে গলায় মীরান প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, কোথায় কোথায় সময় কাটাতে যাও তুমি?

স্ফুলিঙ্গের মতো ঝলসে ওঠে কারিনা।

সময় কাটাতে যাই মানে?

মানে তুমি ভালোই জানো। যেখানে যাও না কেন, জায়গাটা ভালো না, বুঝতে পারো নি তুমি।

মুখ সামলে কথা বলো। ফেপে ওঠে কারিনা।

কেন? মুখ সামলাবো কেন? তুমি তো অভদ্রতা সামলে চলো না। অবিশ্বাসী তুমি তো নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াও।

সাটআপ। কারিনা চিৎকার দিয়ে ওঠে।

চিৎকার দিয়ে লাভ নেই। আমার মুখ বন্ধ করে লাভ নেই, যারা তোমার রোমাঞ্চের দৃশ্য ভিডিও করেছে, তাদের কাছে গিয়ে চিৎকার দিও।

ঝপ করে নিভে যায় কারিনা।

ওঃ। তাহলে কেবল তাকেই প্রতারকরা টেলিফোনে করে নি, মীরানকেও করেছে। মনের দুঃখে এ কারণে মীরান রাত করে ঘরে ফিরেছে। এ কারণে ক্ষুব্ধ চোখে কথা বলছে। এমন করে তো সে কথা বলে না। কেবল কারিনা বাসায় উচ্চস্বরে কথা বলে। চিৎকার করে। ঝগড়া করে। তার ভালোবাসা এবং স্নেহের প্রকাশভঙ্গিও উচ্চাঙ্গ ধারায় চলে।

মুহূর্তেই কারিনার ঘরের তলিউম কমে যায়। থতমত খেয়ে বলে–

ওঃ। তাহলে টেলিফোন তুমিও পেয়েছ।

হাঁ। পেয়েছি। আকাম কুকাম করে বেড়াবে আর টেলিফোন পাবো না?

রেগে উঠতে গিয়েও থেমে যায় কারিনা। মাথা ঠান্ডা রেখে বলে, কত লাখ চেয়েছে তোমার কাছে?

দুই লাখের বিনিময়ে সব রেকর্ড ফিরিয়ে দেবে বলেছে। মাত্র দু'লাখ। বুঝেছ? রেকর্ড আবার কি?

যা যা করেছ, যা যা নারী পুরুষ করে তারই রেকর্ড।

ওঃ। তাহলে মোবাইলের তথ্য তুমি বিশ্বাস করেছ?

করবো না কেন?

করবে না। সব মিথ্যে অভিযোগ যাচাই না করে তুমি বিশ্বাস করবে? ধমক দেয় কারিনা।

মিথ্যা? তাহলে ভিডিও?

ভিডিও কি দেখেছ তুমি?

না। দেখি নি।

তাহলে অনের মনগড়া অভিযোগ বিশ্বাস করবে? এগুলো যে সন্ত্রাসীদের কুটকৌশল একবারও ভাবতে পারলে না? এক কথায় সব বিশ্বাস করে নেবে?

মীরানের গলা থেমে যায়। মনে মনে ভাবে তাই তো, এগুলো তো সন্ত্রাসীদের ট্রাক মেইদিং হতে পারে। ওকে চুপ থাকতে দেখে কারিনা তেতে ওঠে।

যাও। ভিডিও আনো। হাজির করো। দেখি কে সত্য। সন্ত্রাসী না নিজের বউ। যাও! চিৎকার করে ওঠে।

চিৎকার দিয়ে থেমে যায় কারিনা। ঘরে চাচাজানের কথা মনে পড়ে। বাথরুমে ঢোকে সে। দরজা বন্ধ করে। হু হু করে কাঁদতে থাকে।

মীরানের চোখের ছিল ক্রোধ। এখন জেগেছে ভয়। সত্যিই তো। এটা যে ভুল হতে পারে, একবারও ভাবে নি, শুনে দুম করে সব বিশ্বাস করে নিয়েছে সে। নেওয়া কি উচিত হয়েছে? না। উচিত হয় নি। মোটেই উচিত হয় নি।

রুপক বেডরুমে এসে ঢোকে। ক্ষুব্ধ চোখে বাপিকে জিজ্ঞেস করে, মামনি কোথায়?

মীরান শার্ট খুলে গেঞ্জি গায়ে দিচ্ছিল। আচমকা ক্ষুব্ধ প্রশ্ন শুনে থেমে যায় হাতের কাজ। গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে একচোখে দেখে নেয় ছেলের মুখের অভিব্যক্তি। ভয়াবহ ক্রোধ জেগে আছে ওইটুকু মুখে। মনে হচ্ছে চিৎকার দিয়ে ফেটে পড়বে ছেলে।

না। তা মোটেই করে নি সে। খাটের কাছে দাঁড়িয়ে এক পা ওপরে তুলে দাঁড়ায়।

তোমার মা বাথরুমে। ধীরে ঠান্ডা গলায় জবাব দেয় মীরান।

মা'কে বকেছ কেন? আবারো শাণিত জিজ্ঞাসা।

বকি নি। তোমার মা আমার ওপর রাগ করেছে।

বকেছ তুমি। সব সময় বকো। এতো খারাপ বাবা কেন তুমি?

নিজের সম্পর্কে ছেলের উপলব্ধি দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মীরান। কোনো জবাব মুখে আসে না।

আচমকা খাটের ওপর থেকে কোল বালিশটি তুলে নেয় রুপক। ছুঁড়ে দেয় স্লাইডিং উইন্ডোর দিকে। গটগট করে বেরিয়ে আসে বেডরুম থেকে। নিজের রুমে ঢুকে দ্রিম করে লাথি মারে ফ্লোরে পড়ে থাকা ফুটবলে। তারপর ঝাঁপ দেয় খাটের ওপর। ফুঁসতে থাকে।

অনেকক্ষণ পর ফোঁসফোসানি কমে আসে। শান্ত হয়ে শুয়ে থাকে।

বাবার সাথে ছেলের কথোপকথন শুনেছে কারিনা। নিজেদের সমস্যার সাথে ছেলেমেয়েকে জড়াতে চায় না সে। উড়িয়ে যাচ্ছে তবুও। ছেলে বাবাকে শব্দবানে আক্রান্ত করেছে। পছন্দ হয় নি কারিনার। নিজেদের সমস্যা নিজেরা মেটানো উচিত। ছেলেমেয়েকে জড়ানো ঠিক না। 'হ্যালো আপনাকে বলছি' টিভি অনুষ্ঠানে মনোচিকিৎসকের কথা শুনেছে সে। সাবধান থাকে এ কারণে। তবুও ঘটে যাচ্ছে অঘটন। খারাপ মন আরো খারাপ হয়। রাগের সাথে বিষাদ বাসা বাঁধে মনে। ছেলের রুমে আসে সে। খাটের ওপর বসে আলতো করে মাথায় হাত বোলায়। মাথা সরিয়ে নেয় রুপক।

সরো। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে সে।

নিজেকে গুটিয়ে নেয় কারিনা। চুপচাপ বসে থাকে। ছেলের মেজাজ দেখে নিজের মেজাজের কথা ভুলে যায়, চাপা পড়ে যায় কিছুক্ষণ আগের ক্রোধ।

ফিরে আসে নিজের রুমে। খাটের একপাশে গিয়ে শুয়ে থাকে। নিঃশব্দ উপস্থিতি।

মীরান অন্যপাশে শুয়েছে। কপাল টিপে ধরে আছে সে। মাথা জ্যাম হয়ে গেছে। ছেলের আচরণে কিছুটা হতবাক হয়েছে। বউ এর আচরণ সইতে পারে, প্রতিক্রিয়াও দেখাতে পারে সে। ছেলের আচরণ তাকেও থমকে দিয়েছে।

খাটের একপাশে কারিনা, অন্যপাশে মীরান।

মাঝে নেতিবাচক উপলব্ধি স্রোতের মতো বহমান। দ্বন্দ্ব দু'জনের মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। বুঝতে পারছে না। নিজেদের ভালোবাসায় বিষ ঢুকে যাচ্ছে। মায়ার বাঁধনে শিথিলতা জাগছে। এ মুহূর্তে এসব কিছু বোঝার সময় নেই। নিজেদের তৈরি কমপ্লেক্সে নিজেরা পুড়ছে। মাঝে হাজির হয়েছে সন্তানের বাস্তব উপস্থিতি। সময় বয়ে যাচ্ছে। কেউ কথা বলছে না। দু'জন শক্ত। দু'জনেরই মন খারাপ। কারিনা ভাবছে সব দোষ মীরানের। মীরান ভাবছে সব দোষ কারিনার। নিজেকে কেউ দোষী ভাবতে পারছে না, নিজের সমালোচনা কেউ নিজে করতে পারছে না। অদ্ভুত সংকটে দিনে দিনে জড়িয়ে যাচ্ছে স্বামী-স্ত্রী।

মীরান একটু নড়ে ওঠে। কিছু বলার চেষ্টা করে। গলা দিয়ে কথা বের হয় না। এক ধরনের বাধা ইচ্ছের লাগাম ধরে টান দেয়। বাম পাশ ফিরে শোয়। কারিনা শোয় ডান পাশ ফিরে। দু'জনের পিঠ মুখোমুখি, মুখ উল্টো দিকে। জীবনের গতি কি এমনই। মুখোমুখি জীবন কী উল্টোগামী হয়? সময়ের স্রোতে ধাবমান জীবনের এমনই কী পরিণতি? ভাবতে গিয়েও ভাবতে পারে না মীরান। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে থাকে। কারিনাও তাকিয়ে আছে সামনের দেয়ালের দিকে। শক্ত কঠিন দেয়াল দিনে দিনে যেন কাছে ঝিড়ছে। কাছে এগিয়ে আসছে।

রাতের খাওয়া এখনো হয় নি। শেলী টেবিলে খাবার সাজিয়েছে। রূপক উঠছে না। রুনি নানাজানকে নিয়ে টেবিলে এসেছে।

রুনি ডাকে, মামণি এসো, খেতে এসেছি আমরা।

কারিনা সহজ হয়ে উঠে দাঁড়ায়। মীরানও নড়ে ওঠে। রুম থেকে কারিনার বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। এক সময় উঠে বাথরুমে যায়। পরনের কাপড় বদলায়। বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়। মুখে ক্রিম ঘষে। তারপর ডাইনিং টেবিলে এসে বসে।

টেবিলে সবাই এসেছে। রূপক নেই। চাচাজান খাওয়া শুরু করছেন না। রূপককে ছাড়া খাবেন না তিনি। এ সময় রূপককে ডাকতে যাওয়া বিপজ্জনক, জানে মীরান। কারিনাও জানে।

রুনি ডাকে, ভাইয়া এসো। খেতে এসো। সবাই আমরা টেবিলে।

রূপক আসছে না।

ভাইয়ার রুমে যায় রুনি। গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে, ওঠো ভাইয়া। সবাই তোমার জন্য বসে আছে। খেতে এসো।

কিছু বোঝার আগে একটা চড় এসে পড়ে রুনির গালে।

রুনি আচমকা হতবিহ্বল হয়ে উদ্ভ্রান্ত গতিতে লাফিয়ে ওঠা রূপককে দেখে। বাম হাত গালের ওপর চেপে ধরে বেরিয়ে আসে রুম থেকে। ডাইনিং স্পেসে এসে ফুঁফিয়ে কেঁদে ওঠে।

এ মুহূর্তে কি করা উচিত, কেউ বুঝছেন না।

নানাজান উঠে রুনিকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। রুনির কান্না আরো বেগবান হয়। হু হু করে কাঁদতে থাকে সে।

মীরান স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কারিনা একবার ওঠে। রূপকের রুমের দিকে এগিয়ে যায়। গিয়েও ফিরে আসে। চাচাজানের হাত থেকে রুনিকে টেনে নেয় বুকে। নিজের রুমে ঢুকে দরজায় হুক লাগায়। মুহূর্তের মধ্যে বাসার পরিবেশ বদলে যায়। চাচাজানও স্তব্ধ। মীরানও স্তব্ধ। সবাই খাবার কথা ভুলে গেছে।

অফিস রুমে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মীরান।

মনে স্বস্তি নেই। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ডাক আসতে পারে। জরুরি কাজের দায়িত্ব আসতে পারে। অপেক্ষায় আছে মীরান। সামনে গুলশান দুই নম্বর ট্রাফিক চত্বর। গাড়ির বহর জাম হয়ে আছে। পাশে ল্যাবএইড গুলশান ব্রাঞ্চের সুসজ্জিত বিল্ডিং। এখানে নতুন যাত্রা শুরু করেছে ল্যাবএইড। গুলশান, বনানী, বারিধারার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের আশা নিয়ে শুরু হয়েছে এই এলাকায় ল্যাবএইডের কাজ। দেশের উন্নতি হচ্ছে। চিকিৎসা সেবায় মডার্ণ টেকনোলজির প্রসার ঘটছে। ভাবতে গিয়ে ভালো লাগে মীরানের। চাপে থাকলে দৈহিক মানসিক সমস্যা বাড়ার সম্ভাবনা বেশি। সেও চাপে থাকে। ভাবছে একবার গিয়ে থরো চেকআপ করে আসবে। দেশের সব সেরা বিশেষজ্ঞরা সকাল বিকাল এখানে বসছেন। সুযোগ হাতের কাছে। নিজের ফিটনেস বজায় রাখার বিকল্প নেই। সন্ত্রাসীদের হুমকিও মাথায় আছে। কারিনার মোবাইলেও হুমকি। এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় চেপে আছে মন। এমনি অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্যে বিপর্যয় আসতে পারে। সতর্ক থাকতে হবে, মনের চাপ কমাতে হবে, উন্নত চিকিৎসা সেবার সুযোগ নিতে হবে... ভাবতে ভাবতে জানালার পাশ থেকে নিজের চেয়ারে এসে বসে মীরান। এমন সময় টেলিফোন ভেজে ওঠে।

রিসিভার তুলে কানের কাছে ধরে চুপ করে থাকে মীরান। একটু গ্যাপ দিয়ে বলে, মীরান চৌধুরী স্পিকিং, কে বলছেন প্লিজ।

হি-হি-হি...। নরম কণ্ঠের মিহি হাসি ভেসে আছে।

ওঃ। তুমি!

হ্যাঁ। আমি। হাসি থামিয়ে জবাব দেয় মেয়েটি।

তোমার নাম জানা হয় নি, নাম কি?

নাম আপনি দিন। নতুন নামে পরিচিত হই। দেবেন আমার একটি নতুন নাম?

কেন, নিজের পরিচয় দিতে চাচ্ছো না কেন?

বাহ্। নিজের আংশিক পরিচয় তো আপনার টেবিলে আছে। আমার বন্ধুর

দরখাস্ত আপনার টেবিলে আছে। ইচ্ছে করলে যোগাযোগ করতে পারেন বন্ধুর সাথে। আমার পরিচয়ও পেয়ে যাবেন। তাছাড়া মোবাইল নম্বরটিও তো আপনি স্টোর করতে পারেন। করেন নি। বুঝতে পেরেছিলাম। তাই লাভ কোনে কল করলাম।

পুরো পরিচয় দেবে না কেন?

চট করে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়। কিছুটা শীতল কণ্ঠে মেয়েটি বলে, নতুন পরিচয়ই ভালো, নতুন নাম ভালো। পুরাতনে দাগাদাগি অত আছে। অত মিত্র কারুর সাথে পরিচয় হয়ে লাভ হবে না। কষ্ট বাড়বে।

ওঃ। তাহলে লাভের জন্য ফোন করেছ?

হ্যাঁ। লাভের জন্যই তো। বন্ধুর চাকরির জন্য তদবির করছি। চাকরিটা খুব প্রয়োজন।

নতুন পরিচয়ের আর কোনো লাভ নেই।

আছে। থাকবে না কেন?

কী সেটা?

এই যে আপনার সাথে কথা বলছি, কথা বলতে পেরে মন ভালো হয়ে যাচ্ছে। এই যে আপনার সময় কেড়ে নিতে পারছি, বন্ধুত্বের জন্য এমন মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া লাভ নয় কি?

মেয়েটির বাক চাতুর্যে মুগ্ধ হয় মীরান। তবুও বাজিয়ে দেখতে মন চায়।

আমি ছাড়া আর ক'জন আছে এমন বন্ধু?

হো হো করে হেসে ওঠে মেয়েটি। হি হি মিহি সুর হো হো হাসিতে বদলে যায়।

অট্টহাসির অর্থ কি? মীরান জানতে চায়।

অর্থ সহজ। সব পুরুষ মেয়েদের সন্দেহের চোখে দেখে। আপনিও সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। এ কারণে পেট ফুঁড়ে হাসি বেরিয়ে এসেছে।

এমন গায়ে পড়া স্বভাবের মেয়ের প্রতি সন্দেহ রাখা কি অস্বাভাবিক?

না। না। অস্বাভাবিক না। স্বাভাবিক। গোমড়ামুখো ইনট্রোভার্ট মেয়েদেরকেও আপনারা সন্দেহ করবেন, সেটিও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তো এমন সন্দেহপ্রবণ মেয়েটির সাথে কি মাঝে মাঝে ফোনে কথা বলা যাবে?

সরাসরি প্রস্তাবে মীরান উত্তর দেয় না। ভালো লাগে কথোপকথন। মাঝে মাঝে নিজের বেডরুমে দম বন্ধ হয়ে আসে। গুণীজনেরা এ কারণে বেডরুমের সাথে বারান্দায় প্রচলন করেছেন। মনের ঘরেরও একটা বারান্দা রাখা ভালো।

স্বাস্থ্যকর। মন খুলে সেখানে কথা চলবে। স্বার্থের টানাপোড়নে পুড়বে না মন। ক্ষতি কী বন্ধুত্বে!

মীরান বলে, ম্যারিড লোকেরা শয়তানের হাড্ডি। চান্স পেলে টীনএজারদের প্রতি হাত বাড়ায়। জানো বিষয়টি?

আবারো মিহি হাসি ফোটে মেয়েটির মুখে।

জানি, জানি। ওই হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কৌশলও জানা আছে।

বাহ্। দারুন অভিজ্ঞ তুমি। এমন অভিজ্ঞ মেয়েটির সাথে নিরাপদ বন্ধুত্ব তো চলতে পারে। ইতিবাচক অনুমোদন বেরিয়ে আসে মীরানের ভেতর থেকে।

থ্যাংকস আপনাকে। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আমার একটি নাম দিয়ে দিন। সেই নামে আপনার সাথে যোগাযোগ হবে।

মীরান কিছুক্ষণভাবে। তারপর চট করে বলে, ঠিক আছে তোমাকে লাবণ্য বলে ডাকবো, রাজি, লাবণ্য?

হ্যাঁ। খুব রাজি। ধন্যবাদ আপনাকে। আমার মোবাইল নম্বরটি এন্ট্রি করে রাখুন। আমার নাম্বার তো আপনার মোবাইলে উঠেছে।

মীরান নাম্বারটি এন্ট্রি করে। জানালার পাশে আবার এসে দাঁড়ায়। গুলশান দুই নম্বর ট্রাফিক মোড়ের বাম পাশে প্লাজা সেন্ট্রাল। এর পাশের বিল্ডিং এর উপরে রয়েছে ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড। বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপন বোর্ডে একটার পর একটা ডিসপ্লে হচ্ছে। উন্নত টেকনোলজির কারণে ঢাকা শহরের চিত্র বদলে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে মীরান। মুগ্ধ হলেও ট্রাফিক মোড়ে চলন্ত বিজ্ঞাপনগুলো নিয়ে মনে শংকা জাগে। গাড়ি ড্রাইভ করার সময় ওই দিকে চোখ গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এমন ব্যবস্থা বিপজ্জনক। বিপজ্জনক হলেও দৃষ্টিনন্দন। জ্যামে আটকে থাকা যাত্রীরা ক্ষণিকের বিনোদন পেয়ে যায়। বিপজ্জনক অবস্থায় থেকেও এভাবে আনন্দ পাওয়া যায়। লাবণ্যের সাথে সম্পর্কটিও বিপজ্জনক। এই বিপদের মাঝেও আছে শিহরণ। আছে আনন্দ। জীবন মানে তো আনন্দ বেদনার কাব্য। ছন্দে ছন্দে কাব্য রচিত হয়। ঘটনার পর ঘটনায় জীবন এগিয়ে যায়। থেমে থাকে না সময়, সময়ের চোরাবালিতে হারিয়ে যায় অনেকে। লাবণ্যও হারিয়ে যাবে। ক্ষতি কী, বর্তমান মুহূর্তে আনন্দে কুড়িয়ে নিতে দোষ কোথায়। নিজের যুক্তিতে নিজে শাণিত হয় মীরান। এমন সম্পর্কটিকে নিজের মনে গ্রহণ করে নেয়, জায়েজ করে নেয়।

এই মুহূর্তে টেনশন কমে এসেছে। অস্থিরতা কমে এসেছে। জানালার পাশ থেকে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে সে।

ছুটির ফাইলটি সামনে এসেছে। কয়েকজন ছুটির জন্য আবেদন করেছে। বছর শেষে সবার ছুটি জমে আছে, জমা ছুটি উপভোগের জন্য সবাই উদগ্রীব।

সবাইকে ছুটি দেওয়া যাবে না। অফিস চালানো কঠিন হয়ে যাবে। ফাইলের দরখাস্তগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখে মীরান।

ফাইন্যান্স অফিসার ইব্রাহিম সাহেবের দরখাস্তটি টেনে নেয়, লাল কালি দিয়ে লেখে ছুটি মঞ্জুর করা হলো।

ইব্রাহিম সাহেব নিজেকে সৎ হিসেবে প্রমাণ করেছেন। যোগ্য লোক। অফিসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করেন। শত ঝামেলায় ছুটি কাটাতে পারেন না। প্রায় তার ছুটির আবেদন বাতিল করতে হয়। নীরবে সব সয়ে যান, প্রতিবাদ করেন না। বস তাকে বিশ্বাস করেন, নির্ভরশীল মনে করেন, এটাই ইব্রাহিম সাহেবের সুখ। কাজকে তিনি কাজ হিসেবে দেখেন। অনেক চাপের মাঝেও তিনি উৎসাহ নিয়ে কাজ করেন, মলিন হন না। জানে মীরান। আজ তাকে পুরস্কৃত করা দরকার। তাছাড়া লাবণ্য এসেছে বন্ধুর চাকরির জন্য। ইব্রাহিম সাহেব লাবণ্যের সোর্স। লাবণ্যের সোর্স তারও প্রিয়ভাজন। আজকের দিনের বাকি অংশটুকু লাবণ্যের মিহি হাসিতে ভরে থাকুক। এটা গোপন উপহার। লাবণ্যের জন্য উপহার। এই উপহারের কথা লাবণ্য জানবে না। কেবল গোপন তৃপ্তি নিজের মধ্যে কাজ করাবে। গোপন তৃপ্তি পাওয়ার আনন্দ হাত ছাড়া করবে কেন সে। গোপনের খেলা গোপনেই চলুক। একটা টীনএজার তার সাথে বন্ধুত্ব করতে চায়, বিষয়টি নিজের মাঝে আর এক গোপন শক্তি ঢুকিয়ে দিয়েছে। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। নিজের যোগ্যতা নিয়ে নিজে তৃপ্ত। তৃপ্ত হয়ে নিজের নৈতিক শক্তির কাছে কি নতজানু হয়ে যাচ্ছে না সে? প্রশ্ন আসে মনে। সচেতনভাবে উত্তরটি অবচেতনে ঢুকিয়ে দেয়। উত্তর খুঁজতে চায় না। অনেক বাস্তব উত্তর 'এভয়েড' করতে হয়। জীবন এমনই। এমন ধারায় চলছে অনেকে। সেও তো ব্যতিক্রম নয়। নিজেকে প্রবোধ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এ সময় টেলিফোন বেজে ওঠে।

কে হতে পারে? লাবণ্য নয় তো?

দ্রুত সেটটি তুলে নেয় মীরান। চুপ করে থাকে।

হ্যালো, হেড অফিস থেকে বলছি, চেয়ারম্যান স্যারের পিএ বলছি।

মীরান সচেতন হয়।

হ্যাঁ। বলুন।

স্যার আপনার সাথে কথা বলবেন, লাইনে থাকুন।

মীরান সাহেব।

জ্বি স্যার।

নতুন প্রজেক্টের খবর বলুন। লোক নিয়োগের কী হলো।

জ্বি স্যার, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। দরখাস্ত জমা পড়ছে।

দ্রুত নিয়োগের কাজ সেরে ফেলুন।

জ্বি স্যার।

আমার কয়েকজন প্রার্থী আছে। লিস্ট পাঠিয়ে দেবো। লিস্ট অনুযায়ী কাজ সেরে দেবেন। তবে আমার লিস্টে একদম অযোগ্য কেউ থাকলে বাদ দিতে পারবেন।

জ্বি স্যার।

প্রজেক্টের জন্য যোগ্য লোক দরকার। মনে রাখবেন।

জ্বি স্যার।

আপনার ওপর আমার অগাধ আস্থা আছে। জানেন নিশ্চয়।

জ্বি স্যার।

বিশ্বাস বজায় রাখবেন।

জ্বি স্যার।

টুং করে শব্দ হয়। লাইন কেটে দিয়েছেন চেয়ারম্যান সাহেব। মীরান এখনো কানে ধরে আছে রিসিভার।

কানে ভাসতে থাকে 'আপনার ওপর আমার অগাধ আস্থা আছে। জানেন নিশ্চয়।'

মন ভালো হতে থাকে মীরানের। অস্থিরতা কমে যায়।

লাবণ্যর ফোন নিজেকে আস্থাশীল করেছে। বসের ফোনে আস্থা এবং বিশ্বাসের অনুভূতি তাকে আরো বেশি 'কনফিডেন্ট' করেছে। অফিস স্টাফরাও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সৎ। ঘরের বাইরে সফল সে। ঘরের ভেতর?

উঁহু একদম ব্যর্থ। ঘরের কথা মনে হওয়ার সাথে কারিনার কথা মনে হয়। কারিনার ক্ষোভে থাকার কথা মনে হয়। সন্ত্রাসীদের হুমকির কথা মনে হয়। নিজস্ব আস্থার ফাটল তৈরি হয়ে যায়। মন বেশিক্ষণ ভালো থাকতে পারে না আবার খারাপ হয়ে যায়। আবার টেনশন হানা দেয়। কী করবে বুঝতে পারছে না সে। বাসায় ফোন করা দরকার। কনির কণ্ঠ শোনা গেলে মন ভালো হয়ে ওঠে। ওরা এখন বাসায় নেই। স্কুলে। বাসার ফোনে ওদের পাওয়া যাবে না।

নিজেকে সামলে করে অফিসের কাজে মন দেয় মীরান।

ফাইলের পর ফাইল ঘাটতে থাকে।

ফাইলের নোটের পাশাপাশি হঠাৎ নিজস্ব ফ্ল্যাটের ডিটেইল ভেসে ওঠে।

ফাইলের ফাঁকফোকর দিয়ে সে বেশ টাকা কামিয়ে নিয়েছে। সেই টাকা জমিয়ে এপার্টমেন্ট কিনেছে। এই এপার্টমেন্টের কারণে দুই ধরনের বিপদের মুখে আছে। ঘরে বিপদ, বাইরে বিপদ। রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কারিনার হুমকি, সন্ত্রাসীদের আবার দেখা করার হুমকি, সব মিলিয়ে কি মনে সুখ আছে? নেই। তবে কি অসৎ উপায়ে অর্জিত টাকায় সুখ পাওয়া যায় না? ভাবতে ভাবতে কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

লাবণ্যের কথা মনে হয়। লাবণ্য সম্পর্কটিও সৎ নয়। অসৎ। সর্বত্র অসতের ছড়াছড়ি। অথচ সবাই জানে সে সৎ। অসৎ সম্পর্কের কারণেও কি তবে মনের সুখ হারিয়ে যাবে? ভাবতে চায় না মীরান। ভাবনা এসে যায়। অসমাপ্ত ভাবনা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাথরুমে ঢোকে। আয়নায় নিজেকে দেখে। নিজেকে বেশ প্রত্যয়ী মনে হয়। শত ঝামেলার মাঝেও প্রত্যয়ের ঘাটতি নেই। মুখে একটু পানির ঝাপটা দেয়। চোখ তুলে আয়নায় ভেজা মুখটি দেখে সে।

সব মলিনতা ধুয়ে যাচ্ছে। সব অসৎ কাজের ছায়া মুছে যাচ্ছে। নিজেকে স্বচ্ছ ভাবতে পারছে সে। পরিচ্ছন্ন ভাবতে পারছে।

মনের মধ্যে পরিচ্ছন্ন আনন্দ আবার জেগে ওঠে।

কারিনা কি পরিচ্ছন্ন আছে? ওকে নিয়ে খারাপ ফোন পেয়েছে। কেবলই কি উড়ো ফোন? নাকি সত্যতাও আছে ফোনের সংবাদে। ভাবতে চায়না বিষয়টি। তবুও ভাবনা চলে আসে। নিজেকে অসৎ ভাবলেও কারিনাকে অসৎ ভাবতে পারে না। খুব গোপন ঘরে জমে আছে মায়া। কারিনার জন্য মায়া বোধ জমাট বেঁধে আছে। ভালোবাসাও আছে। নিজের বউ কি তবে কোনো বিপদে পড়েছে? ওকে দুই নম্বর ভাবতে পারে না, নিজেকেও দুই নম্বর লোক ভাবে না সে। যদিও দুই নম্বর কাজ করতে হয়েছে প্রয়োজনে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বাসায় ফোন করে।

অনেকক্ষণ রিং টোন বাজার পর ফোন ধরে শেলী।

এতোক্ষণ কোথায় ছিলি?

বাথরুমে।

ফোন করলে বাথরুমে থাকিস। ব্যাপার কি?

বাথরুমের পাশে ছিলাম।

বাথরুমের পাশে তো বেলকনি। বেলকনিতে দাঁড়িয়ে থাকিস সুযোগ পেলে, বাসার কাজ করিস কখন?

কাজ করি। ফাঁকি দেই না। শেলীর সহজ উক্তি।

চাচাজান কোথায়?

খালাম্মা নানাজানকে নিয়ে হাসপাতালে গেছেন।

বাসায় আর কে আছে?

কেউ নেই।

ঠিক করে বল তুই কি করছিলি? ধমকে ওঠে মীরান।

জি সিনেমা দেখছিলাম। কাভি খুশি কাভি গাম। এজন্য টেলিফোনের শব্দ শুনিনি। ধমক শুনে সত্যি কথা বলে দেয় শেলী।

টেলিফোন রেখে দেয় মীরান। এই এক ঝামেলা। কাজের বুয়াদের এক স্বভাব। চান্স পেলে টিভির সামনে বসে যাবে। ঘরের কাজের প্রতি মনোযোগ নেই। টিভির প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশি। বাংলা কোনো ছবি চলবে তো কথা নেই। ছবি দেখার জন্য ছুটি দিতে হবে। দেখার সুযোগ না দিলে ক্ষুব্ধ থাকে। বাসা ছেড়ে চলে যায়। হুমকি মাথায় রেখে গৃহিণীদের চলতে হয়। ওদের প্রতি মেজাজ দেখানো যাবে না। মেজাজ দেখালে বিপদ। এটা ওটা ভাঙ্গার সম্ভাবনা আছে। বুঝে শুনে চলতে হয়।

মীরানও মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে। বাচ্চা দুটো প্রায় ওর কাছে থাকে। কারিনা বাহিরে গেলে সেই দেখভাল করে। তবুও বাসার প্রতি চিন্তা থাকে। অনেক পুরুষ উদাস থাকে, বাসার খোঁজখবর নেয় না। শত ঝামেলার মাঝেও মীরান ভুল করে না। বাসার খোঁজ নেয়। আজ ফোন করেছিল খবর জানার জন্য। এ সময় রূপক-বুনি স্কুলে। কারিনা থাকার কথা ছিল। নেই। চাচাজানকে নিয়ে যৌক্তিক কারণে বাইরে গেছে।

তবুও কারিনার জন্য ভয় হয়। মোবাইল সন্ত্রাসের ভয়ে ভীত হয় মীরান। আবার মাঝে মাঝে কারিনার মেজাজ দেখে মনে সন্দেহ উঁকি দেয়। অন্য কারুর প্রতি সে আকৃষ্ট নয় তো?

এমন মেজাজ দেখায় কেন?

স্বামীর প্রতি ভালোবাসা গাঢ় থাকলে এমন মেজাজ দেখাতে পারে?

মাথা থেকে চিন্তাটি উড়িয়ে দেয়। কাজে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে। মন বসছে না। এক ধরনের অস্থিরতায় ডুবে থাকে সে।

লাবণ্যের কথা মনে হয়। বারবার লাবণ্যের মিহি হাসি কানে ভাসে। তবে কি

মন তার দূষিত হয়ে গেল? নৈতিক উজ্জ্বল্য কি ম্লান হয়ে যাচ্ছে? নাকি এটাই স্বাভাবিক?

কেবল স্বার্থের জন্য কি মেয়েটি তাকে ফোন করে? স্বার্থের জন্য কি এমন আগ্রহ দেখায়? একটি কচি মেয়ের এমন ঘৃণিত কদর্য রহস্য কোথায়? জানে না মীরান।

মাথা থেকে লাবণ্যকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পারে না।

বারবার বিঘ্ন ঘটছে মনোযোগের। কই, কারিনার জন্য তো এমন মনোযোগ সার্বক্ষণিক থাকে না। এটাই বোধ হয় নিয়ম। বউ আপনজন। আপনজন আপন ঘরে থাকে। এতো কাছে যে থাকে তার জন্য আবার আলাদা মনোযোগ থাকার প্রয়োজন কি? যে আছে বুকের মাঝে, যখন তখন চোখ খুলে দেখা যায় না তারে। দেখার প্রয়োজন হয় না। কারিনাও তো তেমন একজন।

রুনিকে স্কুলে দিয়ে লেকের পাড়ে এসে বসেছে কারিনা।

সে একা নয়। এক দল মা এভাবে সময় কাটায়। লেকের পাড়ে ডিপ্ রেস্টুরেন্টের পাশে বসে আড্ডা দেয়। স্কুল ছুটি হলে বাচ্চা নিয়ে বাসায় ফেরে।

আড্ডায় মজার সব বিষয় আলাপ হয়। কারিনা কথা বলে কম, শোনে বেশি। সজ্জন কারিনার পোষাকেও রয়েছে শালিনতা। কথাবার্তাও নিয়ন্ত্রিত। তুমুল আড্ডার সময় সেই নিয়ন্ত্রণে ভাটা পড়ে। প্রাণখোলা আড্ডায় সেও জড়িয়ে যায়।

ডলি হচ্ছে আড্ডার প্রাণ। হাসাতে হাসাতে সবার পেটে খিল ধরিয়ে দেয়। ডলির একমাত্র মেয়ে নোশিন, রুনির সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

আজকের আড্ডার বিষয় হচ্ছে স্বামীর ভালোবাসা।

স্বামীরা কাকে কতোটুকু ভালোবাসে এক এক করে বলতে হবে।

প্রথমে বলবে জমিলা আপা। বয়সে সবার সিনিয়র তিনি। বয়সে বড় হলেও কথাবার্তায় রাখঢাক নেই। সব খুঁটিনাটি বিষয় বলে দেন, গোপন কথা প্রকাশ করে নির্মল আনন্দে ভাসিয়ে দেন সবাইকে। নিজের মনও হালকা থাকে। আড্ডায় জড়াতে পেরে সুখী তিনি। অনেক চাপ সহজে সইতে পারেন। কোনো কষ্ট আর কষ্ট মনে হয় না। উড়িয়ে দিতে পারেন কষ্টের গোপন আগুন। অনেক অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ জমিলা আপা। বলতে শুরু করেন বাসর রাতের ঘটনা। সবাই চুপ হয়ে যায়। যারা দূরে আছে, কাছে ঘেঁষে বসে। গোপন কথা বেশি জোরে বলা যায় না। আস্তে আস্তে বলতে হয় :

আমার স্বামীর নাম দয়াল মোর্শেদ। আমি ওকে দয়া বলে ডাকি। দয়া বাসর ঘরে ঢুকে ঘোমটা তোলে। বুক আমার কাঁপছে না। লজ্জায় লাল হই নি আমি। ঘোমটা তোলার সাথে সাথে ওর চোখের দিকে তাকাই। আমার তাকানো ভঙ্গি দেখে চমকে ওঠে ও। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি বলি, কী দেখো?

ও কথা বলে না। আমি ওর দেহ ঘেঁষে বসি। আবার বলি, কি দেখেন?

দয়াল পাথরের মতো তাকিয়ে থাকে। একবার বলি তুমি করে, একবার বলি

আপনি করে। দয়াল ঘাবড়ে যায়। ঘাবড়ে গিয়ে নির্দয় আক্রমণ করে। এক লাফে খাট থেকে উঠে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমিও খাট থেকে উঠি। ওর দিকে এগিয়ে যাই। ও সরে যায়। আমি আরো এগোই। ও আরো সরে। দরজায় হুক লাগানো। ছুট করে বেরুতে পারে না। নইলে ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছিল। খপ করে হাত ধরে ফেলি। তারপর জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখি। আমার স্বামী লম্বা। লম্বা মানুষের সবকিছু লম্বা। লম্বা মানুষ বিয়ে করবো এই আমার আজন্ম স্বাদ। ওই স্বাদ নিয়ে লম্বা স্বামীর চওড়া বুকে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে থাকি।

আমার দেহের উষ্ণতায় ও উষ্ণ হয়। নরম হয়। পাঁজা কোলে তুলে আনে আমাকে। খাটে শোয়ায়। আমি এবার চোখ বন্ধ করে থাকি।

আড্ডায় কারুর নিঃশ্বাস পড়ছে না। দম বন্ধ করে সবাই শুনছে। জমিলা আপা হঠাৎ চুপ হয়ে গেছেন। চোখ বুঁজে আছেন। কয়েকবার শ্বাস ছাড়েন তিনি। তারপর আবার বলতে থাকেন, দয়াল আমার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ায়। অনেকক্ষণ চেপে রাখে ঠোঁট। সাথে সাথে আমার মনে ভেসে ওঠে পুরনো একটি ঘটনা...

আপা, গোলাপ। গোলাপ লাগবো? একটি কিশোরী ফুল বিক্রেতা পাশে এসে দাঁড়ায়। সবাই চোখ ঘুরিয়ে কিশোরীটিকে দেখে।

ডলি রাগ করে। এই! ভাগ এখন!

আপা, নেন একটা ফুল মাত্র পাঁচ টেকা। নাছোড়বান্দা কিশোরীটি নড়ে না।

ডলি আবার খেঁকিয়ে ওঠে।

জমিলা আপা হাত ইশারায় ডলিকে থামায়।

নাও, আমার বাসর রাতের সৌজন্যে সবাই একটা করে ফুল কিনে নাও, আমাকে উপহার দাও।

এবার সবাই জমিলা আপার দিকে তাকায়। রোমান্টিক কথা বলছিলেন তিনি অথচ চোখের কোণায় অশ্রু কণা। ভয়াবহ সৌন্দর্য বর্ণনায় হঠাৎ কষ্ট! কেন অশ্রু কণা? কেন কষ্ট? সবার মনোযোগ ওই দিকে ছিল। আচমকা জমিলা আপার কথায় সবাই তাড়াহুড়ো করে ফুল কিনে নেয়।

সবার হাতে ফুল। কারিনার হাতে নেই। ফুল কম পড়েছে।

করিনার মন খারাপ হয়। প্রকাশ করে না। মুখে মৃদু হাসি দিয়ে মন খারাপের রেশ লুকিয়ে রাখে।

ডলি নাকের কাছে ফুল নিয়ে গন্ধ শোঁকে।

এই ফুলে তো গন্ধ নেই। বাসি ফুল!

হুঁ খালাম্মা। বাসি ফুলই তো। কাল রাতের ফুল আজ সকালে বাসি হইবো না? মেয়েটি জবাব দেয়।

এই বাসি ফুল কই পেলি?

বললাম, সবাই তো বাসি ফুল এখানে ফেরি করে বেচে।

বলিস কি? কোত্থেকে আসে এই ফুল?

লেকের ওপারে একটা কমিউনিটি সেন্টার। আঙুল দিয়ে দেখায় কিশোরীটি। ওইখান থিকা আনি। দারোয়ান ভাই জোগাড় কইরা দেয়। ওকে আমরা এক টেকা করে দিই।

ডলি ক্ষেপে ওঠে। না। বাসি ফুল নেবো না। ছুঁড়ে দেয় লেকের পানিতে।

মেয়েটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

জমিলা আপা বলে, ওর টাকা দিয়ে দাও। আর কেউ ফুল পানিতে ফেলবে না। সবাই আমাকে দাও। আমার জন্য কিনেছ।

না, আপা, বাসি ফুল আপনাকে কেন দেবো? ডলি প্রতিরোধ করে।

জমিলা আপা খপ করে ডলির হাত চেপে ধরে।

সবাই চুপ থাকো। মেয়েটির টাকা দিয়ে দাও। আর ফুলগুলো আমাকে দাও।

টাকা পেয়ে মেয়েটি ফিরে যায়।

জমিলা আপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আনন্দে বেদনার ছায়া এসে মলিন করে দেয় আপার মুখ।

তিনি আবার চোখ বোঁজেন। চোখ বুঁজে বলেন, কোনো ফুল বাসি না। ফুল ফুলই। অল্পদিনের জন্য ফুটে থাকে। মানুষকে আনন্দ দেয়। আনন্দ শেষ হলে কি বাসি হয়ে যায় সব?

ডলিকে বলে, তুমিও তো একটা ফুল। মেয়ে ফুল। তুমি কি বাসি হয়ে যাবে? তোমার প্রিয়জনরা কি তোমাকে বাসি ভাবতে পারবে? তোমার স্বামী কি তোমাকে বাসি ভাবে?

প্রশ্ন করে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেন না জমিলা আপা। ওনার কথা শুনে সবাই থমকে যায়।

বলতে থাকা বাসর ঘরের দৃশ্যপটে ফিরে যান তিনি। চুমু শেষ করে নয়ন আমাকে প্রথম প্রশ্ন করে...এটাই কি তোমার প্রথম চুমু?

চুমুর শিহরণ টের পাচ্ছিলাম। দেহে ছড়িয়ে যাচ্ছিল শিহরণ। মুগ্ধতায় অবশ হয়ে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ প্রশ্ন শুনে আর চোখ খুলতে পারি নি। নয়নের মুখের দিকে তাকাতে পারি নি। বুকে জড়িয়ে ধরা হাত দুটি ক্রমশ শীতল হয়ে যায়। মুখে মলিন ছায়া আতঙ্ক জেগে ওঠে।

নয়ন খুব কাছ থেকে আমাকে দেখছিল। আমার মুখের ভাষা পড়ছিল। আমার বন্ধ চোখের পর্দায় তখন ভেসে উঠেছিল অন্য একটি দৃশ্যপট:

বয়স তখন আমার ষোল। দুরন্ত টিনএজ, উচ্ছল কিশোরী আমি। ভালো ব্যাডমিন্টন খেলি। খেলা ছাড়া অন্য কিছুতে ঝোঁক নেই। খেলা শেষে বাসায় ফিরছি। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। বাসার গেটে দাঁড়িয়ে আছে পাশের বাসার জিমি ভাইয়া, কলেজে পড়েন তিনি।

আমাকে কাছে ডেকে বলেন, আমাদের বাসায় আসবে?

আমি বললাম কেন?

সে বললো, তোমাকে একটা মজার জিনিস উপহার দেবো।

উপহারের কথা শুনে আমি ওনার পিছে পিছে ওনাদের বাসায় ঢুকি। দেখি বাসায় কেউ নেই। আমার মনে ভয় নেই। জিমি ভাইয়াকে আমার ভালো লাগে। কখনও ভালো লাগার কথা বলি নি। আমিও বুঝি জিমি ভাইয়াও আমাকে পছন্দ করেন। নির্ভয়ে ওদের বাসায় ঢুকি।

আমি বললাম, দেন উপহার দেন।

জিমি ভাইয়া বলে চোখ বন্ধ করো।

আমি চোখ বন্ধ করলাম।

তিনি আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। জোরে করে ঠোঁটে চুমু দেন। এখন বুঝতে পারি ওটি ছিল আনাড়ি ঠোঁটের চুমু। ওইটাই আমার জীবনের প্রথম চুমু। প্রথম শিহরণ।

আমি জিমি ভাইয়াকে বাধা দেই নি। দিতে পারি নি।

চুমু দিয়ে ভাইয়া ছুটে পালিয়ে যায়। আমি ফিরে আসি বাসায়। ব্যস। ওইটুকুই। আর কোনো সম্পর্ক গড়ায় নি আমাদের। কারণ কয়েকদিন পরে রোড এ্যাক্সিডেন্টে মারা যান জিমি ভাই।

বলতে বলতে চোখের কোণে পানি জমে যায়।

আড্ডায় বসা সবার চোখে পানি টলমল করে ওঠে। সবাই চুপ। জমিলা আপা আবার বলতে থাকেন, নয়নের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি চোখ খুলি।

সত্য কথা বলি। বললাম। না প্রথম না। এখনকার চুমুটি আমার জীবনের দ্বিতীয় চুমু।

কারেন্টে শক খেলে যেমন হয় তেমনটি ঘটলো।

নয়ন তীব্রগতিতে উঠে দাঁড়ালো। এরপর জীবনে কখনো যে আর চুমু দেয় নি আমাকে।

একবার চেষ্টা করেছিল। পারে নি। তার মনে হয় ওই ঠোঁটে লেগে আছে অন্য পুরুষের ঠোঁট। চিন্তাটি মনে আসার সাথে সাথে জমে যায় সে। শীতল হয়ে যায়। আমার চৌদ্দ বছরের শীতল বিবাহিত জীবন চলছে এখন।

আড্ডার পরিবেশ বেদনার চাদরে ঢেকে গেছে। উজ্জ্বল সকাল। পাশে লেকের টলোমলো পানিতে কচিকচি ঢেউ। সকালের রোদ কচি ঢেউ-এ আছাড় খেয়ে পড়ছে, দুলছে।

কি কোনো প্রশ্ন আছে? সবাই চুপ কেন? জমিলা আপা হাসি মুখে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

জমিলা আপার হাসি দেখে অন্যদের মনও ভালো হতে থাকে।

কারিনা গম্ভীর। গম্ভীরতার খোলস থেকে বেরিয়ে প্রশ্ন করে এতো নিবিড় করে সব কথা আমাদের শোনালেন কেন?

কেউ দেখে শেখে। কেউ শুনে শেখে। কেউ ঠেকে শেখে। আমি চাইনা কেউ ঠেকে শিখুক। একেকজনের অভিজ্ঞতা একেকজনকে সমৃদ্ধ করে। আমার অভিজ্ঞতা তোমাদের কাজে লাগতে পারে।

আমরা তো বাসর রাত পেরিয়ে এসেছি। নতুন করে তো বাসর রাতে আর যাবো না। কানিজ আপা পাশ থেকে প্রশ্ন করে।

বাসর রাতে যাবে কেন? প্রতিদিনকে কেন বাসর রাত ভাববে না? প্রতিদিন আমরা ভুল করি। ভুল করে ভুলের মাশুল দেই। দেই না?

হ্যাঁ। দেই। তো করবোটা কি?

শোনো, বিয়ে টিকিয়ে রাখতে হলে কখনও মিথ্যা বলতে হয়। বিয়ে করতেও মিথ্যা বলা জায়েজ আছে। কেন জানো?

কারণ ধর্মটা আসলে বিজ্ঞান। ধর্মে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য লুকিয়ে আছে।

আমি যদি জিমি ভাইয়ার কথা বেমালুম লুকিয়ে রাখতাম কি ক্ষতি হতো?

সবাই সাপোর্ট করে। হ্যাঁ। অনেক গোপন সত্য গোপন রাখা শ্রেয়। সব ফাঁস করা ভালো না। সব জানতে চাওয়া ভালো না। প্রত্যেকের জীবনে গোপন খবর থাকে। গোপন বারান্দা থাকে। গোপন ঘরের গোপন কিছু একান্তই নিজস্ব। নিজস্ব সবকিছু স্বামী বা স্ত্রীর কাছে প্রকাশ না করাই উত্তম।

ডলি বলে, আপা আপনার সাহেবের ফোন নম্বর দেন।

কেন?

দেখি লোকটা কেমন? কীভাবে সময় কাটায়?

কীভাবে দেখবে?

ফোনে একটু নাচিয়ে দেখি। আপনি সব ফাঁস করে দেবেন না।

না। না। দেবো না। ইচ্ছে করলে তাকে...। আর বলে না জমিলা আপা, হাসিতে ফেটে পড়ে।

কারিনা ওদের কথা শোনে। নিজের স্বামীর কথা মনে হয়। মীরানও কি এমন কোনো টেলিফোন বান্ধবীর সাথে সময় কাটায়? প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসে। উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে না।

জমিলা'পা টেলিফোন নম্বরটি দেন। ডলি নম্বরটি টুকে ভ্যানিটি ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখে।

কারিনা প্রশ্ন করে, কী আলাপ করবি?

ডলি হো হো করে হেসে ওঠে। দেখবো দেমাকটা শীতল না গরম। গোপনে অন্য কারুর সাথে ইয়ে...টিয়ে করতে চায় কিনা বাজিয়ে দেখবো।

এতে লাভ কি হবে?

লাভ লোকসান বুঝি না। কথা বলতে দোষ কি? দেখি না কী বলে লোকটা।

তোকে যদি আহ্বান করে?

করে করবে। দেখতে চাই পুরুষ মানুষগুলো কী চায়?

একটা পুরুষ দিয়ে কি সব পুরুষকে বিচার করা ঠিক হবে।

না। তা হবে না। এক কাজ করা যাক। আরো কারুর স্বামীকেও পরীক্ষা করে দেখতে পারি। কে কে রাজি আছে?

কারিনা চুপসে যায়। ডলির প্রশ্নের আহ্বানে নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

দু'তিন জন পাশ থেকে উল্লাসের সাথে রাজি হয়।

ছন্দার স্বামীর টেলিফোন নম্বর নেওয়া হয়। ডলি দায়িত্ব দিচ্ছে একেকজনকে।

ছন্দা বলে, এই ডলি তোর বরকে বাদ দিবি কেন? তোর বরের টেলিফোন দে কারিনাকে।

ছন্দা হচ্ছে ডলি এবং কারিনার পূর্ব পরিচিত। ফ্রেন্ডের মতো। ওরা একই স্কুলের ছাত্রী ছিল। সবার সাথে তুই তুকাড়ি সম্পর্ক।

সবাই তালি দেয়। কারিনা হচ্ছে দলের সবচেয়ে সুন্দরী রমণী। আর ডলির স্বামী হচ্ছে নামকরা স্থপতি। স্থপতির কঠিন মনে টেলিফোনে টোকা দেবে কারিনা। ফলাফল প্রতি আসরে আলোচিত হবে। ডলি বরের নাম্বারটি কারিনাকে লিখে দেয়।

কারুর গোপন কথা ফাঁস করা কি ঠিক হবে? একজন বললো।

কতোটুকু গোপন হতে পারে? সর্বোচ্চ গোপনীয় জায়গা হচ্ছে বিছানা। দেখা যাক স্বামীরা অন্য নারীকে বিছানায় ডাকে কিনা? ডলি বললো।

তোর স্বামী যদি কারিনাকে বিছানায় ডাকে, সম্মতি দিবি?

ডাকলেই কি কারিনা ছুটে যাবে নাকি? ডাকে কিনা সেটাই দেখবো আমরা। এক কাজ কর ডলি। তুই ওরটাকেও বাজিয়ে দেখ। ছন্দা বললো।

কারিনা আঁতকে ওঠে। নিজের স্বামীর প্রতি নানান কারণে আত্মবিশ্বাসের ভিত দুর্বল হয়ে গেছে। ডলির মতো উদ্ধত এবং প্রাণবন্ত নারীর পাল্লায় পড়লে নিজেকে সে ঠিক রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। এ অবস্থায় সবাই তার বরের দুর্বলতা জেনে যাবে। ভাবতে গিয়ে ভয় পেয়ে যায়। কুঁকড়ে যায়।

দে কারিনা। তোর বরের টেলিফোন নম্বর দে। ছন্দা চাপ দেয়।

আসরের তুমুল আড্ডার সিদ্ধান্তটি ফেলতে পারে না কারিনা। একটা কাগজে টেলিফোন নম্বরটি লিখে কাগজটি ডলির হাতে তুলে দিতে গিয়ে নিজের পুরো ভিত নড়ে ওঠে। মুখে হাসি ফুটে আছে। হাসির আড়ালে লুকিয়ে গেছে কঠিন চিন্তা। অর্থাৎ প্রকাশে আছে উল্লাস। উল্লাসে মেখে আছে মলিনতা। আর অপ্রকাশে নিজের শেকড়ে আসন গেড়ে বসেছে অনিশ্চিত শংকা। চাপা স্বভাবের কারিনাকে দেখে এই মুহূর্তে নিজের সাথে নিজের যুদ্ধটি কেউ ধরতে পারে না।

আসর ভেঙে যায়। সবাই উঠে দাঁড়ায়। স্কুলের দিকে হেঁটে যায়। কিছুক্ষণ পর স্কুল ছুটি হবে। যে যার বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাবে। পেছনে থেকে যাবে আনন্দময় মুহূর্তটি।

কারিনার মুহূর্তটি কেবল আনন্দময় নয়। ভয় মিশে থাকার কারণে মিশ্র অনুভূতি ফেলে আসতে পারে নি পেছনে। ওর সাথে সাথে শংকা মিশ্রিত মুহূর্তটি এগিয়ে আসছে। আনন্দের ঢেউ ছোট। বেশিক্ষণ টিকে না। চিন্তার ঢেউ লম্বা, সহজে ফুরায় না।

স্কুলের পাশে ফুটপাথের ওপর যেন বাজার বসে গেছে। মহিলারা সুন্দর ডিজাইনের ফ্রেম বিক্রি করছে। শাড়ি বিক্রি করছে। পাশে আছে রিকশা ভ্যানে শবজির সমারোহ। সব ধরনের শবজি পাওয়া যায় এখানে। বাজার থেকে দাম বেশি হলেও শবজি ফ্রেশ পাওয়া যায়। মহিলারাই ঝাঁঝা বাজার এখান থেকে সেরে নেয়।

আজ মাছও দেখা যাচ্ছে।

বড় ইটিটে জ্যান্ত কই মাছ বিক্রি হচ্ছে। বড় বড় কই। এতো বড় কই আর

কখনো দেখে নি কারিনা। কই মাছ লাফাচ্ছে। দামও চড়া। অন্যপাশে আছে শোল মাছ।

শোলের ল্যাফালাফির দৃশ্যটি মজাদার। কনি খুব মজা পায়। খাওয়ার জন্য না হোক, কনিকে মজা দেওয়ার জন্য শোল মাছ নিতে ইচ্ছে করে।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দেখে কারিনা। না। শোল মাছ দেওয়ার মতো টাকা ব্যাগে নেই।

মীরান যতো আয় করুক না কেন, পর্যাপ্ত টাকা তার হাতে দেয় না। কাছে কাছে টাকা দেয়। ইচ্ছে করলে মন মতো বাজার করতে পারে না কারিনা।

এই মুহূর্তে মন বেদনায় ভরে ওঠে। নিজেকে অসুখী মনে হতে থাকে।

সবার কেনাকাটা দেখছে সে। একটা শোল মাছ দ্রিম করে লাফিয়ে উঠে রাস্তায় আছড়ে পড়েছে। বিক্রেতা মাছটিকে ভাগে আনতে পারছে না। কনি মাছটি কাছে পেলে খুশি হতো। কনিকে খুশি দেওয়ার সামর্থ্য তার নেই।

কারিনার মতো আর দুখী আছে ক'জনা।

এ সময় স্কুল ছুটির ঘন্টা বাজে।

শোরগোল শুরু হয়ে যায়। বাচ্চারা হৈ চৈ করে ছুটে আসছে।

দোতলা, তিনতলা বিল্ডিং থেকে ব্যাগ নিচে ফেলে দিচ্ছে ওরা। ঝপাঝপ ব্যাগ পড়ছে। সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে ওরা। উল্লাস সবার চোখে মুখে।

ওই যে আম্মু! ওই যে আম্মু! এদিকে এসো। চিৎকার চেঁচামেচি কলকাকলিতে ভরে গেছে স্কুল প্রাঙ্গণ।

চারিদিকে স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। এখনকার স্কুলে মাঠ নেই। খোলা প্রাঙ্গণ নেই। কঠিন দেয়াল উপরের দিকে উঠে যায়। ছোট্ট পরিসরে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। একের ভেতর সব। তাই ছোট্ট পরিসরে ব্যাপক শোরগোল। আনন্দ যজ্ঞেও কারিনার মনটা কী এক বিষাদে যেন চেপে থাকে। টের পায়। কনিকে বুকে জড়িয়ে ধরার পরও মন ভালো হয় না। গহীন কোণ থেকে নিজের ভেতর বিষাদ ধেয়ে আসছে।

আজ গাড়ি পাওয়া যায় নি। রিকশায় যেতে হবে বাসায়। কাছে বাসা। সমস্যা নেই। তবুও রিকশায় যেতে ভয় লাগে। আজকাল গাড়ি ছাড়া রিকশায় চড়তে অস্বস্তিও লাগে।

রিকশা হোক গাড়ি হোক রাস্তায় জ্যাম। এ সময় ফুটপাথ দিয়ে কিছু পথ হেঁটে এসে খোলা রাস্তা থেকে রিকশায় ওঠা ভালো।

অভ্যস্ত হয়ে গেছে। স্কুল ছুটির সময় কিংবা অফিস পূর্বে ধানমন্ডির আবাসিক

এলাকাটি জ্যামের শহরে পরিণত হয়। চারদিকে জুল। চারদিকে জ্যাম। ছুটির পর জ্যামে বসে থাকতে ভালো লাগে না। অপরিকল্পিত ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা জুল ও হাসপাতালের ছড়াছড়িতে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার নাম পাল্টে রাখা উচিত। জুলপুর বলা যেতে পারে। ক্লিনিকপুরও বলা যেতে পারে। এই এলাকায় বসবাসের মজা কমে এসেছে। তবুও এলাকার জমির দাম অকল্পনীয় হারে বাড়ছে। এপার্টমেন্ট ব্যবসায় রমরমা অবস্থা। ফ্ল্যাটের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে।

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে আসে কারিনা। বাম হাতে রুনির ডান হাত ধরা। ডান হাতে রুনির জুল ব্যাগ। বেশ অনেক দূর হেঁটে এসেছে তারা। খালি রিকশা পাওয়া যাচ্ছে না। ভালো লাগছে হাঁটতে। আট নম্বর ব্রিজের বাম পাশ থেকে হঠাৎ একটা কালো প্রিমিও টয়োটা ব্রেক কষে দাঁড়ায়।

ফিরে হেঁটে কেন? গাড়ির উইন্ডশীল নামিয়ে মুখে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় ডলি।

হাঁটতে ভালো লাগছিল। রুনি এদিক ওদিক লাফালাফি করছিল। ডলির প্রশ্ন শুনে ভালো লাগা থমকে যায়।

গাড়ি গ্যারেজে গেছে। তাই হেঁটে যাচ্ছি। মিথ্যা করে বললো কারিনা।

ওই। তোকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাই। তোর বাসা তো কাছে, আমার যাওয়ার পথে।

গাড়িতে উঠতে ইচ্ছে করছে না। রুনি কিছু বলার সময় না দিয়ে গাড়ির কাছে পা বাড়ায়। ফলে না উঠে পারলো না সে।

গাড়িতে উঠে দেখে ড্রাইভিং সিটে এক হ্যান্ডসাম লোক বসা। একি ড্রাইভার? না। অসম্ভব। মনে মনে ভাবে কারিনা। জমে যায় লোকটিকে দেখে।

শোনো। উনি কারিনা। আমার ক্লাসমেট। ভিন্ন সেকশনে ছিল। ডলি সামনের লোকটিকে বললো।

লোকটি ভদ্রভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানায়।

কারিনা চুপ হয়ে আছে। ডলি ওকে চিমটি দেয়। চোখ টিপে ফিসফিস করে বলে, লোকটা আমার বর।

কারিনা ফিসফিস করে বলে, বুঝেছি।

কীভাবে বুঝলি? দেখেই সব বোঝা শেষ?

'শোনো' সম্বোধন করিছিলি ওনাকে।

ওহ। তুই তো দারুন বুদ্ধিমতী। আমার একটু বুদ্ধি শুদ্ধি কম। তোর বুদ্ধি ধার নিতে হবে আমাকে। ফিসফিস করে কথা বললো ডলি।

এতো ফিসফিস করে কথা বলছো কেন? আমাকে ড্রাইভার হিসেবে পরিচয় দিচ্ছো নাকি?

হো হো করে হেসে ওঠে ডলি। কারিনাও হাসে।

ড্রাইভার ছুটিতে। নতুন বিয়ে করেছে। তাই ছুটির ব্যাপারে ছাড় দিতে হলো। নিজেই ড্রাইভ করছি আজ। নিজ থেকেই বললো ডলির স্বামী, নাঈম আহমেদ।

নোশিন ও রুনি পাশাপাশি বসেছে। তারা তাদের জগতে ডুবে গেছে। ডলি ও কারিনা ফিসফিস করছে। কথা বলছে লুকিয়ে।

নাঈম আহমেদ ড্রাইভ করছেন। মাথা সামনে রেখে বললো, ব্যাপার কি ফিসফিস চলছে কেন?

ফিসফিস কথার মজা একান্তই আমাদের। তুমি এদিকে কান দিচ্ছো কেন? সামনে তাকাও। ড্রাইভিং-এ মন দাও। ধমক দিলো ডলি।

গাড়িতে উঠিয়েছ এক সুন্দরীকে। ওই দিকে কান না দিয়ে কি পারা যায়? চোখ দেওয়া যাচ্ছে না। পারলে চোখও দিতাম। লুকিং গ্লাসে মুখটা অল্প দেখা যাচ্ছে। নইলে তো পিছন ফিরে তাকানো লাগতো।

আরে! বলো কি? এ্যাগ্রিভেন্ট করবে তো। লুকিং গ্লাসে নিজের সুন্দরী বউটাকে দেখো। অন্যের বউ দেখার দরকার কি?

নিজেরটা তো সবসময় দেখি। অন্যেরটাই তো দেখতে আনন্দ।

সবাই একসাথে হেসে উঠে। কারিনার হাসি হঠাৎ থেমে যায়। মীরানও কি তবে অন্যের বউ দেখে বেড়ায়? ওদের স্বামী স্ত্রীর নির্মল বিনোদন দেখে ঈর্ষা জাগে। মীরান কখনো ওর সাথে হাসি তামাশা করে না। রোবোটের মতো কেবল বাস্তব প্রেক্ষাপট নিয়ে মাঝে মাঝে কথা বলে। অযথা কগড়া করে, মেজাজ দেখায়।

চট করে তুলনা চলে আসে। নিজের স্বামীর সাথে অন্যের স্বামীর তুলনা করা ভালো না। তবুও মনে তুলনামূলক চিন্তা উঁকি দিতে থাকে। ডলির স্বামী প্রাণবন্ত। সুপুরুষ। ওরটা ঠিক উল্টো। ভাবনায় ছেদ পড়ে।

রুনি হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে।

আছেলে এসে গেছি আমরা।

গাড়ি থামালেন নাঈম আহমেদ।

কারিনা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। বাসা ক্রস করে যাচ্ছিল গাড়ি। রুনি চিৎকার না দিলে টের পেতো না সে।

হাসিমুখে গাড়ি থেকে নেমে আসে কারিনা। রুনিও নামে।

ভাই, ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না। একদিন ডলিকে নিয়ে বাসায় আসবেন।

ঘাড় ঘোরায় নাঈম আহমেদ। হাসিমুখে বলে, কেন ডলিকে না আনলে বাসায় ঢুকতে দেবেন না?

প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারে না কারিনা। ভ্যাবাচ্যাকা খায় সে। বোকার মতো হেসে ওঠে। ডলিও হাসিতে ফেটে পড়ে। ফাটা হাসিতে চিৎকার দিয়ে বলে, খবরদার। আমার অবর্তমানে ঢুকতে দিবি না কিন্তু।

মজার একটি প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়ে যায়। আনন্দের একটি ফোয়ারা বয়ে যায় ডলির মনে, নাঈমের মনে। মজাদার কথোপকথন কারিনাকে আলোড়িত করে।

খুশি মনে রুনিকে নিয়ে বাসার দিকে হেঁটে আসতে থাকে।

আপা, কুরিয়ার সার্ভিসে স্যারের একটা চিঠি এসেছে।

কারিনা থমকে দাঁড়ায়। মীরানের চিঠিটি নেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারে না। যেহেতু গার্ড বলেছে, না নিলে ওদের মনে প্রশ্ন তৈরি হতে পারে। গার্ড শ্রেণীর কারুর কাছে নিজেদের দ্বন্দ্বের কথা জানানো ঠিক হবে না। বোঝে কারিনা।

চিঠিটি হাতে নিয়ে উপরে উঠে আসে। রুনি খামছে ধরে খামটি। উল্টেপাল্টে দেখে। তারপর খামটি নিজের ব্যাগে চালান করে দেয়।

কারিনা খেয়াল করেছে। কিন্তু খামটি নিজের হাতে নেয় না।

বাসায় ঢুকে রুনি সহজাত ভঙ্গিতে ব্যাগটি ছুঁড়ে দেয় সোফার উপর। হৈ চৈ করে ঘরে ঢুকে। টিভির সামনে বসে কার্টুন চ্যানেলটি অন করে সে। তারপর সোফার ওপর বসে দেখতে শুরু করে কার্টুন ছবি।

কারিনার মন ভালো এখন।

মন ভালো থাকলে ঘর গোছানোর দিকে মন বসাতে পারে। মাঝে মাঝে নিজের বাসায় ফোন করে। বাবার সাথে কথা বলে। মা'র খোঁজ খবর নেয়। বোনদের খোঁজ নেয়। ভাই এর সাথে কথা বলে।

আজও ফোন করার জন্য টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়।

এ সময় চাচাজান সামনে এসে দাঁড়ায়।

মা-মণি।

জ্বি চাচাজান। বাসায় ফোন করতে যাচ্ছিলাম।

আচ্ছা। বলো। তোমার কথার পর আমাকেও দিও। আমিও একটু কথা বলবো।

আমার তেমন জরুরি কথা নেই। আপনি বলুন। আমি লাইন ধরিয়ে দেই।

টেলিফোনের ডায়াল টোন নেই। রিসিভার হাতে নিয়ে থেমে যায় কারিনা।

চাচাজানও ফোন করতে এগিয়ে এসে থেমে যায়।

এ সময় কারিনার মোবাইল ফোনটি বেজে ওঠে।

মীরানের নাম্বার ভেসে ওঠে মনিটরে। তাহলে নতুন সেট কিনেছে মীরান। নিশ্চয় টিএন্ডটিতে চেষ্টা করেছিল। না পেয়ে মোবাইলে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

নতুন সেট কিনেছ নাকি? কারিনার গলায় উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

হ্যাঁ। কিনেছি। টিএন্ডটি লাইন এনগেজ কেন?

ফোন এনগেজ নয়। নষ্ট হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

কখন থেকে? মীরানের গলাও ভারি।

জানি না। একটু আগে ফোন করার চেষ্টা করে ডায়ালটোন পাচ্ছিলাম না।

রুনি কি করছে?

স্কুল থেকে এসে কার্টুন ছবি দেখতে বসেছে।

দাও। ওকে মোবাইলটা দাও।

কারিনা রুনির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, নাও কথা বলো। তোমার আব্বু কথা বলবে।

আব্বু আজ ক্লাস টেস্টে ত্রিশে ত্রিশ পেয়েছি আমি। রুনির মুখে উল্লাস।

বাহ্! কনগ্রেচুলেশন মাই ডটার! মীরান ফোনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

কী দেবে আমাকে?

কী চাও তুমি?

ওয়ান্ডারল্যান্ডে ঘুরতে যাবো। তুমিও যাবে সাথে।

অবশ্যই যাবো।

তুমিতো যাও না কোথাও। রুনির কণ্ঠে অভিমান।

এবার যাবো। কথা দিলাম।

কথা দিয়ে তো কথা রাখো না। কেবল অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো।

কথা রাখবো। তোমাকে নিয়ে ওয়ান্ডারল্যান্ডে বেড়াতে যাবো।

আম্মু এবং ভাইয়াও যাবে সাথে।

অবশ্যই যাবে।

তুমি মিথ্যা বলো। কথা দিয়ে কথা রাখো না। রুনির কণ্ঠে আবারো অভিযোগ।

মিথ্যা বলবো না। সত্যি বলছি। যাবো।

কখন যাবে?

আগামী শুক্রবার।

ঠিক আছে আব্বু। ক্যালেন্ডারে আমি লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে দিলাম। শুক্রবার তুমি আমাদেরকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।

আচ্ছা।

তাহলে রাখি। কার্টুন ছবি দেখছি।

রাখো। তবে স্কুল থেকে এসে কার্টুন ছবি নিয়ে বসে যাওয়া কি ঠিক হলো?

এই যে আব্বু, তুমি আমার সব কিছুতে বাধা দাও। টিভিতে দেখো না, শিশুকে 'না' বলবেন না। হ্যাঁ বলুন।'

দেখি আব্বু!

দেখও আমাকে 'না' বলো কেন?

না বলছি, কারণ তোমার ভালো চাই আমি। পড়ালেখা করে এসেছ, স্কুল থেকে এসে ব্রেইনকে বিশ্রাম দিতে হয়। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে রেস্ট নিতে হয়। রেস্ট না নিলে তোমার ক্ষতি। কোনো বাবা কি সন্তানের ক্ষতি চায়?

আমার রেস্টের দরকার নেই। রুনির স্বর ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। আমি এখন কার্টুন ছবি দেখবো। তুমি না বলতে পারবে না।

এতোটুকু মেয়ের যুক্তির কাছে হার মানে মীরান। হার মেনেও মন খুশি হয়। ভালো লাগে। মেয়েকে আশ্বাস দিয়ে বলে ত্রিশে ত্রিশ পেলে কি কোনো বাবা সন্তানকে 'না' বলতে পারে? পারে না। তুমি যা ইচ্ছে তাই করো। আমার কোনো 'না' নেই।

মনে থাকে যেন তোমার। রুনি মনে করিয়ে দেয়।

আচ্ছা মনে থাকবে।

আম্মুকেও বলে দাও। আম্মু যেন আমাকে 'হ্যাঁ' বলে। যেন 'না' না বলে।

তোমার আম্মুকে তুমি বলো। মীরান বললো।

রুনি বলে, তুমি বলে দাও।

মীরান বলে, তোমার আম্মু আমার কথা শোনে না। তুমি বলো।

এই যে দেখো আব্বু, এখনই কথা দিয়ে কথা রাখছ না। এখনই তুমি আমার কথা রাখছ না। এখনই আমাকে 'না' করে দিচ্ছো। আমি রেগে যাবো বলে দিলাম। রুনি ক্ষেপে উঠছে।

মীরান আবারও মেয়ের কাছে হার মানে। দাও মোবাইল তোমার মার কাছে দাও।

কারিনা পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল সব। মেয়ের জোরালো কথাবার্তা উপভোগ করছিল। মোবাইল হাতে আসার সাথে সাথে মনের উপভোগ বিরক্তি বোধে বদলে যায়।

বলো। গম্ভীরা গলায় বলে কারিনা।

রুনি ক্লাস টেস্টে ত্রিশে ত্রিশ পেয়েছে। আমার পক্ষ থেকে ওর ইচ্ছে পূরণ করে দাও।

তোমার ইচ্ছে তুমি পূরণ করো।

আমি তো এখন কাছে নেই। তুমি পূরণ করে দাও।

আমি চাই না ও স্কুল থেকে এসে কার্টুন ছবি দেখুক। আমি ওর ইচ্ছে এখন পূরণ করতে পারবো না। কারিনা বললো।

রুনি ক্ষেপে ওঠে। আম্মু তুমি ঝগড়া করছো আব্বুর সাথে। আব্বুকে আমার বিরুদ্ধে বলছো। আমি তোমার সাথে কথা বলবো না।

তোমার বিরুদ্ধে বলি নি। মোবাইল লাইন কেটে দিয়ে বলে, যা বলছি তোমার ভালোর জন্য বলছি।

বিরুদ্ধে বলেছ। আমাকে কার্টুন ছবি দেখতে দিতে চাচ্ছো না তুমি।

এটাকে বিরুদ্ধে বলা বলে না। এটা তোমার পক্ষের কথা। তোমার ভালো চাওয়া তোমার পক্ষে গেছে। তুমি ছোট। তাই বোঝ না।

আমার বোঝার দরকার নেই। আমি কার্টুন ছবি দেখবো। রেগে ওঠে রুনি।

দেখো। তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। বলেই কারিনা বেড রুমের দিকে হাঁটা দেয়।

দেখো আম্মু, তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছো। আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছ। আব্বুর সাথে রাগ করেছ। তোমার সাথে শোবো না আমি। খাবো না। সোফা সেটে এখানে ঘুমাবো। আচমকা লাফিয়ে ওঠে সে। রিমোট হাতে নেয়। টিভি বন্ধ করে। তারপর সোফার মধ্যে ঝপ করে লাফিয়ে পড়ে। বলার কুশনটি মাথার তলে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে।

কারিনা আর খেয়াল করে না কিছু। বেডরুমের এসে দরজা বন্ধ করে দেয়।

নানাজান পাশে এসে বসে। রুনির মাথায় হাত রাখে।

রুনি বাম হাত দিয়ে ঝটকা দিয়ে নানাজানের হাত সরিয়ে দেয়।

নানাজান তবুও বসে আছেন। রুনি উঠছে না।

রুনির রাগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। একটুপর সে শীতল হয়। মাথা তুলে দেখে নানাজান দূরে মন খারাপ করে বসে আছে। মায়ের রুমের দরজা বন্ধ।

মাথা তুলে নানাজানকে বলে, আম্মুকে বকে দাও নানাজান।

আচ্ছা বকে দিবো।

বকোনি তো। আম্মু আমাকে বকেছে। তুমি তো কিছু বললে না।

এবার বলবো। তোমাকে আদর করতে বলবো। বকতে দিবো না আর।

আচ্ছা। বলেই রিমোট নেয় হাতে। আবার টিভি অন করে। টম এন্ড জেরি চলছে এখন। এই মুহূর্তে আর কেউ ওকে টিভির সামনের থেকে তুলতে পারবে না। খলখল করে হাসে। কার্টুনটি দেখতে থাকে। নানাজানও টিভি দেখায় মগ্ন হয়।

বেশ চাপে আছে মীরান। টেবিলে অনেক ফাইল জমে আছে। অনেক কাজ। নতুন প্রজেক্ট, লোক নিয়োগ, ইত্যাদি বিষয়েও চাপ রয়েছে।

মোবাইল বন্ধ রেখেছে। টিএন্ডটিতে জরুরী কল ছাড়া রিসিভ করছে না সে।

এ সময় ফাইন্যান্স অফিসার ইব্রাহিম সাহেব রুমে এসেছেন। জরুরী একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত দরকার।

বসের অনুমোদন ছাড়া অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন ইব্রাহিম সাহেব।

বলুন কি জরুরী কাজ?

নতুন প্রজেক্টের ফাইন্যান্সিয়াল রিলিজের খসড়াটি একবার দেখে দিতে হবে স্যার।

আপনি কো দেখেছেন?

জ্বি। দেখেছি।

আর ইউ কনফিডেন্ট ইনাফ ফর অল পয়েন্টস?

জ্বি স্যার। কনফিডেন্ট। তবুও আপনি একবার চোখ বুলিয়ে দেখেন স্যার।

ফাইলটি এগিয়ে ধরেন ইব্রাহিম সাহেব।

মীরান সাধারণত একসাথে দু'কাজ করে না। ক্ষেপে যায়। আজ মাথা ঠাণ্ডা আছে। বেশি চাপের সময় ক্ষেপে গেলে বিভ্রাট আরো বাড়ে, জটিলতা আরো বাড়ে। বোঝে সে। ভেতরের চাপ সামাল দিয়ে ফাইলটির প্রতি মনোযোগ দেয়।

না। সন্তুষ্ট হতে পারছে না।

একবার চোখ তুলে ইব্রাহিম সাহেবকে দেখে। আবার ফাইলে চোখ নামিয়ে নেয়। কিছুদূর এগিয়ে থেমে যায়।

এই পয়েন্টটির ব্যাখ্যা কি? আঙুল দিয়ে পয়েন্টটিতে ইব্রাহিম সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মীরান।

ইব্রাহিম সাহেব কিছু বলার জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে সামনে আসেন।

এমন সময় জরুরী টেলিফোনটি বেজে ওঠে।

অপারেটর বললো, বাসা থেকে কল এসেছে, দেরা স্যার?

হ্যাঁ দাও।

ইব্রাহিম সাহেবকে চোখের ইশারায় বাইরে যেতে বলে মীরান। বাসার কল কারুর সামনে এ্যাটেন্ড করে না সে। টেলিফোনে মিঠি কণ্ঠ ভেসে আসে। আমি বাসার কেউ না। বাসার বাইরের একজন। আপনি আমার নাম জিজ্ঞেস করবেন লাবণ্য।

ওঃ। কী খবর লাবণ্য? অপারেটর বললো বাসার কল।

আমিও তাই বলে আপনাকে পেলাম। নতুবা কানেক্ট করতে পারতাম না। আপনাকে ধরার জন্য একটু মিথ্যা বলেছি। মিথ্যা বলার জন্য দুঃখিত।

ইটস ওকে ফর ইউ বেবী।

থ্যাংকস।

তোমার গলাটি অপরিচিত লাগছে। কী ব্যাপার লাবণ্য?

মন বদলে গেলে গলাও বদলে যেতে পারে, জানেন?

জানবো না কেন? আমি কি তোমার মতো কচি বয়সের কেউ নাকি? অন্য সময় হলে লাবণ্য এ অনভ্যস্থায় হেসে উঠতো। আজ হাসি আসছে না। অরিজিনাল মিহি সুর আসছে না। গম্ভীর টোনে কথা বলছে সে।

না। আপনি কচি হবেন কেন? একজন স্নানু কর্মকর্তা কি কচি হতে পারে?

স্নানু কর্মকর্তারও বস থাকে। বসের কাছে সেও গাধা। কারু কাছে স্নানু হলেও কারুর কাছে গাধা।

আপনাকে গাধা বলা যাবে না। গাধা নিজের স্বার্থ বোঝে না। আপনি বোঝেন নিজেরটা। আপনি চালাক। ধূর্ত চালাক।

চট করে মন খারাপ হয়ে যায় মীরানের। এমন কঠিন শব্দ ব্যবহার করতে পারলো লাবণ্য! মুখে কিছুই প্রকাশ করলো না সে। স্বাভাবিক কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে।

ওঃ। এমন মনে হয় আমাকে?

না, মনে হয় না। মনে করতে কষ্ট হয়। তবুও মনে করতে হয়। বাস্তবতা অনেক কিছু ভাবতে আমাদের বাধ্য করে। করে না?

হ্যাঁ। বাস্তবতা মেনে চলতে হবে। চলতে পারলে কষ্ট কম হবে। কষ্ট কম হলে জীবন সুন্দর হবে। এটাই স্বাভাবিক।

না। স্বাভাবিক বলে কিছু নেই। সব কিছু অস্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক।

কি হয়েছে লাবণ্য? কষ্ট পেয়েছ?

জি পেয়েছি।

খুলে বলো বিষয়টা কি?

খুলে বলে আর কি লাভ হবে?

সবকিছুতে এতো লাভের কথা ভাবো কেন? লাভের পাশে তো লোকসানও ওঁৎ পেতে থাকে। লোকসানও হতে পারে। তবে লাভের ব্যাপারে আশাবাদী হতে দোষ কি?

আশাবাদী ছিলাম। আশার স্তম্ভে ধাক্কা লেগেছে। আশায় ধস নেমেছে।

বলো তো কী হয়েছে? নরম সুরে বললো মীরান।

আমার বন্ধুর জন্য খারাপ লাগছে। একলাখ টাকা জোগার করার সামর্থ্য ওর নেই। কোত্থেকে এক লাখ টাকা দেবে?

কেন? এক লাখ টাকার প্রয়োজন এলো কেন?

ওর চাকরির এক লাখ টাকা চেয়েছেন আপনি। একলাখ দিতে পারবে না। চাকরিটাও হবে না। অথচ চাকরিটা ওর খুব দরকার।

আমি চেয়েছি টাকা?

হ্যাঁ। আপনিই তো ওই অফিসের প্রধান। টাকা তো আপনার জন্য চাওয়া হয়েছে?

সাঁই করে একটা বুলেট এসে যেন মাথায় আঘাত হেনেছে। পুরো দেহে একটা কুনি লাগলো। কানে ঝিঁ ঝিঁ আওয়াজ ভেসে আসলো। কাজের চাপে ছিল মীরান। এই চাপ শতগুণে বেড়ে গেল। আর কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। লাবণ্যের সাথে কোনো তর্কে যাবার ইচ্ছে নেই। লাবণ্যের বন্ধুর দরখাস্তটি আলাদা মার্ক করে রেখেছিল সে। বায়োডাটা পড়ে যোগ্যতাসম্পন্ন মনে হয়েছে ছেলেটিকে। ওর চাকরি হবে, এই আশাবাদ মনে মনে ধারণ করেছিল। লাবণ্যের টেলিফোনের সংবাদে মাথাটি কেমন চক্কর খাওয়া শুরু করলো।

কী যেন বলতে যাচ্ছিল লাবণ্য। ওর কথা থামিয়ে দেয় মীরান। শান্ত স্বরে বলে, তোমার বন্ধুকে বলো আমার সাথে দেখা করতে। আমার নামে কাউকে টাকা দিতে নিষেধ করবে। কেমন? কথা শেষ করে রিসিভার রেখে দেয় মীরান। লাইন খুলে সেটটি আলাদা করে রাখে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বড় করে একটা শ্বাস নেয়।

কিছু সময় নিঃশ্বাস আটকে রাখে। মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাসটি ছেড়ে সামনে ঝুঁকে বসে। একশো থেকে উল্টো দিকে গুণতে থাকে। গোনা শেষে মনে মনে ভাবতে থাকে রিলাক্স! রিলাক্স!

মীরান নিজেকে সৎ ভাবে না। অসৎ না হলে ফ্ল্যাট বাড়ি চাকরি করে কেনা

যায় না। সে অসৎ। তবে সৎভাবে অসৎ। উপরি অর্জন করে সে, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিকিয়ে নয়। অটোমেটিক একটা ইনকাম হয়। সেই স্বার্থে প্রতিষ্ঠান বিকিয়ে যায় না। এই বিষয়ে সে সৎ। তার বস কখনো তাকে অসৎ ভাবতে পারেন না। সেও তার অধস্তনদের অসৎ ভাবতে চায় না। অসৎ ভাবলে বিশ্বাসের ঘাটতি থাকবে। বিশ্বাসের ঘাটতি মানে মনের ওপর চাপ তৈরি হওয়া। নিজের বউকে সে অসৎ ভাবে না। বউ এর মেজাজের কারণে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি আছে। বউকে কম সময় দিতে পারে। রাগে কখন বউ তাকে ছেড়ে চলে যায়, এই ভয়ে ভীত থাকে। এ কারণে এপার্টমেন্টটি নিজের নামে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে। গোপনে এই উপলব্ধি কাজ করেছে।

'এক্সপ্রেশন লুকিয়ে রাখুন' যায়যায়দিনের শ্রেষ্ঠ উপদেশ সংখ্যায় একটি লেখা পড়েছিল। কঠিন এক্সপ্রেশন লুকিয়ে রেখে ঠাণ্ডা মাথায় অগ্রসর হতে হয়। মীরানও মাথা ঠাণ্ডা করে কলিং বেলে চাপ দেয়।

পিয়ন এসে সামনে দাঁড়ায়।

যাও। ইব্রাহিম সাহেবকে সালাম দাও।

জ্বি স্যার। পিয়ন বেরিয়ে যায়।

দরজার দিকে তাকিয়ে আছে মীরান। দরজা দিয়ে এখন রুমে তিনি ঢুকবেন। তিনি তার অতি বিশ্বস্ত সহকর্মী। তাকে অবিশ্বাস করা মানে নিজের বুকে খঞ্জর পেরেক ঠুকে নেওয়া। তবুও কেমন অন্য চোখে তাকিয়ে আছে মীরান।

ইব্রাহিম সাহেব রুমে ঢুকে সালাম দেন।

যতোবার রুমে আসবেন, ততোবার সালাম দেবেন তিনি। বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও সালাম দিয়ে যাবেন। অতি সজ্জন। কখনও কাজে ফাঁকি দেন না। দক্ষ। নিয়মানুবর্তী। ইব্রাহিম সাহেব সামনে আসার সাথে সাথে চোখ নামিয়ে নেয় মীরান।

বসুন। আপনার ব্যাখ্যা দিন। ফাইনান্সিয়াল ফাইলটি সামনে তুলে ধরে বললো মীরান।

ইব্রাহিম সাহেব প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চমৎকার ব্যাখ্যা দেন।

ব্যাখ্যা খুশি মনে গ্রহণ করে মীরান।

থ্যাংকস। ভালো হয়েছে। এভাবে ফাইল অগ্রসর করুন।

নিজের কাজের প্রশংসা পেয়ে খুশি হন ইব্রাহিম সাহেব। ফাইল নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। দরজার কাছ থেকে আবার ফিরে আসেন।

স্যার, একটা ছোট্ট দাবী ছিল।

বলুন।

আমার এক পরিচিত ছেলে একাউন্টস সেকশানের জন্য দরখাস্ত জমা দিয়েছে। খুব যোগ্য ছেলে। ওর বন্ধুরা সবাই ওকে হেলপ করছে। ওরা আপনার সাথে দেখা করে গেছে। ছেলেটির ব্যাপারে সুপারিশ থাকলো।

হ্যাঁ মনে আছে। আগেও বলেছিলেন তাই না?

জ্বি স্যার।

ঠিক আছে। আপনার সুপারিশ রাখা হবে।

ধন্যবাদ স্যার।

ছেলেটি কি আপনার সাথে আর যোগাযোগ করেছে? এক্সপ্রেশন লুকিয়ে রাখতে পারে নি মীরান। চট করে প্রশ্নটি বেরিয়ে আসে।

না। আর আসে নি। আসতে বলবো স্যার?

না, না থাক। আসতে বলার দরকার নেই। মনে মনে তিনি ইব্রাহিম সাহেবকে সন্দেহ করেছিলেন। কষ্ট পাচ্ছিলেন সন্দেহ করে। ইব্রাহিম সাহেবের উত্তর শুনে মনে হচ্ছে তিনি এক লাখ টাকার সাথে জড়িত নন। তৃতীয় কোনো পক্ষ আছে।

ছেলেটি কি আপনার কেউ হয়?

না স্যার। আমার কেউ না।

কে নিয়ে এসেছে আপনার কাছে?

প্রশ্ন শুনে একটু হোঁচট খেলেন ইব্রাহিম সাহেব। কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন।

মীরান থামিয়ে দেয়। থাক। আপনি যান। কাজ করুন। কেঁচো খুঁড়লে সাপ বের হবে, এই শংকায় মীরান আপাতত বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চায়। বুঝতে বাকি থাকে না একটি চক্র শেকড় গজাচ্ছে। চক্রটি তাকে বিকিয়ে মুনাফা লুটছে। শেকড়টি ধরতে হবে। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের জন্য শেকড়টি উপড়ে ফেলতে হবে।

বিকেল পাঁচটায় অফিস শেষ হবে। এখনো প্রায় এক ঘন্টা বাকি। জরুরী কাজ ছাড়া সাধারণত চেয়ার থেকে উঠে না মীরান। হাতে অনেক কাজ। কাজে মন বসছে না। টেবিলে বসে থাকাও অসহ্য। অকাজে সেঁটে থাকা কষ্টকর। কষ্টকর সময়ে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা জরুরী।

নিজ অফিস রুমের পাশে রয়েছে একটা রেস্ট রুম। রুমে টিভি আছে। ইজি চেয়ার আছে। রকিং চেয়ার আছে। মাঝে মাঝে এই চেয়ারে বসে রেস্ট নেয়। আজও রেস্টের জন্য পাশের রুমে আসে। চেয়ারে বসে দোল খেতে থাকে।

রিমোটটি নিয়ে টিভি অন করে। প্রথম চ্যানেলে বিটিভি ভেসে ওঠে।

বিটিভিতে জেএমবির তিন সুরা সদস্যের স্বীকারোক্তি দেখাচ্ছে। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে। জেএমবির কর্মকাণ্ড ভুল। ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে তারা। এই কথা বলে জেএমবির সকল সদস্যদের আত্মসমর্পণের ডাক দিচ্ছে। বোমাবাজির নিষ্ঠুর খেলা থেকে সরে আসতে বলছে। নিরীহ মানুষ হত্যার পথ পরিহার করতে বলছে। টিভি অফ করে দেয়। চোখ বন্ধ করে ভাবে ধরা না পড়লে কি এদের শুভ বুদ্ধির উদয় হতো? নাকি মানুষ হত্যাযজ্ঞের খেলায় মেতে থাকতো?

ধরা না পড়লে কি অপরাধের ব্যাপারে সচেতন হয় না মানুষ? ক্রাইম কি করে যেতেই থাকে?

নিজেও কি ক্রাইম করে নি? ব্যক্তিগত ক্রাইম কি চলতে থাকবে? একদিন ধরা পড়তে হবে? এক লক্ষ টাকার দাবীদার ধরা না পড়লে কি একভাবে নিজে বিক্রি হয়ে যেতে থাকবে?

না। অপরাধীকে ধরতে হবে। ছাড় দেওয়া যাবে না। ধরার জন্য ফাঁদ পাততে হবে। কিভাবে? কোন পথে এগোবে বুঝতে পারছে না। আপাতত পরিকল্পনা বাদ দেয় সে। রকিং চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করার জন্য ড্রাইভারকে খবর পাঠায়। একটু পর অফিস থেকে বেরিয়ে আসে।

বনানী রোড ধরে এয়ারপোর্ট রোডে উঠবে গাড়ি। গাড়ি এগোচ্ছে না। বাম দিকের রাস্তায় টার্নিং নেবে সেই উপায়ও নেই। পিছনে আসার পথ বন্ধ। এক মিনিট দুই মিনিট সময় যাচ্ছে। হঠাৎ গাড়ির উইন্ডশীল্ডে টোকা লাগে। একটা ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। হাত পাতছে। তার হাতে একটি পোটলা। পোটলার দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিত কেঁপে উঠে বুক। জেএমবির সদস্য নয় তো? ঝালকাঠিতে গাড়ির জানালা দিয়ে বোমা ছুঁড়ে মেরেছিল তারা। দুই বিচারক নিহত হয়েছিলেন। ঘটনাটি মনে পড়ে যায়। অবশ্য ওদের টার্গেট বিচার ব্যবস্থা। আদালত পাড়ায় আতংক বিরাজ করছে। গাজিপুরে চট্টগ্রামে সর্বত্র বোমা ফাটিয়ে। সাধারণের মাঝেও আতংক কাজ করে। ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে ওদের মগজ ধোলাই করা হয়েছে। নিজেরা মরবে। অন্যকে মারবে। নিজে মরে অন্যকে মারতে চাইলে বিষয়টি সহজ হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ ওদের তল্লাশী চালাতে ভয় পায়। কখন ফুটবে বোমা। কখন উড়ে যাবে নিজ দেহ। ভাবতে পারে না মীরান।

রবীন্দ্র সঙ্গীত চালাও। ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয় মীরান।

কোনটি দেবো স্যার?

হাতের কাছে যা আছে দাও।

ছোট্ট কুশনটি ঘাড়ের কাছে ঠেসে ধরে চোখ বন্ধ করে মীরান। রবীন্দ্র সঙ্গীত বেজে ওঠে ঃ আমারও পরানে যাহা চায়, তুমি তাই তাইগো...।

গরপর তিনটি গান শেষ হয়। এখনো রাস্তার কোনো গাড়ি সরছে না। একটার পর একটা ভিক্ষুক আসছে। মাঝে ফুল বিক্রেতা একটা কিশোরী এসেছে। ছোট টাওয়াল বিক্রি করে এমন আর একটি কিশোরী এসে উইন্ডশীলে টোকা দেয়। হাতের ইশারায় তাকে সরে যেতে বলে। সরছে না। নাছোড়বান্দা সে। দাঁড়িয়ে আছে। বার বার টোকা দিচ্ছে। বিরক্তিকর টোকার দিকে মনোযোগ না দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে। কিছুক্ষণ পর আবার টোকা। হাড়ি পাতিল ধরার প্যাড নিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছে এবার। এগুলো সাধারণত মহিলা যাত্রীদের দিকে এগিয়ে ধরে। এখন দেখছি পুরুষদেরও ছাড় দিচ্ছে না। ঢাকা শহরের নতুন কালচার। নিত্য নতুন উপদ্রবের এটিও একটি উপদ্রব। গান শোনার অনুভূতি টের পাওয়া যাচ্ছে না। চড়া মেজাজ আরো চড়ে যাচ্ছে। উত্তপ্ত হচ্ছে। রিলাক্স হওয়া যাচ্ছে না।

একটু বের হয়ে দেখো তো। এখনো জ্যাম ছুটছে না কেন?

ড্রাইভার বের হয়। সামনে হেঁটে একটু পর ফিরে আসে।

মীরান অস্থির হয়ে আছে।

কী খবর?

সার, এয়ারপোর্ট রোড ব্লক। কোনো ভিআইপি যাচ্ছে মনে হয়।

মনে হয় আবার কি? সঠিক খবরটি নাও।

সঠিক খবর নিয়েছি স্যার। এয়ারপোর্ট রোডে কোনো গাড়ি উঠতে দিচ্ছে না।

রাস্তায় বসে থাকবো নাকি? ধমক দেয় মীরান।

ড্রাইভার ঠাণ্ডা থাকে, ধমক খেয়ে কোনো রিএ্যাকশন দেখায় না। স্যার এমনই। এখন ধমক দেবে। পরে আবার ভালো করে কথা বলবে। স্যারের মেজাজ বুঝতে আর বাকি নেই। তিন বছর ধরে সে স্যারের সাথে আছে।

হঠাৎ গাড়ি বহর চলতে শুরু করে।

একটা গভীর নিশ্বাস নেয় মীরান। নিশ্বাস ছেড়ে আবার চোখ বন্ধ করে। মেজাজ গরম হলে ঠাণ্ডা করে নিতে হয়। রিলাক্স থাকতে হয়। নিজের মনের জন্য দেহের সুরক্ষার জন্য মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরী। নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। জীবন যাপনের ঘটনাগুলো মেজাজ বিগড়ে দেয়।

গাড়ি ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ ব্রেক করতে হচ্ছে। ঝাঁকি খাচ্ছে

দেহ। তবুও করার কিছু নেই। রাস্তায় সবাই অসহায়। এই অবস্থায় বসে গান শোনা ছাড়া উপায় নেই। গান শোনার মজাও চলে গেছে। ব্যাসেট বন্ধ। দুরন্ত অস্থিরতা কাজ করছে নিজের ভেতর।

গাড়ির গতি বাড়ছে। এয়ারপোর্ট রোডে ঢুকেছে গাড়ি। একটানে মহাখালী ফ্লাইভারের ওপর চলে আসে। এই টার্নিংটি ভালো লাগে। মনে হয় বিদেশের কোনো রাস্তায় চলে এসেছে সে। দু'পাশের দৃশ্যাবলী ততো ভালো নয়। তবুও শান্তি। দেশের উন্নতি হচ্ছে। ঢাকা শহরে এ রকম আরো আট দশটি ফ্লাইওভার হলে রাস্তার গতি ফিরে আসতে পারে। রাস্তার গতি ফিরলে রাস্তায় আটকে থাকা লাগবে না। সাথে সাথে মনের গতিও বেড়ে যাবে। যে কোনো সফলতার জন্য মনের গতি দরকার। মানে মীরান।

সেই গতি ফিরে পাচ্ছে সে।

আবার গাড়ি থেমে যায়। একটানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত এসে গাড়ি আর এগোচ্ছে না। আবার অপেক্ষা। আবার গতিহীনতা। আবার গভীর হতাশায় চোখ বোজা।

প্রতিদিন এমন হয়। অফিস ফিরতে গিয়ে মেজাজ চড়ে যায়। নানান কারণে মেজাজ সপ্তমে উঠে বসে আছে। জ্যামের সপ্তমী মেজাজ দশমীতে চড়ে বসেছে।

স্যার গাড়ির তেল লাগবে। ড্রাইভার বললো।

আগে বলো নি কেন?

আপনাকে তো স্যার তেলের কথা বলা লাগে না। ইনডিকেটর দেখে আপনিই তেল নেওয়ার কথা বলেন।

মীরানের রাগ আরো বেড়ে যাচ্ছিল। ড্রাইভারের কথা শুনে রাগ কমে যায়। সত্যিই তো। আজ একবারও তেলের ইনডিকেটরের দিকে চোখ যায় নি। মেজাজ খিচড়ে থাকলে চোখ যে কোথায় থাকে কে জানে।

আমাকে বাসায় নামিয়ে তেল নিয়ে নেবে। গম্ভীর কণ্ঠে বললো মীরান।

আচ্ছা স্যার। ড্রাইভার আশ্বস্ত হয়। তেলের কথা বলতে চায় নি সে। বলেই ফেঁসে গিয়েছিল। ভেবেছিল স্যার ক্ষেপে উঠবে। উঠে নি। ঠাণ্ডা থেকেছে। সাথে সাথে দুশ্চিন্তা কমে গেছে। সব কথা সব সময় বলতে নেই। জানে সে। স্যারের মেজাজ বুঝে চলে। আজ ভুল সময়ে তেলের কথা বেফাঁস বলে ফেলেছে। যাক বিপদ কেটে গেছে। কোনো অঘটন ঘটে নি। ঠাণ্ডা থাকার অর্থ কি? স্যার কি আরো বেশি রাগ করে আছে? নাকি রাগ হজম করেছে। ভাবতে সময় পায় না ড্রাইভার। সামনের গাড়ি চলতে শুরু করেছে। বাসার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে

গাড়ি।

হর্ণ বাজাবেন না। গেইটে সাইনবোর্ড টানানো আছে।

গেইটের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়। সাথে সাথে সিকিউরিটি গার্ড গেইট খোলার কাজ শুরু করে না।

হর্ণও বাজাচ্ছে না ড্রাইভার।

এপার্টমেন্টের সামনে এসে কার তর সয়? মীরানেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

হর্ণ বাজাও ড্রাইভার। মীরান ধমকে উঠে।

স্যারের আদেশ পেয়ে হর্ণের সুইচ টিপে ধরে ড্রাইভার।

ছুটে আসে সিকিউরিটি গার্ড। গেট খুলে পাশে দাঁড়ায়।

উইন্ডশীল দিয়ে কটমট করে তাকায় মীরান। গাড়ি থামতেই দ্রুত নেমে আসে সে। লিফটের কাছে এসে লিফট বাটন টিপ দেয়। হঠাৎ খেয়াল হয় লিফট বন্ধ। লাভবাতি জ্বলছে না।

ইস! প্রচন্ড বিরক্তিতে ধসে যায় মীরান।

সিকিউরিটি গার্ডকে ইশারায় ডাকে।

লিফট বন্ধ কেন?

কারেন্ট নাই স্যার।

জেনারেটরের কী হলো, জেনারেটর তো কারেন্ট যাওয়ার সাথে সাথে অন হওয়ার কথা।

জেনারেটরের কাজ চলছে স্যার।

মীরান আর কথা বাড়ায় না। সিড়ি বেয়ে পাঁচ তলায় উঠে আসে।

নিজের ফ্ল্যাটের বাইরের দরজা খোলা। দরজা পথে কয়েকটি জুতা এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। জুতার র‍্যাক থেকে জুতো পড়ে আছে নিচে। কারুর খেয়াল নেই।

বাসায় ঢুকেই চিৎকার দেয় মীরান।

শেলী। এই শেলী। এই অবস্থা কেন?

শেলী ছুটে এসে জুতো গোছাতে লেগে যায়।

বেয়াদপ। না বলে কোনো কাজ করিস না। করিস কি সারাদিন?

এ সময় কারিনা বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসে।

কি হয়েছে? এমন ষাড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন?

বাসাটাকে গোয়াল ঘর বানিয়ে রাখলে তো ষাড়ের মতো চেঁচাতে হবেই। চিৎকার করে উঠে মীরান।

বাসা কি অসহ্য জায়গা? বাসায় এলে ঘর যেন মাথায় তুলে বসে। উত্তাপ কারিনার কণ্ঠেও। কণ্ঠ থামে না। গজগজ করতে থাকে।

মীরান আর সামনে দাঁড়ায় না। বেডরুমে এসে দরজায় জোরে ধাক্কা দেয়। বিকট শব্দে দরজা লেগে যায়। দরজার লক বাটন টিপে দেয় সে। কাপড় জুতো না খুলে ড্রিম করে শরীরটাকে এলিয়ে দেয় বিছানায়।

মাথায় চাপ। চোখ মুখ গরম। হাপাচ্ছে সে। যন্ত্রণা, রাগ জোরে বিপর্যস্ত। একের পর এক কঠিন ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, শত চেষ্টা করেও রাগ সামাল দিতে পারে না। দিনে দিনে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছে।

সব সইতে পারে, কারিনার উদ্যত ফনা সইতে পারে না। জোরের আগুনে যেন ঘি ঢেলে দেয় ওই রাগান্বিত রমণী। ওকে একদম বোঝার চেষ্টা করে না। নিজের চাহিদা এবং ইগো কমপ্লেক্স নিয়ে বেশি টনটনা। স্বামীর মেজাজ বুঝে কোনো দায়িত্ব পালন করে না, আরো বেশি ক্ষেপিয়ে তোলে।

বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ে মীরান। কয়েকবার এভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের পর মাথা ঠান্ডা হতে থাকে। মন নরম হতে থাকে। একটু পর উঠে বসে। জুতো কাপড় খুলে বাথরুমে যায়। সকালে গোসল করেছে সে। তবুও আবার বাথটাবের পানির সুইচ ছেড়ে দেয়। ঠান্ডা গরম মিশিয়ে বাথটাব ভরে ফেলে। পানিতে নিজেকে একবার ডুবিয়ে নেয়। উষ্ণ শীতল পানিতে গা ডুবিয়ে এখনকার পরিস্থিতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

কারিনার গজ গজ কমে না। ওই ষাঁড়ের মতো লোকটাকে স্বামী ভাবতে কষ্ট হয় তার। পশুর মতো আচরণ করে। এমন স্বামীর সাথে সংসার করা কঠিন। রূপকের রুমে এসে শুয়ে থাকে সে। মন কিছুতেই শান্ত হয় না।

রাতে দশটার ইংরেজি সংবাদ শুনে খেতে বসে মীরান। দীর্ঘদিনের অভ্যাস।

ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজানো হয়েছে। তবুও কেউ টেবিলে আসছে না।

চাচাজান এসে বসেছেন। মীরানও সামনে এসে বসে।

রুনিকে প্লেটে করে বেডরুমে বসে খাওয়াচ্ছে কারিনা। রূপক টেবিলে নেই। প্লেটে ভাত মাছ নিয়ে নিজ রুমে চলে গেছে। ওখানে খাচ্ছে।

চাচাজান সবাইকে ডাকতে যাচ্ছিলেন। ডাকতে পারলেন না।

চাচাজান আপনার রিপোর্ট সব পেয়েছেন? মীরান জানতে চাইলো।

হ্যাঁ বাবা। পেয়েছি। ডাক্তার বলেছে অপারেশন করতে হবে। প্রস্টের গ্ল্যান্ডের সমস্যা।

ওঃ! ভয়ের কিছু নেই। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত হয়েছে। অপারেশনের ডেট কি দিয়েছে?

না দেয় নি। আমি এখন অপারেশনে রাজি হই নি।

কেন? রাজি হলেন না কেন?

কারিনা বললো, সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেওয়ার কথা। তোমার পরিচিত এক ইওরোলজিস্ট আছেন বলেছে। ওনার থেকে একটু মতামত নেওয়া দরকার।

ঠিকই বলেছে। সে কেবল পরিচিত নয়। আমার বাল্যবন্ধুও। তার কাছে আপনাকে নিয়ে যাবো। ভাববেন না আপনি।

আচ্ছা বাবা।

কোনো ওষুধ দেন নি ডাক্তার সাহেব?

হ্যাঁ। দিয়েছেন। খাওয়া শুরু করেছি।

কেমন লাগছে, কোনো পরিবর্তন টের পাচ্ছেন?

সামান্য পরিবর্তন টের পাচ্ছি। প্রস্রাবে সমস্যা কম হচ্ছে।

আল্লাহর ওপর ভরশা রাখেন। আমরা তো আছি।

আমি ভাবছি, সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিয়ে বাড়িতে যাবো।

কেন? বাড়িতে যাবেন কেন?

সবার সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করছে। কী হয়, না হয়।

চাচাজান।

হুঁ?

আপনি কিন্তু ভয় পাচ্ছেন।

ভয় তো একটু লাগছে বাবা।

বললাম তো ভয়ের কিছু নেই। কিছুদিন পূর্বে আমার এক খালুর প্রস্টেট অপারেশন হয়েছে। তিনি পুরো সুস্থ আছেন এখন। আপনিও সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তবুও একটু দেশে যাওয়া দরকার।

না না। পুরো চিকিৎসা করে যান। প্রয়োজনে বাড়িতে খবর পাঠাবো। উনারা বাড়ি থেকে অপারেশনের আগে চলে আসবেন।

মীরানের কথায় আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই। এমনিতে কারিনার বাড়ির কোনো আত্মীয় স্বজনকে সে সহ্য করতে পারে না। তবে চাচা জানের প্রতি কেমন যেন শ্রদ্ধা তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ওনার ভালোর জন্য কথা বললে কারিনার মন ভালো হয়, জানে মীরান। দুই কারণে এখন চাচাজানকে সে হাতছাড়া করতে রাজি নয়। নিজের আচরণে কারিনার মন খারাপ হয়। আবার নিজের আচরণেই কারিনার মন ভালো হয়।

ডাইনিং টেবিলে এসে বসেছে কারিনা। হাতে প্লেট। প্লেটে কলীর অসমাপ্ত খাবার। ওই প্লেটে অল্প ভাত নেয় সে। শোল মাছের একটা টুকরো তুলে নেয়। সামান্য ঝোল মিশিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলে, উনি একবার বাড়িতে যেতে চাচ্ছেন। যাক না। সবার সাথে দেখা করে আসুক।

আচ্ছা যেতে চাইলে যাবেন। চাচাজানকে উদ্দেশ্যে করে বসে মীরান। তবে সেকেন্ড ওপিনিয়নটা আগে নিয়ে নিন।

ঠিক আছে বাবা। তোমরা যা ভালো বোঝ, করো। এতো মমতা মাখা কথা শুনে চাচাজানের সাহস বাড়ে। মনে মনে আপ্লুত হন। খুশিতে চোখে পানি এসে যায়। বাম হাত দিয়ে তিনি চোখ মোছেন। চুপচাপ খেতে থাকেন।

চাচাজান। মীরান নরম সুরে বললো।

জ্বি বাবা।

আপনি টাকা পয়সা নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না। খরচ যা লাগে আমরা দেবো। আল্লাহ সেই তৌফিক আমাদের দিয়েছেন।

চাচাজান কথা বলতে পারছেন না। তার চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুকণা। কারিনার চোখও ছলছল করে ওঠে। কারিনা টেবিলে থেকে উঠে যায়। নরম মনের কারিনার মন আরো গলে যেতে থাকে। চোখে পানি আসে। হেঁটে রুপকের ঘরে আসে। হাতে ভাতের প্লেট।

মাকে কাঁদতে দেখে রুপক লাফিয়ে উঠে।

দুম দুম পা ফেলে ডাইনিং স্পেসে আসে।

দ্রিম করে খাবার টেবিলে একটা ঘুষি মারে। ক্ষুব্ধ সরে বলে, মামণি কাঁদছে। মামনিকে বকেছ কেন?

চাচাজান চোখ তুলে তাকায়। অবাক চাউনি।

মীরানের বিস্ময়ের ঘোরও কাটে না।

ছেলে সত্যি সত্যিই ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধতা নিয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে নিজের রুমে ছুটে আসে। খাটের ওপর ঝাঁপ দেয়।

কারিনা কিছুই বুঝতে পারে না।

অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলে রাগে ফুঁসছে। অকারণে ফুসে ওঠে না। কারণ থাকলেই ফুঁসে ওঠে। এখন সে ঘটনাকে ভুল বিশ্লেষণ করেছে। ভুল করে ক্ষেপেছে।

ছেলের মেজাজের কি ক্ষতি হয়ে গেছে?

ছেলের আচরণ কি অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে?

সন্তানের অমঙ্গল চিন্তায় আচমকা টলে ওঠে কারিনা। বুকের ভেতর সাঁই করে ঘাই বসায় অজানা আতংক।

কারিনা নিজেকে সামলে নেয়। প্লেট রেখে আসে রান্না ঘরে। হাত ধোয়। এক গ্লাস ঠান্ডা পানি পান করে। নিজেকে সহজ করে ছেলের পাশে বসে। পাশে বসে মাথায় হাত বুলোয়। আস্তে আস্তে ঘাড়ের পেছন থেকে চুলগুলো উপরের দিকে টেনে টেনে দেয়। ঘাড়ে হাত বুলোয়। বুড়ো আঙুল এবং তর্জনির মাঝে চেপে চেপে পিঠের ত্বক ম্যাসেজ করে দিতে থাকে।

রূপকের মন নরম হতে থাকে। চোখ বুঁজে আসে তার।

এখন তোমার আব্বু আমাকে বকে নি। ছেলের ভুল ভাঙতে ব্যাকুল মায়ের মন।

তুমি কাঁদছিলে। আব্বু তোমাকে বকেছে। শীতল গলায় বললো রূপক।

না। তোমার আব্বু বকে নি। তোমার নানাজানের অপারেশন করা লাগতে পারে। ওনার খারাপ অসুখ হয়েছে। অপারেশনের কথা শুনে কান্না আসছিল।

না। বকেছে। বিকেলে বকেছে। চিৎকার করেছে ঘরে।

বিকেলে অফিস থেকে এসে রাগ করেছিল। ঘর অপরিষ্কার ছিল বলে রাগ হয়েছিল তোমার আব্বুর।

না। আব্বু পচা। তোমাকে শুধু বকে। তুমিও রাগ করো। তোমাদের বকাবকি, ঝগড়াঝাটি আমার ভালো লাগে না।

ঠিক আছে। আমরা আর রাগ করবো না।

তুমি করবে না। আব্বু করবে আমি জানি।

আর করবে না। আমি বলে দেবো।

তোমার কথা আব্বু শুনবে না।

শুনবে। আমি বলে দিবো যেন শোনে।

আর রাগারাগি করলে আমি বাসা থেকে বেরিয়ে যাবো। রূপক মাকে হুমকি দেয়। হুমকি দিয়ে শুয়ে থাকে।

কারিনার মন খারাপ হতে থাকে। ছেলের অমঙ্গল চিন্তায় আবারো ভয় পেয়ে যায়।

কারিনা নিজের রুমে আসে। রুনি বসে বসে খেলছে। রুনিকে কোলে নেয় সে। রুনি কোলে উঠতে চাচ্ছে না। খেলায় ব্যস্ত। ঘরের মধ্যে খেলনা ট্রেনের রেলপথ বসিয়েছে। গোলাকার ছেলের ওপর দিয়ে ঝুঁকঝাক ঝুঁকঝাক করে ব্যাটারি চালিত খেলনা ট্রেনটি চলছে। রুনি ভীষণ মজা পাচ্ছে। মায়ের আদর

পাত্তা দিচ্ছে না। খলখল করে হাসছে। একবার এদিকে বসছে। মাথা নিচু করে চলন্ত ট্রেনটি দেখছে। ট্রেন কাছে আসার সাথে সাথে এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে। হৈ চৈ করছে সে। চোখে মুখে আনন্দের জোয়ার। এই জোয়ারের মতো শুদ্ধতম কোনো আবেগ নেই পৃথিবীর মানুষের।

কারিনা মুগ্ধ হয়ে রুনিকে দেখছে। দেখে দেখে মন ভালো হতে থাকে তার।

কারিনা খাটে শুয়ে থাকে।

রুনি এক সময় ক্লান্ত হয়। মায়ের পাশে এসে শোয়। মায়ের চুল পাঁচিয়ে ধরে। বাম বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দেয় মুখে। চুষতে থাকে।

মীরান টেলিভিশনের সামনে বসেছিল। উঠে এসে বেডরুমের খাটে শোয়। শোয়ার সাথে সাথে রুনি টের পায়। শরীর মোচড় দিয়ে মা-র ডান পাশ থেকে বাম পাশে চলে আসে। দু'পাশে মা-বাবা। মাঝে রুনি। রুনির নরম পা-টি বাবের পেটের উপর তুলে দেয়।

রুনির নরম পা বাম হাতে ধরে একটু সামনে টেনে নেয় মীরান। এই ভঙ্গিটা খুব ভালো লাগে। সব সময় মা-বাবাকে একত্রে বেঁধে রাখতে চায়। একসাথে দু'জনের ছোয়া চায়। রূপকও ছোটবেলায় এমন করতো। বড় হয়েও আলাদা ঘরে শোয়। আচরণও বদলাচ্ছে। কেন এমন বদলে যাচ্ছে! শংকিত বাবাও।

কারিনা চুপচাপ শুয়ে আছে। মন ভালো হলেও সার্বিকভাবে ভালো নেই সে। এক ধরনের জড়তা নিয়ে পড়ে আছে বিছানায়। মীরানের ইচ্ছে হয়েছিল কারিনাকে জড়িয়ে শুতে।

ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে না। রুনি এখন মাঝখানে। কারিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। সেই ইচ্ছেও জমাট বেঁধে যাচ্ছে। দিন দিন বেসামাল ইচ্ছেগুলো সংযত হয়ে যাচ্ছে।

রিপুর ঘরে কি ঘটছে কে জানে?

ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে তারা। টের পাচ্ছে, আবার পাচ্ছেও না।

প্রায়ই জেদ থাকে মনে। জেদের পর্দা সরিয়ে একত্র হবে। পারছে না তারা। জেদ আরো বাড়ছে। আরো পর্দাটি গাঢ় হচ্ছে। আরো শক্ত সম্পর্কের পর্দা সেঁটে ধরছে তাদের। দূরে সরে যাচ্ছে। দূরে সরে যেতে চায় না অথচ কাছেও ভিড়তে পারছে না। কঠিন যন্ত্রণা বুকে নিয়ে শুয়ে থাকে উভয়ই।

রুনি ঘুমাচ্ছে। রূপক এখনো বাসায় ফেরে নি। মীরানও অফিসে। দুপুর তিনটা চল্লিশ মিনিট। বেডরুমের পাশে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় কারিনা। শীতের রোদে তেজ তেমন নেই। রোদের নরম আলো ভালো লাগছে। এক ধরনের শুদ্ধতম অনুভূতি কাজ করছে মনে। নিজের দিকে তাকানোর সময় নেই। ব্যস্ততায় কাটে দিন। ব্যস্ততায় কাটে রাত। ঘুমের সময় বাদ দিয়ে ব্যস্ত জীবনের ফাঁকফোকর জুড়ে থাকে রাগ, ক্ষোভ, মান অভিমান। পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে ঘুরপাক খায় নিজের মেজাজ। মনের দিকে তো দূরের কথা নিজের শরীরের দিকেও তাকাতে পারে না সে।

হাতে মোবাইল। ডলির কথা মনে পড়ে। স্বামীদের পরীক্ষা করার নিরীক্ষামূলক অভিযানের কথা মনে পড়ে। ডলির স্বামী নাঈম আহমেদের সাথে ইতিপূর্বে পরিচয় হয়ে গেছে। তবুও ফোন নম্বরটিতে হাত নিশপিশ করতে থাকে। ডলি-২ নামে নম্বরটি সেভ করা আছে। মোবাইল সেটের মনিটরে ডলি-২ ভেসে আছে। ইয়েস বাটনে টিপ দিলেই সংযোগ হয়ে যাবে।

ইতস্তত করে কারিনা। পরক্ষণেই মনে পড়ে আসরে গিয়ে সবাই যার যার হোমওয়ার্ক দাখিল করতে হবে। ইতস্তত কেটে যায় তার। ইয়েস বাটনে টিপ দেয়।

কানেকট হয়ে গেছে। রিং হচ্ছে। সংকোচ, জড়তা বেড়ে যায়। তবুও কানের কাছে ধরে রাখে মোবাইল। রিং বাজছে। বুকের মধ্যে ঢিবঢিব বেড়ে গেছে। হঠাৎ থেমে যায় রিং টোন 'নো আনসার' শব্দটি মনিটরে ভেসে ওঠে। যাক। বাঁচা গেল। অন্তত আসরে মিথ্যা বলতে হবে না। সে তার দায়িত্ব পালন করেছিল। উত্তর পায় নি। এ যাত্রায় রেহাই পাওয়া যাবে।

একটি কাক উড়ে এসে বেলকনির গ্রিলে বসেছে। কালো কাক। তিক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। বা কা করে ডাকছে না। কাকের মাথা নিচের দিকে। চোখ এদিক ওদিক ঘুরছে। মনোযোগ দিয়ে কাকের ক্ষিপ্রতা দেখে কারিনা। দ্রুতির গতিতে কাকটি বারান্দার এক কোণে গিয়ে বসেছে। একটা টিকটিকির

মরদেহ টেনে নিচ্ছে পিঁপড়ের দল। কাক টিকটিকির মরদেহে ঠোঁট বসায়। মাথাটি ঝাঁকি দেয়। টিকটিকির দেহে লেগে থাকা পিঁপড়েগুলো এদিক ওদিক ছিটিয়ে যায়। ঠোঁটে টিকটিকি নিয়ে উড়ে এসে খোলা গ্রিলে বসে। তারপর উড়াল দিয়ে চলে যায় পাশের বাসার পেছনের আম গাছের ডালে।

শিকারের ক্ষিপ্র গতি, কৌশল দেখে নতুন সৌন্দর্য আবিষ্কার করে কারিনা। সবচেয়ে বিশ্রী পাখি কাক। সবচেয়ে বিরক্তি লাগে কাকের কা কা রব। সেই কাকের বুদ্ধি এবং শৈল্পিক ছটা, সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় সে।

সব অসুন্দরের মাঝেও কি তবে এমন সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে? দেখার মনোযোগ কি সেই সৌন্দর্য চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারে?

মীরানের অনেক কিছু অসুন্দর আছে। চোখ বুঁজে সৌন্দর্যটা খোঁজার চেষ্টা করে কারিনা।

হ্যাঁ, মীরান ভালো বাবা। সন্তানের জন্য মমতার ঘাটতি নেই। যা করে সব সন্তানের মঙ্গলের জন্যই করে। বউকে বুকে জড়িয়ে ধরে না শুলে ওর ঘুম আসে না। আর বেশি ভাবতে পারে না। মন খুড়ে মীরানের আর কোনো ভালো দিক খোঁজার সুযোগ পায় না কারিনা।

নিজের মোবাইল বেজে ওঠে। ডিসপ্লেতে ভেসে উঠেছে ডলি-২। দ্রিম করে বুকে ঘা খায় সে।

নাঈম আহমেদ, ডলির স্বামী কল ব্যাক করেছে। ইয়েস বাটনে টিপ দিলে একটি পুরুষ কণ্ঠের সাথে নিজের কণ্ঠের মিলন ঘটে যাবে। এ ধরনের মিলন কি শোভন? অনৈতিক নয়? কথা বলা কি বিপজ্জনক নয়? ভাবছে কারিনা। রিং টোন বেজে চলেছে।

কম্পমান হাতে ইয়েস বাটনে বুড়ো আঙুল রেখে টিপ দেয়।

সেটটি কানের কাছে ধরে কারিনা। চুপ করে আছে।

হ্যালো। কে বলছেন প্লিজ। ওপাশ থেকে ভরাট পুরুষ কণ্ঠ ভেসে ওঠে।

কারিনা চুপ। শব্দ করছে না। হ্যালো শোনার সাথে সাথে বুকের কম্পমান অবস্থা স্থিত হতে থাকে।

নাঈম আহমেদ বলছি। হ্যালো।

আপনি আমাকে চিনবেন না। মিহি সুরে জবাব দেয় কারিনা।

ওঃ। তাহলে অপর পাশে কণ্ঠ নয়, কণ্ঠী আছে। আমি তো ভাবলাম ভূতুড়ে ফোন। স্বস্তি নিয়ে জবাব দেয় নাঈম আহমেদ।

হ্যাঁ। ভূত, মেয়ে ভূত। সাবধানে কথা বলবেন। কারিনা সহজ হয়ে যায়।

বাহ্ মেয়ে ভূত তো ভালো কথা বলছে। সাবধান করছে। খারাপ ভূত তো মানুষের ভালো চাইবে না। বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করবে না। বিপদে ঠেলে দেবে। নাঈম বললো।

প্রথমে ভালো ভালো কথা বলে পরিবেশ তৈরি করতে হয়। ঘরে ঢুকতে হয়। তারপর শুরু হয়ে যাবে ভূতের আসল কাজ।

এবারো তো দেখছি সতর্ক করছে মেয়ে ভূত। নাঈম আবারো বললো।

সতর্ক করলেও অন্তরে আছে বিষ। সুবিধে মতো সময়ে বিষ ঢেলে দেওয়া হবে। কাবিনার স্বরে দৃঢ়তা।

এবারও সতর্ক বার্তা। আমার মনে হয় আপনি খারাপ ভূত নই। ভালো ভূত। কারও মঙ্গলের জন্য সতর্ক বার্তা দিয়ে বন্ধুর মতো কাজ করছেন।

কাবিনার মুখ থেকে হঠাৎ কথা হারিয়ে যায়। বুদ্ধিমান নাঈমের খপ্পরে পড়ে যায় সে। কী জবাব দেবে বুঝতে পারছে না।

মেয়ে ভূত। লাইনে আছেন তো? নাঈম বললো।

কাবিনা চুপ।

লাইন কেটে যায় নি। মেয়ে ভূত, আমার কথা নিশ্চয় শুনছেন।

কাবিনা চুপ।

চুপচাপ থেকে শুনুন। আপনার কণ্ঠটি বেশ মিষ্টি। এমন একটা মিষ্টি কণ্ঠীর পরিচয় জানতে ইচ্ছে করছে। নাঈম প্রত্যয়ের সাথে প্রশংসা করে।

নিজের কণ্ঠের প্রশংসা কখনই শুনে নি কাবিনা। ওর কণ্ঠ তেমন মিষ্টি নয়। মিষ্টি না। জানে সে। তবুও প্রশংসা শুনে পুরো দেহে ভালো লাগার একটা গোপন অনুরনন ছড়িয়ে যায়।

আমার কথা শুনছেন?

হ্। শুনছি। বলুন।

পরিচয়টি জানাবেন?

না। কঠিন জবাব দেয় কাবিনা।

কী কারণে ফোন করেছেন, জানাবেন প্লিজ।

না।

আবারো জোরালো না শুনে থমকে যায় নাঈম। শান্ত মাথায় কৌশল বের করার চেষ্টা করে।

এখন মনে হচ্ছে আপনি বন্ধুভূত নয় সত্যি ভূত।

ঠিকই বলেছেন। সত্যি ভূত আমি। সাবধানে এগোবেন।

আবারো সাবধান করেছেন। সত্যি ভূতের আড়ালে মনে হচ্ছে একটি লক্ষী মেয়ে লুকিয়ে আছে। মিষ্টি মনের মেয়ে হয়ে সত্যি ভূত হওয়া যায় না। স্বতঃস্ফূর্ত কথার মাধ্যমে মিষ্টি মনের মানুষের চিত্র দেখা যাচ্ছে।

ভুল বুঝেছেন আপনি। কাবিনা বললো।

সত্যি ভূত ভুল ধরিয়ে দেবে না। ভুলের জালে জড়িয়ে দেবে। নিশ্চয় আপনি মিষ্টি মেয়ে। মিষ্টি মনের মানুষ। এজন্য ভুল ধরাতে চেষ্টা করেছেন।

শুনতে ভালো লাগে কাবিনার। কী জবাব দেবে ভেবে পায় না।

'মিষ্টি মেয়ে, মিষ্টি মনের মানুষ' বাক্যটি মনে আবারো গোপন স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। এমন মধুর স্বরে কথা বলতে পারে পুরুষ মানুষ! তাকে বশ করার কৌশল নয় তো? নাঈম সাহেবের কথায় মিথ্যার ছোঁয়া নেই। নিশ্চয় কথা শুনতে ভালো লাগছে তার। নিশ্চয় ফ্রড নয় সে। তোষামোদে ভরা নয় তার কথা। সত্য অনুভূতি তুলে ধরছে। কিন্তু নাঈম সাহেব তো ডলির স্বামী। ডলির স্বামী হয়ে পরনারীর সাথে এতোক্ষণ কথা চালিয়ে যেতে চাচ্ছে কেন? এই কথা চালাচালির মধ্যে কোনো নেতিবাচক দিক কি নেই? নিশ্চয় আছে। নিশ্চয় এটা নৈতিকতা বিরোধী। নৈতিকতা বিরোধী হলেও তো মন ভালো হচ্ছে। ভালো লাগছে। এভাবে কি মানুষ নিত্য নতুন ভালো লাগার জালে আটকে যায়?

মিষ্টি মেয়ে! নাঈম নির্ভেজাল ভালো লাগার স্বরে ডাকলো আবার।

জ্বি বলুন।

হো হো করে হেসে ওঠে নাঈম। তাহলে আমার সম্বোধন পছন্দ হয়েছে?

হয়েছে। কাবিনা সত্য কথা বললো।

ধন্যবাদ মিষ্টি মেয়ে।

হঠাৎ একজনকে মিষ্টি মেয়ে বলা কি ঠিক হলো? কাবিনা যাচাই করতে চায়।

তাৎক্ষণিক উপলব্ধিতে অবশ্যই ঠিক হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি উপলব্ধিতে ভুলও হতে পারে।

নাঈমের বাস্তব জবাব শুনে আবারো গলে যেতে থাকে কাবিনা। কোনো জবাব দিতে পারে না।

আমি রাখি। কাবিনা লাইন কেটে দিতে চায়।

রাগ করেছেন? নাঈম বিনয়ের সাথে বললো।

না।

আমার সাথে কথা বলে বিরক্ত হয়েছেন?

না।

আবার ফোন করবেন?

জানিনা।

কেন জানেন না?

তাও জানি না।

ফোন করলে জবাব দেবেন?

জানিনা।

আমার টেলিফোন বন্ধু হবেন?

অপরিচিত একজনকে বান্ধবী বানাতে চাচ্ছেন কেন? এতো সহজে একজন মেয়েকে বিশ্বাস করবেন?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার নয়। এখানে বন্ধুত্ব হবে কণ্ঠের সাথে কণ্ঠের, স্বরের সাথে স্বরের। ব্যক্তিগত দেখা সাক্ষাৎ হবে না। এখনকার কথাগুলো ভালো লাগছে। বর্তমান মুহূর্তটুকু ভালো লেগেছে। আপনারও লেগেছে। এজন্যই এতোক্ষণ কথা বলছেন। ঠিক নয়?

জবাব দেয় না কারিনা।

জবাব না দিলেও এটাই সত্যি। এই ভালো লাগায় তো অবিশ্বাসের কিছু নেই। আছে?

কারিনা চুপ।

ঠিক আছে বান্ধবী হওয়ার দরকার নেই। নাঈমের স্বর নেমে আসে।

কারিনা চুপ। নেতিবাচক শব্দটা শুনে কেমন যেন নড়ে উঠলো মন। এখন নেতিবাচক কিছু মেনে নিতে পারে না মনের স্পন্দন।

আপনার ওয়াইফ আছে না? এমনভাবে বললো যেন কিছুই জানে না কারিনা। এতোক্ষণ কথা বলার পর প্রথম কপটতার আশ্রয় নিলো সে। কপট শব্দ ব্যবহার করে নিজের মনই খারাপ হয়ে যায়।

আছে। নাঈম শান্ত থেকে সত্যি জবাব দিলো।

তাহলে আর একটা বান্ধবীর দরকার কি ?

দেহগত বান্ধবী তো এখানে কামনা করছি না। কণ্ঠের সাথে কণ্ঠের বান্ধবীর কথা বলছি।

কণ্ঠের সাথে মনের সংযোগও তো ঘটে যেতে পারে। পারে না? কারিনার প্রশ্ন সরাসরি।

হ্যাঁ। তা হতে পারে।

মনের কানেকশন হলে দেহগত কানেকশনও তো সামনে এসে দাঁড়াতে পারে।

পারে। নাঈমের সহজ জবাব।

এমন সম্পর্ক কি আপনার স্ত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দোষে দুষ্ট হবে না?

নাঈম থেমে যায় এবার। চুপ থেকে শান্ত মাথায় জবাব দেয়, যুক্তিটি ঠিক। কিন্তু চুক্তি যদি এমন হয়, কেবল টেলিফোন সংলাপে সীমাবদ্ধ থাকবে সব, ক্ষতি কী?

লাভক্ষতির বিষয় নয়। কথা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়।

বউ এর আসন অনেক উপরে। নিচে কি ঘটলো সেটা নিয়ে ভাবলে কি জীবন চলে?

বউকে উপরে রেখে তাহলে নিচে বসে বিশ্বাসঘাতক হওয়া যায়? এটাই কি আপনার জীবন দর্শন? কারিনার কঠিন প্রশ্ন।

না। এটা আমার জীবন দর্শন নয়। এটা আমার এখনকার উপলব্ধি। কারণ এখনকার উপলব্ধিটি সত্য। সুন্দর। এখানে বউ এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কিছু দেখছি না।

তাই বলে অপরিচিত একটি কণ্ঠের সাথে ফ্রেন্ডশীপ করার জন্য ব্যাকুল হবেন?

ব্যাকুলতার প্রশ্ন আসে কেন? ফোন তো আপনি করেছেন। তাছাড়া কণ্ঠের সাথে কণ্ঠের বন্ধুত্ব অপরিচিত হলেই তো ভালো। পরিচিত হলে তো বিপদ। ঠিক না?

কারিনা থেমে যায় এবার। যুক্তিটি মেনে নেয়। কঠিন হয়ে ওঠা মন নরম হয়। মৃদু হাসির ছটা ছড়িয়ে বলে আপনি খুব ভালো। বলেই নরম করে হেসে ওঠে।

তাহলে আবার ফোন পাবো?

জানি না।

মিসকল দিলে হবে। আমি কল ব্যাক করবো। ঠিক আছে? নাঈম বললো।

জানি না।

সব কিছু জানি না বলে চালিয়ে দিলে কি হবে?

তাও জানি না।

এবার জানি না শব্দটি থামান। নিজের নামটি জানান।

না। নাম জানাবো না।

তাহলে অনামিকা হিসেবেই ফোন করবেন। নাঈম বললো।

দেখি। কারিনার সহজ জবাব।

তাহলে মেনে নিয়েছেন শর্ত? নাঈম জয়ীর ভঙ্গিমায় হেসে উঠলো।

প্রশ্নটির জবাব দেয় না কারিনা। হাসতে হাসতে বলে, রাখি।

নাঈম বলে, ভালো থাকবেন।

কারিনা বলে, আপনিও ভালো থাকবেন।

লাইন কেটে দেয় কারিনা। বেডরুমে ফিরে আসে। রুনি এখনো ঘুমুচ্ছে। বেডরুমে ঝুলে আছে মীরানের ছবি। একবার ছবির দিকে তাকায় সে। বুকটা যেন কেমন করে কেঁপে উঠলো। চোখ ফিরিয়ে নেয় ছবি থেকে। ডাইনিং স্পেসে এসে এক গ্লাস পানি পান করে। টেবিলের পাশে ফ্রিজ। ফ্রিজ চার্জিং হচ্ছে। সাঁ সাঁ আওয়াজ ছাড়ছে। মনোযোগ দিয়ে আওয়াজটি শোনার চেষ্টা করে। দীর্ঘদিনের ফ্রিজটি কোনো ঝুটঝামেলা ছাড়া সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। ফ্রিজের বাহিরের চেহারায় মলিনতা এসেছে। সার্ভিসে ফাঁকি নেই। ত্রুটি নেই। বাহিরে মলিনতা ঢেকে ফেলা যায়। ভেতরের সজীবতা বজায় না থাকলে বাহিরের মলিনতা ঢেকে কি লাভ আছে? ফ্রিজের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কারিনা। মনে মনে ঠিক করে সার্ভিস সেন্টারে পাঠিয়ে ফ্রিজটি রং করিয়ে নিতে হবে। বাহিরের খোলস ঝকমকে করে তুলতে হবে। ঘরেও সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য বিষয়টি জরুরী। জরুরী কতো কাজ পড়ে আছে। সংসার অনেক শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে খেয়াল দিতে পারে নি দীর্ঘদিন। এখন নজরে আসছে সব। কাজের পরিকল্পনা আঁটতে থাকে মনে মনে। সংসার গোছানোর কাজে মনোযোগ দেয় কারিনা।

নিজের মনে একটির পর একটা কাজ করে যাচ্ছে। হঠাৎ কলিং বেল বেজে ওঠে।

কাজ থামিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় সে। শেলী ঘুমে। রুনি ঘুমে। রূপক এখনো ফেরে নি। তাকেই দরজা খুলতে হবে। পরিচিত ঢঙে বেজেছে কলিং বেল। নিশ্চয় মীরান এসেছে। বেলের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারে সব।

কীহোলে চোখ রেখে বাহিরে তাকায় কারিনা।

ঠিকই ধরেছে। মীরান এসেছে। হাতে কয়েকটি প্যাকেট।

দরজা খুলে পাশে দাঁড়ায় কারিনা।

মীরান একটু হোঁচট খায়। দীর্ঘদিন মীরানের কলে দরজা খোলে নি কারিনা। আজ খুলেছে। হাতের প্যাকেটগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

মীরান আবারো অবাক হয়। সূর্য কি পশ্চিমে উদয় হচ্ছে?

বুঝতে পারে আজ কারিনার মন ভালো। আজ রেগে নেই। চাপে নেই। মেজাজ শীতল আছে।

ঘরের আবহ বদলে গেছে। আজ সব ফিটফাট। ডাইনিং টেবিল, ড্রয়িং রুম সব ঝকমকে। টিপটপ গোছানো ঘরে ঢুকে মীরানের মনও শান্ত হয়। ডাইনিং স্পেসের ছাদের কোনায় হালকা মাকড়সার জাল দেখেছিল। দেয়ালের ক্যালেন্ডারটির পজিশন ঠিক ছিল না। বাঁকা হয়ে ঝুলেছিল। এখন মাকড়সার জাল নেই। ক্যালেন্ডারটির মাস বদলে গেছে। দৃষ্টি নন্দনভাবে ঝুলে আছে। দেয়ালের চেহারা বদলে গেছে। বুক সেলফের ওপর ঝাড় মোছের কাজ হয়েছে বোঝা যায়।

ঝকমকে ঘরে মীরানের মনও ঝলমল করে ওঠে।

হাতের প্যাকেটগুলো নিয়ে রান্না ঘরের দিকে চলে যায় কারিনা।

মীরান বেডরুমে আসে।

বিশেষ কারণে মেজাজ খারাপ ছিল। মেজাজ এমনিতেই চাপে থাকে। খারাপ থাকে। এমন খারাপ মেজাজে থাকলে ঝগড়া বাধার কথা। আজ ঝগড়া বাঁধে নি। উত্তপ্ত মন কারিনার সহজ সরল আচরণে নরম হয়ে গেছে।

কুরিয়ার সার্ভিস একটা জরুরী চিঠি আসার কথা। কয়েকদিন পূর্বে এসেছে। টেলিফোনে প্রেরকের সাথে কথা হয়েছে। বাসার ঠিকানায় চিঠিটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ সেটি সে পায় নি। আজ বাসায় ঢোকার সময় সিকিউরিটি গার্ডের সাথে কথা হয়েছে। গার্ড বলেছে চিঠিটির কথা। কারিনাকে দিয়েছে বলে জানিয়েছে। অথচ সঠিক সময়ে চিঠিটি তার হাতে পৌঁছে নি।

এজন্য ভীষণ রাগ হয়েছিল মীরানের। সেই রাগ এখন পানি হয়ে গেছে।

মীরান অবাক। কারিনার হাতে গরম চা। চা থেকে ধোঁয়া উড়ছে। বউ নিজের হাতে চা বানিয়েছে। মন আরো ভালো হয়ে যায়।

হাত বাড়িয়ে চা'র কাপটি হাতে নেয় সে। ফু দিয়ে কাপে চুমুক দেয়। যেন চুমুক দিচ্ছে নিজের বউ এর ঠোঁটে।

কারিনা কিছু বলছে না।

বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মীরান স্বাভাবিক স্বরে বলে, চা খুব ভালো হয়েছে।

কারিনা ঘুরে দাঁড়ায়। চা এর সাথে কিছু খাবে।

না। লাগবে না। চা-ই চলুক।

কারিনা আবার চলে যেতে উদ্যত হয়।

কয়েকদিন আগে একটা চিঠি এসেছিল। জরুরী চিঠি। গার্ড বললো তোমাকে দিয়েছে।

ওহো! ওটা তো রুনির ব্যাগে রয়ে গেছে। রুনি নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিল তোমাকে দেবে বলে। ভুলে গেছে সে। আমারও মনে ছিল না। সরি। বলেই সে রুনির টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। ব্যাগ থেকে চিঠিটি বের করে মীরানের হাতে দেয়।

খাম বন্ধ। খোলা হয় নি। মীরান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

মনে মনে ভাবে মারাত্মক ভুল হয়ে যেতো। আজ ফাটাফাটি হয়ে যেতো। ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যেতো। অথচ সব কিছুর কেমন সরল সমাধান হয়ে গেল। তৃপ্ত মনে চা শেষ করে রুনির পাশে বসে। মাথায় হাত বোলায়।

তারপর বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়।

আয়নায় নিজেকে দেখে।

মনে হচ্ছে পরিতৃপ্ত পুরুষ সে।

মনে হচ্ছে জয়ী পুরুষ সে।

মনে হচ্ছে বউ এর ভালোবাসা আবার ফিরে পেয়েছে।

মনে হচ্ছে দ্বন্দ্ব কেটে গেছে। সোনালী সূর্য আবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এ সময় মোবাইল ফোনটি বেজে ওঠে।

পকেট থেকে সেটটি বের করে বাম হাতে দিয়ে 'ইয়েস' বাটন টিপে দেয়।

হ্যালো। এটা কি মীরান সাহেবের নম্বর? একটি মেয়েলি কণ্ঠ।

হ্যাঁ। মীরান চৌধুরী বলছি।

যাক। আপনাকে পাওয়া গেল। মেয়েলি কণ্ঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

আপনি কে বলেছেন প্লিজ? মীরান জানতে চায়।

কে হলে খুশি হবেন? কথায় কপটকতা ঝরে পড়ে।

কে হলে খুশি হবো মানে? কী বলতে চান আপনি?

আপনি আমাকে যা বানাতে চান, তাই হবো আমি। মেয়েলি স্বরে হাসির চমক।

বানাতে চাওয়ার প্রশ্ন আসে কেন? আপনি যে, সেই পরিচয় দিন। মীরান দৃঢ়ভাবে বললো।

না। সেই পরিচয় দেওয়া যাবে না।

পরিচয় না দিলে লাইন কেটে দেবো।

দিলে দেন। আমি আবারো ফোন করবো।

ফোন করবো মানে? আমার পেছনে লেগে থাকবেন নাকি?

পেছনে না। ইচ্ছে করলে বুকের মধ্যে রাখতে পারবেন।

পরিচয় বলুন। থমকে যায় মীরান। ফাজলামি করবেন না। আমি ফাজিল মেয়ে পছন্দ করি না।

কী ধরনের মেয়ে পছন্দ করেন?

যে ধরনের মেয়ে পছন্দ করি, অন্তত আপনি তেমন নয়।

তেমন কেউ আছে নাকি?

থাকবে না কেন? একশো বার থাকবে।

বাহ্! রেগে যাচ্ছেন কেন? আমি কি রাগের কথা বলছি। আপনার কেউ আছে নাকি জানতে চেয়েছি।

আমার বউ আছে। বউ এর সাথে কথা বলবেন?

না। অন্যের বউ এর সাথে কথা বলে লাভ কী? কথা বললে আপনার সাথে বলবো অথবা আপনার অন্য কেউ থাকলে তার সাথে কথা বলবো। তার মতো হয়ে যদি আপনার মন জয় করা যায়।

কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে, বুড়ি মেয়ে আপনি। কর্কশ স্বর। বুড়ি মেয়ের সাথে কথা বলার খায়েশ নেই আমার।

তো, আপনার কেউ যে জন, সেকি কচি মেয়ে?

আমি ফোন রাখছি। পরিচয় না দিলে আর কথা বলবেন না।

মেয়েটির প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে ধমকে দেয় মীরান।

ধমক দিচ্ছেন কেন? আমি আপনার একজন ফ্যান। ফ্যানের সাথে এমন সুরে কথা বলা কি ঠিক?

ফ্যান শুনে কণ্ঠ নরম হয় মীরানের।

পরিচয় গোপন করলে কারুর সাথে কথা বলি না আমি।

পরিচয় দেবো। এতো তাড়াতাড়ি পরিচয় পেতে চান কেন?

পরিচয়হীন কারুর সাথে কথা বলা বিপজ্জনক। আজকাল চারদিকে প্রতারক এবং সন্ত্রাসীদের ভিড়। পরিচয় না জেনে কথা বলবো কেন?

ওঃ। তাহলে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। বিপদের কথা ভেবে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন, তাই না?

না। ঠিক তা নয়। এখন বাসায়। বাথরুমে। এখানে বসে কোনো মেয়ের সাথে কথা বললে পারিবারিক বিপর্যয় আসতে পারে। পারে না?

তা পারে। এজন্যই বুঝি কথা বলতে চাচ্ছিলেন না।

একক কোনো কারণ নয়। মাল্টিপল কারণ আছে। মীরান সহজ স্বরে কথা বলে শেষ করে দিতে যাচ্ছিলো। লাইন কেটে দিতে পারলো না।

ওঃ! নিরাপদ জায়গা হলে কথা বলবেন? ভেবেছিলাম আপনি অফিসে। নিরাপদ জায়গায়। বউ এর কাছ থেকে দূরে। এ কারণে সুযোগটি নিতে চেয়েছিলাম।

আপনি দেখছি পরিচিত কেউ। সব খবর রাখেন মনে হচ্ছে।

পরিচিত কেউ নই। পরিচিত হতে চাচ্ছি।

চাকরির দরকার আপনার? আমাকে গলাতে চাচ্ছেন? আচমকা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় মীরান।

ওঃ! চাকরি পাওয়ার লোভে কেউ কেউ গলানোর চেষ্টা করে নাকি?

করবে না কেন? স্বার্থের জন্য মানুষ সব করতে পারে।

আচ্ছা। আচ্ছা। সেই করতে পারা বিষয়ে আপনি উৎসাহ দেন। তাই না?

না, না। তা দেবো কেন? তবে ফোন পাই। অস্বীকার করবো না।

আমি চাকরি চাই না।

কী চান আপনি?

চাই? না। থাক। বলবো না। এখন বাথরুম থেকে বের হন। বউ'র কাছে যান। বউকে ভালোবাসেন। যা চাই পরে বলবো। পরে ফোন করবো। বাই! বলেই ফোন কেটে দেয় মেয়েটি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে মীরান। দম বন্ধ হওয়া কয়েক মিনিট কথা চালিয়ে গেছে সে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে রুনি খাটে নেই। উঠে গেছে। কারিনাও নেই। ড্রয়িং রুমে এসে দেখে মেয়ে টম এন্ড জেরি দেখছে। কারিনা রুনির ঢুলুঢুলু চোখে আদর বুলিয়ে দিচ্ছে।

রূপক কোথায়? ওদের সামনে এসে প্রশ্ন করে মীরান।

বাসায় ফেরার সময় পেরিয়ে গেছে। এখনো আসছে না। উদ্বেগ নিয়ে বললো কারিনা।

আসছে না মানে? খোঁজ নাও নি?

না। খোঁজ খবর করলে ক্ষেপে যায় ও।

তাই বলে খোঁজ নিতে হবে না?

না। খোঁজ নেওয়ার দরকার নেই। স্কুল থেকে বের হয়ে ধানমন্ডি মাঠে যায়। ওখানে ক্রিকেট খেলে। ক্রিকেট খেলার পরও মাঠে আড্ডা দেয়। সন্ধ্যা পেরিয়ে বাসায় ফেরে। প্রতিদিন এমন চলছে।

আমাকে তো বলো নি কখনো।

তোমাকে বলতে হবে কেন! তুমি বাবা। ছেলে বড় হচ্ছে। ছেলের খোঁজ বাবাদের রাখতে হয়। মাকে ছেলেরা কি পাত্তা দেয়? খোঁজ তো রাখো না।

মীরানের মন খারাপ হয়। প্রতিদিন সে দেরি করে বাসায় ফেরে। বাসার প্রতি কি দায়িত্ব পালন করছে না? রূপকের প্রতি কি অবহেলা দেখাচ্ছে? নিজের মনে প্রশ্ন আসে। উত্তর খোঁজে মনে মনে।

না। বাসার প্রতি মমতার ঘাটতি নেই। রূপকের মঙ্গলের জন্য সব কিছু করতে পারবে সে। রুনির কল্যাণের জন্য সব করতে পারে। নিজের জীবন তো মোটামুটি সফল। ওদের জীবনে প্রতিযোগিতার পর প্রতিযোগিতা চলবে। কঠিন প্রতিযোগিতা থেকে উপরের দিকে উঠে আসতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে ওদের। রূপক-রুনির প্রতি তো নিজের মনে অবহেলার কণা মাত্র নেই। কঠোর পরিশ্রমের জন্য ওদের তৈরি করতে হবে। শৈশবে জীবনের ভিত্তিমূল তৈরি হয়ে যায়। শৈশবের প্লাটফর্ম কৈশোরের স্বচ্ছল গতি তৈরি করে। কৈশোরের বাবহার তারুণ্যদীপ্ত যৌবনের জয়গান প্রতিধ্বনিত করবে। মনে পড়ে একটি ভাবসম্প্রসারণের কথা– 'সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।'

ভাবতে গিয়ে মাথায় চাপবোধ করে। টনটন করে ওঠে মাথা। মেজাজে অস্থিরতা জেগে ওঠে। নিজের রুমে ফিরে আসে। নিজ রুম থেকে এবার রূপকের রুমে আসে। ছেলের টেবিল এলোমেলো। বইপত্র অগোছালো। পড়ার টেবিলে সিডিতে ভরা। কোনোটি ফোল্ডারের ভেতর। কোনোটি ফোল্ডার ছাড়া। একটি খাতা খোলা। স্ট্যাপলার পিনের প্যাকেটও খোলা। এদিক ওদিক পড়ে যাচ্ছে ছোট ছোট জ্যাম পিন। ক্যালকুলেটরটি চেয়ারে।

এটা কোনো ভালো ছাত্রের পড়ার টেবিল হতে পারে না।

মন খারাপ হয়ে যায় মীরানের। ডানপাশে অটোবির তৈরি কম্পিউটার টেবিল। সিডি রাখার জন্য তাক রয়েছে এই টেবিলে। তাকে ভরা সিডি। কোথাও ফাঁকা জায়গা নেই। কম্পিউটারে আছে টিভি কার্ড। টিভি চলে, ডিশ লাইন আছে। ভাইবোনের মধ্যে অনেক সময় জেদাজেদি হয়। ঝগড়া হয়। কেউ কার্টুন দেখতে চায় তো, অন্যজনে চায় খেলা। প্রায় মারপিট কান্নাকাটি চলে। এ জন্যে রূপকের আলাদা টিভি কার্ডের ব্যবস্থা হয়েছে। ডিশের লাইনটি দেওয়া ঠিক হয় নি। বুঝতে পারে মীরান। এই প্রজন্ম হচ্ছে ডিশ প্রজন্ম, ইন্টারনেটের প্রজন্ম। সবার সাথে তাল মেলাতে গেলে সবকিছুর দরকার আছে। এগুলোর অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। কারিনা নিয়ন্ত্রণ করছে না। সেও সময় দিচ্ছে না। মনে মনে কেবল সন্তানের মঙ্গল কামনা করলে কি চলে? তলে তলে ছেলের ব্যবহারে পচন ধরেছে। বুঝতে বাকি থাকে না মীরানের।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। রূপক আসছে না। ছেলে একা একা এতোক্ষণ বাহিরে কাটায় একটুও জানে না মীরান। মন খারাপ টিনটিন করে ওঠে। রাগ হয়। রাগ গিয়ে পড়ে কাবিনার ওপর। মা হয়ে ছেলের প্রতি নজর রাখছে না। তাকেও জানায় নি। মেজাজ কেবল স্বামীর ওপরই দেখাতে পারে। চিন্তার সাথে সাথে চক্রবৃদ্ধি হারে রাগ বাড়তে থাকে। বাড়তি রাগ নিয়ে নিজের রুমে ফিরে এসে শুয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পর কলিং বেলের শব্দ শুনতে পায় মীরান। ওঠে না। শুয়ে থাকে। নিজের বেডরুমের দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায় বাহিরের দরজা। কাবিনা দরজা খুলে দিচ্ছে। স্কুলের ব্যাগ কাঁধে, স্কুলের ড্রেস ধুলোয় ভরা। সাদা কেডস চেনা যাচ্ছে না, রূপক ঘরে ঢুকছে এ অবস্থায়। ঢুকেই ব্যাগটি সোফার ওপর ছুঁড়ে দেয়। কেডস খুলে এলোমেলো ফেলে রাখে। মোজা খুলেও ছুঁড়ে দেয়। মোজা জোড় সোজা ঢুকে গেছে সোফার তলে।

কাবিনা একদম শীতল চোখে তাকিয়ে আছে রূপকের দিকে।

রূপক পাত্তা দিলো না মাকে।

রুমি সোফায় শুয়ে আছে। ঘরে কে এলো সেদিকে মন নেই। মন টিভিতে।

মীরান এবার ওঠে। মেজাজ ঠান্ডা রাখা দরকার। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ওঠে সে। কাবিনার ওপর রাগ হলেও রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি। বাসায় ঢুকে ভালো সম্মান পেয়েছে। মন এ কারণে ভালো ছিল। ছেলের অবস্থা দেখে মন খারাপ হলেও নিজের এক্সপ্রেশন লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে মীরান।

রূপকের রুমে আসে। রূপক টাওয়াল নিয়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল। ছেলের দিকে ঠান্ডা চোখে তাকায় সে।

শীতল গলায় প্রশ্ন করে। এতো দেরি করে ফিরলে কেন?

রূপক চোখ তুলে তাকায়। উত্তর দেয় না। বাথরুমে ঢুকে যায়। দরজায় ঠাস করে শব্দ হয়।

মীরান হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসে।

কিছুতেই মনের অবস্থা বেশিক্ষণ ভালো থাকছে না। কিছুতেই ঘরের আবহ দীর্ঘদিন সুস্থ থাকছে না। কোনো না কোনোভাবে ঘরের আবহ ঘোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। মনে জট বেঁধে যাচ্ছে। অশান্তির গোপন ধস নামছে। টের পেতে পেতে ক্ষতি বেড়ে যায়। ক্ষতি সামাল দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেকে শাসন করা দরকার। নিয়ন্ত্রণ করা দরকার বুঝতে পারে মীরান। শাসন করতে হলে সময় দিতে হবে। নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিজের মেজাজও ঠিক রাখতে হবে। নিজে

নিয়ন্ত্রিত না থাকলে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এ কারণে সংসারে ভাঙচুর হচ্ছে। উপলব্ধি করে মীরান। একরম উপলব্ধি আগেও এসেছে। সেই উপলব্ধিও বেশি টেকে নি। এবার টেকাতে হবে মনের জোর। ভাবতে ভাবতে চাচাজানের রুমের দিকে আসে সে।

রুম খালি। চাচাজান নেই। চলে গেলেন তাকে না জানিয়ে? চলে যেতে পারলেন? সেতো খারাপ ব্যবহার করে নি। যত্ন করেছে। প্রথমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য উনাকে ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে শ্রদ্ধাবোধ জেগেছিল। মন থেকে উপকার করার ইচ্ছে তৈরি হয়েছিল।

ওইরুম থেকে ফিরে এসে এবার কাবিনার সামনে দাঁড়ায়।

চাচাজান চলে গেছে?

না। যায় নি। মীরপুর গেছে। কয়েক দিন থাকবে। আবার ফিরে আসবে।

ওইখানে কার কাছে গেল?

উনার এক আত্মীয় থাকেন। উনারা খবর পেয়েছে, জোর করে নিয়ে গেছে।

যাবেন বলে জানান নি তো আমাকে।

জানানোর সময় পায় নি। তোমাকে ফোন করেছিল। অফিসে ছিলে না তুমি। মোবাইল সেটও বন্ধ ছিল।

ও!

ফিরে আসে মীরান। আবার রূপকের রুমে আসে।

ড্রেস পাল্টাচ্ছে রূপক। স্বাভাবিকভাবে বাবাকে প্রশ্ন করে, ক্রিকেট খেলা নিষেধ নাকি?

খেলা নিষেধ হবে কেন? ছেলে খেলবে। খেলার সময় মাঠে থাকবে মা বাবা তো খুশী হবে। মীরান নরম স্বরে জবাব দিলো।

তাহলে প্রশ্ন করছো কেন?

প্রশ্ন তো খেলার জন্য করি নি। এতো দেরি হলো সেজন্য করেছি। দেরি করা উচিত নয়। মা-বাবার দুশ্চিন্তা হবে না?

বাসায় সব সময় ঝগড়া-ঝাটি চলে। ঘরে ভালো লাগেনা। বাইরে বেশি ভালো লাগে। ঠান্ডা মাথায় জবাব দেয় রূপক।

ছেলের জবাব শুনে বোকা হয়ে যায় মীরান।

নিজেরা কোথায় নেমে গেছে বুঝতে পারে। অথচ নিজেকে সফল ভাবে নিজেই। সফল নয় সে। শূন্য। ব্যর্থ। একরত্তি ছেলের এমন উপলব্ধি হলে ছেলের বাবা মাকে সফল ভাবা বোকামি।

নিজের অস্তিত্বের শেকড়ে এই মুহূর্ত ঢুকে গেছে অনিশ্চিত শংকা। ছেলের কী ক্ষতি করে ফেললো তারা?

শংকা বুকে নিয়ে নিজ রুমে আসে।

রূপক ঘুরে ফিরে নিজের রুমে যায়। কম্পিউটার অন করে বসে। পড়ার প্রতি আগ্রহ নেই। কম্পিউটারে মজা। কম্পিউটারে আনন্দ।

কম্পিউটার অন করার আওয়াজ টের পায় মীরান। খারাপ মনে আরো চাপ তৈরি হয়। মাথাটা আবারো ঠাস করে ধাক্কা খায়। উঠে সে। ছেলের রুমের দিকে হেঁটে আসে। দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। কোনো প্রশ্ন নয়। বড় বড় চোখ করে ছেলের দিকে তাকায়।

রূপক টের পায়। আব্বু দরজায় দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারে। চোখের ফিল্ডে বাবার উপস্থিতি ধরতে পারে। ধরতে পারলেও প্রতিক্রিয়া দেখায় না। খেলেই চলেছে। কী বোর্ডে আঙুল টিপছে। মাউস ঘোরাচ্ছে। ভায়োলেন্সের দৃশ্য থেকে চোখ ফেরায় না।

ধ্বংসযোগ্য দৃশ্যটি মনিটর করছে রূপক। দুই অস্ত্রধারী বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আক্রমণ করেছে নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর।

আগুনের লেলিহান শিখা ছেসে আসছে। জ্বালাও পোড়াও দৃশ্যটি মীরানের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। যেন গোমস খেলায় কম্পিউটারের স্ক্রিনে আগুন জ্বলছে না। আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে নিজের মনে। ছেলে কি সহিংসতা দেখে দেখে নিজেই সহিংস উদ্যত আচরণ করছে? নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? প্রশ্ন আসে মনে। উত্তর খুঁজে পায় না সে।

রাতে মীরানের ভালো ঘুম হয় নি। সে চেয়েছে কারিনাকে। মনে মনে চেয়েছে। উদ্যোগ নেয় নি। নিতে পারে নি। জড়তার সুতোয় আটকে ছিল ইচ্ছে। আটকে ছিল মন।

কারিনার মন প্রসন্ন ছিল। তারও ইচ্ছে ছিল কাছে ঘেঁষার। বিনে সুতোয় আটকে ছিল তারও চাওয়া পাওয়া। অসফল ইচ্ছের ঠমোট কষ্টে কেটেছে রাত।

ভোরে উঠে হাঁটতে বের হয়েছে মীরান।

গার্ড বলে, স্যার, বাইরে কুয়াশা ঝড়ছে। এতো তাড়াতাড়ি বাহিরে যাওয়া ঠিক হবে না।

গার্ড অল্প বয়সী একটি ছেলে। সাধারণত কথা বলে না। সালাম দিয়ে দূরে সরে থাকে। আজ দূরে সরে যায় নি। আগ্রহ ভরে স্যারকে উপদেশ দিচ্ছে, ঠান্ডা লেগে যাবে। গরম কাপড় পরে বের হলে ভালো হয় স্যার।

মীরান একটু ধাক্কা খেল। কেউ তাকে অযাচিত উপদেশ দিলে রেগে যায় সে। এখন রাগে নি। বিষয়টি সহজভাবে নিয়েছে। মূল ভবনের ভেতর থেকে গেইটের বাহিরে এসে থমকে দাঁড়ায়।

বাহিরে ঝিরঝিরে পানি কণায় জমে আছে পুরো এলাকা। তিন চার হাত সামনের জায়গা দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে পুরো ঢাকা। সেই সঙ্গে আছে উত্তরের কনকনে হাওয়া। আবহাওয়াবিদরা বলেছেন এ অবস্থা এক থেকে দেড় সপ্তাহ থাকবে। মাঘের প্রথম সপ্তাহ বা জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হতে পারে মাঝারি থেকে তীব্র শৈতা প্রবাহ। তখন দেশের বেশ কিছু এলাকার তাপমাত্রা চার ডিগ্রিতে নেমে আসতে পারে। মনে পড়ে গতকালের মিটিংয়ের কথা।

বাহিরের গেইট থেকে ফিরে আসে মীরান। সিঁড়ি বেয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসছে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা ভালো ব্যায়াম জানে সে। অনভ্যাস হয়ে গেছে, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে না এখন। অনভ্যাসে অনেক ভালো কাজের অজস্র হারিয়ে যায়। মীরানও হারিয়ে ফেলছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে

আসে। বাসায় এসে গতকালের পেপারটি খুঁজে বের করে। হেড লাইনগুলোয় চোখ বোলায়। একটি নিউজে চোখ আটকে যায়। প্রধানমন্ত্রীর সাতক্ষীরা সফর বাতিল হয়েছে। কুয়াশার কারণে অর্ধেক পথ থেকে হেলিকপ্টার ফিরে এসেছে।

মীরানের মাথায় চট করে জেদ চেপে বসে। কোনো কাজ অসম্পূর্ণ রেখে ফিরে না সে। সকালে হাঁটবে বলে বেরিয়েছে। কুয়াশার কারণে ফিরে এসেছে। সামনের বাধা জয় করে এগিয়ে যাওয়া উচিত। নিজের জোরালো বৈশিষ্ট্য জেগে ওঠে।

বিকল্প পথ বের করে সে। ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দেয়। পকেটে কিছু টাকা নেয়। একটা মাফলার নিয়ে নাক ঢেকে রাখা উচিত। একবার ভাবে বিষয়টি। মাফলার বিশ্রী লাগে। নিজেকে বিশ্রী ভাবলে স্মার্টনেস কমে যায়। স্মার্টনেস কমে গেলে নিজের গতিও প্রভাবিত হয়। শ্লথ হয়ে যায়।

মাফলার ছাড়া বেরিয়ে আসে সে।

অনেকদিন সকালে হাঁটা ছেড়ে দিয়েছিল। বড় ভাইদের কমিশনের ভয়ে হাঁটিতে গিয়েছিল। এখন ভয় উধাও হয়েছে। নিশ্চয় ওরা ভুলে গেছে। ভুলে না গেলেও এই কনকনে শীতে নিশ্চয় তারা বের হবে না। মোটামুটি স্বস্তি নিয়ে দ্রুত গতিতে বের হয়। এবার গার্ড কথা বলার সাহস পেলো না। গেইট খুলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

ছয় নম্বর রোডের শেষ প্রান্ত লেকের পাড়ের সাথে মিশে গেছে। ডানে টার্নিং নিয়ে হাঁটা শুরু করে সে। রাস্তায় নেমে দেখে অনেক নারী পুরুষ যার যার গতিতে হেঁটে যাচ্ছে। সে একা নয়। না বের হলে ভুল হতো। ভুল আবারও শুদ্ধ হয়ে ওঠে। একটি পঙ্গু লোক সামনে থালা রেখে রাস্তার পাশে ভাঙা একটা হুইল চেয়ারে বসে আছে। চাদরে ঢেকে আছে দেহ। মাথা-কান ঢেকে রেখেছে পুরানো একটি উলেন টুপি দিয়ে। এই শীতেও মানুষের জীবন থেমে থাকে নি।

ভিক্ষুক ভিক্ষা করছে। হাঁটুরেরা হাঁটছে। জীবনের কোথাও ছন্দপতন নেই। প্রকৃতির ধারা এমনিই। কারুর জন্য কিছু ঠেকে থাকে না। অথচ বড় ভাইদের কমিশনের ভয়ে মীরানের জীবনের ছন্দপতন হয়েছিল। সকালের গতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। ভাবতে গিয়ে দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। কুয়াশার চাদর ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

স্লামুয়ালাইকুম। পেছন থেকে একজন এসে সালাম দিলো।

সালাম শুনে ভয়ংকরভাবে আঁৎকে ওঠে মীরান। থমকে দাঁড়ায়। বড় ভাইদের ছোট ভাই এর পুরনো ঘটনাটি মনে পড়ে যায়। পুরো চিত্রটি ভেসে ওঠে মনের পর্দায়।

সালামের জবাব দেওয়ার সময় পায় নি সে। পাশের লোকটি ব্রিস্ক গতিতে ক্রস করে চলে গেল। চিনতে পারে তাকে। পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি। রাস্তায় দেখা হয়। অথবা কখনো শুক্রবারে মসজিদে দেখা হয়। আর দেখা সাক্ষাৎ ঘটে না। একই বিল্ডিং এ বাস। দেখা হয় বাহিরে। রাস্তাঘাটে।

মীরানের পুরনো ভয় জেগে ওঠে। না। ওই পথে যাওয়া যাবে না। বলা যায় না। ভয়ে সামনে এগোতে পারে না। গতি ঘুরিয়ে উল্টো দিকে হাঁটা দেয়।

জীবন থেমে নেই। বড় ভাইদের আবদারও নিশ্চয় তেমনি থেমে নেই। মনের গহীন কোণে ভয়টি যেন শেকড় গেঁড়ে বসেছে। শেকড় উপড়াতে পারে নি সে।

কারিনার মনেও কি এমনি ভয়ের শেকড় গেঁথে নেই? মোবাইলে মিথ্যা হুমকি দিয়েই যাবে তারা। এ কারণে কারিনাও কি ভয়ে থাকে?

মায়া লাগে নিজের জন্য। মায়া লাগে কারিনার জন্য।

নিরাপত্তাহীনতা নিজেদের মায়ার বাঁধনে একটা শক্ত গিট দিয়ে দিচ্ছে। একই সাথে নিজের আচরণেও বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

সামনে না গিয়ে বাসার দিকে ফিরে আসতে থাকে মীরান।

কিছুদূর আসার পরই থমকে দাঁড়ায়।

ভাইজান, কেমন আছেন। একটি ছোকড়া পাশে এসে দাঁড়ায়।

ভালো আছি। মীরান বললো। হাঁটছে সে।

মনে হয় ভালো নেই আপনি। পাশে হাঁটতে হাঁটতে ছোকরাটি বললো।

আপনি কে? ভয় নিয়েই বললো মীরান।

আমাকে চেনেন না? চিনবেন। কমিশনের টাকাটা ভদ্রভাবে পাঠিয়ে না দিলে চিনতে পাবেন।

সামনে পুলিশ। পুলিশে ধরিয়ে দেবো। পুলিশ দেখে সাহসী হয়ে ওঠে মীরান।

পুলিশ আপনাকে রক্ষা করবে না। এ এলাকায় থাকেন। আপনার পরিবারের সবাইকে আমরা চিনি। আপনার ছেলেমেয়েকেও চিনি। বউকেও চিনি। তো আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে ওদের কী হবে? ওদের কে রক্ষা করবে?

সাহসী মীরান ভয়ে হীম হয়ে যায়। সকালের শীতের চেয়ে ভয়াবহ কনকনে শীত জমে ওঠে বুকের ভেতর। মুখে কথা ফোটে না। হাঁটছে সে। পাশাপাশি ছোকরাটিও।

একটি পুলিশের তাবু ক্রস করে গেল তারা। সামনে চারজন পুলিশ শীতের গাউন পড়ে কথা বলছে। লেকের পাড়ে পুলিশের তাবু। এখানে বিরোধী দলের

নেত্রীর বাসা। নেত্রীর বাসা সুরক্ষার জন্য পুলিশ গার্ড। অথচ হাঁটুতে জনারণ্যের মাঝেও ভয়ংকর লোক ঘুরে বেড়ায়। মীরান সাহস হারিয়ে ফেলে। ছোকরার হাত ধরে।

আমি চাকুরিজীবী। সৎ উপায়ে উপার্জন করি। বহু কষ্টে লোন নিয়ে ফ্ল্যাটটি কিনেছি। আমাকে ছেড়ে দাও।

ছাড় আমি দেবো কেন? বড় ভাইকে বলবেন। উনি ছাড় দেবেন। বড় ভাই মহান লোক। আপনার কথা শুনবেন।

কত দিলে খুশি হবেন বড় ভাই?

সুবোধ বালকের মতো ঝামেলা ছাড়া দিলে আপনার খুশি মতো দিতে পারেন। কূটকৌশল বা চালাকির আশ্রয় নিলে বেশি দিতে হবে। আপনার বৌ-বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে।

ছেলেটির মুখের দিকে তাকায় মীরান। ভদ্র ছেলে মনে হয় না। মুখে রুক্ষতা। চোখ ভেতরে ডাবানো। চুল উসকো খুসকো।

নিজের পকেটে হাত ঢোকায় সে। এক হাজার টাকা নিয়ে বের হয়েছিল। ব্রিজের পাশে বড় কই মাছ বিক্রি হয়। কই মাছ নেওয়ার ইচ্ছে ছিল।

টাকা ছেলেটির হাতে গুঁজে দেয়। ঝামেলা করো না। এটা তোমার বকশিস। বড় ভাইকে বলো আমি নিরীহ। আনন্দে যেন রেহাই দেয়।

ছেলেটি হাতে টাকা গুঁজে নেয়। নিজের গতিতে সামনে হেঁটে যায়। পিছন ফিরে তাকায় না। মুখে বলে, আচ্ছা। বড় ভাইকে বলবো আপনাকে ছাড় দিতে।

মীরান দাঁড়িয়ে ছেলেটির চলে যাওয়া দেখে।

নিজেকে বড্ড দুর্বল মনে হয়। আগে মনে হতো দুঃসাহসী। এখন মনে হয় উন্নত প্রজাতির ভীরু কাপুরুষ সে।

বাসায় এসে শুয়ে থাকে মীরান। এমনটি কখনো ঘটে না। অফিস সময়ের আগেই তৈরি হয়ে যায়। বন্ধের দিনও নিজের ফিটনেসের ঘাটতি নেই। আজ বন্ধের দিন। শুক্রবার। রুনির আবদার রক্ষার দিন। রুনিকে ওয়ান্ডারল্যান্ডে নিয়ে যাবে। কথা দিয়েছিল। সহজে কথা দেয় না। এবার দিয়েছে। কথা রাখতে হবে। জানে সে। ভেতরের তাগিদ আসছে না। ভোরের ঘটনায় মন ভীষণ খারাপ। এই খারাপ ঘটনা কাউকে বলা যাচ্ছে না। মনও ভালো হচ্ছে না।

কারিনা রান্না ঘরে। রূপক নিজের ঘরে। রুনি উঠেছে ঘুম থেকে। টিভির সামনে বসেছে। এখনো টিভির সামনে। ওয়ান্ডারল্যান্ডের কথা নিশ্চয় ভুলে গেছে। মীরান স্বস্তিতে শুয়ে থাকে। রাতে ভালো ঘুম হয় নি। ঘুমুতে ইচ্ছে করছে।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাচ্ছে। লেপ টেনে শুয়ে থাকে মীরান।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

আচমকা হৈ চৈ শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। রুনি পুরোপুরি রেডি। কারিনাও রেডি। রূপক যাবে না। রুনি রেডি হয়ে এসেছে। মীরানের কাছে গিয়ে বলে, ওঠো আব্বু। আজ ওয়ান্ডারল্যান্ডের দিন। ভুলে গেছ?

মীরান লেপ সরিয়ে নেয়। ওঠার চেষ্টা করে। উঠতে পারছে না। চোখে ঘুম। মনে নিরাসক্ত অনুভূতি। আগ্রহ নেই। জোর নেই। ভেতর থেকে যাওয়ার আনন্দ নেই। মোচড় দিয়ে উঠে শুয়ে থাকে।

আব্বু। ওঠো। তোমার নাস্তা রেডি। নাস্তা খেয়ে বের হবো। ওয়ান্ডারল্যান্ড যাবো।

আম্মু। শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ না গেলে হবে না?

রুনি চিৎকার দিয়ে ওঠে। বলেছিলাম না, তুমি কখনো আমাকে সময় দাও না। কথা দিয়ে কথা রাখো না।

কথা দিয়েছি। কথা রাখবো। আজ অসুস্থ লাগছে। অসুস্থ অবস্থায় বেড়ানোর মজা নেই।

ওঠো আব্বু। তোমার মজার দরকার নেই। আমি মজা করবো। আমার মজা দেখবে তুমি আর আম্মু। ওঠো। তাড়া দেয় রুনি। ছাড় দিতে রাজি নয়।

বিছানা থেকে কষ্টে উঠে বসে মীরান। রুনি পাশে নেমে দাঁড়িয়েছে।

ঝংকার দিয়ে বলে, বলেছিলে আমার আনন্দে 'না' বলবে না। এখন তো বলছো।

মীরান জবাব দেয় না। খাট থেকে নামে সে।

রুনি গোসলের কাপড় নেয় হাতে। কারিনা জোগাড় করে দেয়।

হৈ হৈ করে বাবাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

মেয়ের আনন্দে তার শরিক হওয়া উচিত, বোঝে। তবুও তাগিদ বোধ করছে না। অসহায় লাগছে। নিজেকে ব্যর্থ বাবা মনে হচ্ছে। খুব গভীর মনে মেয়ের আনন্দিত মুখ দেখে। দেখে ভয় পেয়ে যায়। বড় ভাইদের লোকজন বলেছে পরিবারের সবাইকে চেনে তারা। যদি ওদের কখনো বিপদ হয়। ভাবনার সাথে সাথে আতঙ্ক আনুপাতিক হারে বাড়ে। আতংক নিয়ে ফ্রেশ হওয়ার জন্য বাথরুমে ঢোকে।

নাস্তার টেবিলে বসে মোবাইল সেটটি অন করে মীরান। অন করার সাথে সাথে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। কানেক্ট হতে সময় লাগে। ডিজুয়াল মনিটরে

একটা চাকার মতো ঘুরতে থাকে। অল্প সময় পর চাকা থেমে যায়। কানেক্ট হওয়ার আলামত জেগে ওঠে।

মীরান মনোযোগ দিয়ে ঘূর্ণায়মান চাকা দেখছিল। চাকাটি থেমে যাওয়ার সাথে টুং করে একটা শব্দ হয়। মেসেজ এসে ঢুকে।

হাই হ্যাপি। ছোট্ট মেসেজ। মেসেজে প্রেরকের নাম নেই। অজানা নম্বর ভেসে আছে।

কে পাঠাতে পারে মেসেজটি? কর্কশ কণ্ঠের অপরিচিতা নয়তো? লাবণ্য?

না। লাবণ্যের নম্বর এন্ট্রি করা আছে। যেই হোক ভালো মেসেজ দিয়েছে। বাহিরের মেসেজ এসেছে সুখের জন্য। বাহিরের মেসেজে মন সুখী হতে পারে না। সুখের জন্য প্রয়োজন অন্তরের ভেতরের মেসেজ। বাহিরের আরোপিত শব্দটি এ মুহূর্তে মনের গহীনে ঢুকে গেছে। নিজেকে গতিশীল করার জন্য ভেতরে সংকেত পাঠিয়ে দিয়েছে। মন ভালো হয়ে উঠেছে। আশার লক্ষণ। মেয়েকে কথা দিয়েছে। কথা রাখতে পারবে, শক্তি পাচ্ছে। শক্তি নিয়ে ধীরে সুস্থে নাস্তা খাচ্ছে সে।

আব্বু। তাড়াতাড়ি করো। রুনি ধমকে ওঠে।

মীরান তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করে।

আব্বু। কাপড় বদলাও।

মীরান দ্রুত কাপড় বদলানোর জন্য বেডরুমে আসে।

এখনো চা শেষ করে নি। টেবিলে চা দেওয়া হয় নি। বেডরুমে এসে কাপড় চেঞ্জ করছে। কাবিনা চা নিয়ে বেডরুমে আসে। কাপটি সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখে।

মীরান আড় চোখে দেখে কাবিনাকে।

সেজে গুঁজে আছে। রুনির তাড়ায় নিশ্চয় ভালো করে সেজেছে। আজ কিছুতেই ওদের দাবী প্রত্যাখান করা উচিত নয়। আজ দাবী প্রত্যাখাত হলে অনেক কিছু হারাবে। মেয়ের কাছে পচা বাবা হিসেবে শেকড় মজবুত হবে। কাবিনার শান্ত স্বভাবেও সুনামির দানব জেগে উঠতে পারে। সুযোগটি কাজে লাগাতে হবে। ভালো বাবা হিসেবে নিজের স্থান অর্জন করতে হবে। ভাবনাগুলো নিজেকে বেশ গতিশীল করে। বাম হাতে মাঝে মাঝে কাপটি তুলে নিচ্ছে। চুমুক দিচ্ছে। আবার নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য কাজ করছে সে।

পুরোপুরি রেডি এখন।

রুনি ছুটোছুটি করছে। ভাইয়ার রুমে যায়। ভাইয়া যাবে না তুমি?

না।

কঠিনভাবে 'না' উচ্চারণ করে রূপক।

ভয় পায় রুনি। আর কথা বাড়ায় না সে। ছুটে আসে বাবার কাছে। ভাইয়ার কঠিন 'না' মন খারাপ করতে পারে নি। এভাবে 'না' বলা ভাইয়ার স্বভাব। ভাইয়ার স্বভাব পাত্তা দেয় নি রুনি।

মীরান বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

রুনি এসে বলে, আব্বু ভাইয়া যাবে না।

কেন?

জানি না!

ভাইয়া গেলে তুমি খুশি হবে?

হুঁ। রুনি মাথা দোলায়।

ভাইয়া না গেলে মন খারাপ হবে?

হুঁ। আবারো মাথা দোলায় রুনি।

বেশি খারাপ হবে?

না। অল্প খারাপ হবে। বলেই হেসে দেয় রুনি।

মীরান তবুও রূপকের রুমে আসে। রূপক আপন মনে কম্পিউটারে খুটখাট করছে।

রূপক! গম্ভীর স্বরে ডাক দেয় মীরান।

কী। ঠাণ্ডাভাবে জবাব দেয় সে।

তুমি যাবে না?

না।

কেন যাবে না? সবাই যাচ্ছে তুমি যাবে না কেন? গলার স্বরে কিছুটা ধমক ঝরে পড়ে।

যাবো না বাস। যাবো না। চিৎকার করে ওঠে রূপক। হাতে একটা চিপসের প্যাকেট তুলে নেয়। ছুঁড়ে দেয় দেয়ালের দিকে।

রুনি পিছনে হটে আসে। আব্বুর হাত ধরে টেনে বের করে আনে। মীরান একবার ছেলের মুখের দিকে তাকায়। মন খারাপ হয়ে যায় তার। খারাপ মন নিয়ে ওরা ওয়াণ্ডারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে বের হয়।

গাড়িতে মাঝে রুনি। দু'পাশে মা-বাবা। গাড়ি ওয়াণ্ডারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে। কাবিনা বাহিরে তাকিয়ে আছে। দিনের ঝলমলে আলো এখনো ফোটে নি। এখনো শীতের বাতাসের সাথে কুয়াশার মাখামাখি কমে নি।

কারিনার মোবাইল বেজে ওঠে। সেটটি ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর। ভেতর থেকে রিংটোন বাজতে থাকে।

রিংটোনের সাথে সাথে কারিনা নড়ে ওঠে। সেটটি বের করে সামনে তুলে ধরে। মনিটরে ভেসে আছে ডলি-২। ড্রিম করে বুকে শব্দ হয়। চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। কী করবে বুঝতে পারছে না। পাশে স্বামী। পর পরুষের সাথে কথা বলা উচিত নয়। উচিত অনুচিত ভাবারও সময় নেই।

রুনি বলে আম্মু ফোন ধরো।

কারিনা সাথে সাথে ইয়েস বাটনে টিপ দেয়।

হ্যালো! সেই কণ্ঠ ভেসে আসে কানে। নাঈম আহমদের কণ্ঠ।

কারিনা ধতমত খেয়ে জবাব দেয়। কেমন আছিস! আমরা এখন সপরিবারে বেড়াতে যাচ্ছি। পরে কথা বলবো। রাখি। কেমন?

লাইন কেটে যায়। এ যাত্রায় রক্ষা হয়েছে। আচমকা কৌশলের আশ্রয় নেয়। যদিও কোনো সম্পর্ক নেই দু'জনের মাঝে, টেলিফোনে স্বামী পরীক্ষার গোপন কাজে আনন্দ করার জন্য কথা বলেছিল, তবুও নিজেকে অপরাধী লাগছে। অপরাধী মনের তেজ কমে যায়। জেশ কমে যায়। অপরাধী মনে ভালোবাসার দাবী কমে যায়।

কারিনার মনেও নিজের জেরালো দাবীর ছিটে ধস নেমে গেছে। টের পায় সে। রুনিকে জড়িয়ে ধরে, বিকল্প জেশে মায়ার জোয়ার আসে, অনেকটা আরোপিত জোয়ার।

রুনি মায়ের জড়ানো হাত ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে দেয়।

আম্মু! ডিস্টার্ব করো না। ছোট মেয়ের মুখে বড় বড় কথা। ডিস্টার্ব শব্দটা শিখে ফেলেছে। আব্বুকে শব্দটি বেশি ব্যবহার করে। আব্বুর কাছ থেকে শব্দটি শিখেছে। মীরান কথায় কথায় বলে ডিস্টার্ব করো না। সেই শব্দটি মোক্ষম সময়ে বাবাকে ফিরিয়ে দেয়। আজ মাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

কারিনা আরো জমে যায়। আরো গুটিয়ে যায়। মনে মনে সিটিয়ে ছিল। রুনির ধমকে আরো নিষ্প্রাণ হয়ে যায় সে।

মায়ের অপরাধ কি মেয়েকে ক্ষতি করে? মনে মনে শংকিত হয়। অপরাধী মনে মেয়েকে আদর করতে চেয়েছিল। অথচ মেয়ের স্বতঃস্ফূর্ত বাধা থেমে যায় সে, মেয়ের মনে কি মা-র অপরাধের কথা জানান হয়ে গেছে?

গাড়ি হঠাৎ হার্ড ব্রেক কষে।

মীরান চট করে রুনিকে ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। ব্রেক কষার সাথে সাথে রুনি ধাম উড়ে যাচ্ছিল।

একটা ভিক্ষুক হঠাৎ গাড়ির সামনে চলে আসে। রাস্তার ডিভাইডারের ওপর দাঁড়িয়েছিল। সিগনালের হলুদ বাতি জ্বলার সাথে সাথে সামনে এসে দাঁড়ায় ভিক্ষুকটি। হঠাৎ ড্রাইভার ব্রেক কষতে বাধ্য হয়।

ড্রাইভারকে কিছুই বললো না মীরান।

এ অবস্থায় যা করেছে, দক্ষতার সাথেই করেছে। ড্রাইভারের কোনো দোষ নেই। অথচ এ্যাকসিডেন্ট হলে সবাই ড্রাইভারকে দোষ তো।

কারিনা একদম স্তব্ধ হয়ে যায়। নিজেকে দুষতে থাকে। মনে মনে ভাবে নিজের দূষিত মন এই বিপজ্জনক অবস্থার জন্য দায়ী।

সবুজ বাতি জ্বলছে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। রুনি একদম চুপ হয়ে গেছে। মীরান চুপচাপ ছিল। কারিনাও চুপ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সকাল প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। এখনো দিনের আলো দিনের মতো মনে হচ্ছে না। এখনো কেমন ধোঁয়াশা লাগছে চারদিক।

রুনি হঠাৎ বলে, আব্বু ওয়াভারল্যান্ড যেতে ইচ্ছে করছে না।

কেন মা?

জানি না। ভালো লাগছে না।

অন্য কোথাও যাবে?

কোথাও যাবো না। শিক কাবাব নাও। বাসায় গিয়ে ভাইয়াসহ কাবাব খাবো।

এখনো তো শিক কাবাব বানানো শুরু হয় নি। অন্য কিছু নেবে?

না থাক। শিক কাবাব খাবো না।

খুঁজে দেখি। কোথাও পাওয়া যায় কিনা। মীরান বললো।

দেখো। শান্তভাবে জবাব দেয় রুনি।

গাড়ি ঘুরিয়ে দিয়েছে ড্রাইভার। লবঙ্গ কাবাব হাউসের সামনে এসে দাঁড়ায়। না এখনো কাবাব বানানো শুরু হয় নি। স্টার কাবাবও এখনো শুরু করে নি। জানে মীরান। তবুও বললো, চলো স্টার কাবাবে চলো।

গাড়ি স্টার কাবাবের এসে দাঁড়ায়। না। এখানেও কাজ শুরু হয় নি। প্রসেসিং চলছে।

রুনির মন খারাপ হয়ে যায়।

অন্য কিছু খাবে মা? কারিনা বললো।

হেঁতুলের চকলেট নাও।

সামনের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে নেমেছে রুনি। মীরানও নেমেছে। কারিনাও নেমে আসে।

আব্বু তেঁতুলের চকলেট পছন্দ করে । নিজে তেমন পছন্দ করে না ।

তবুও তেঁতুলের চকলেট নিতে বললো ।

আর কিছু নেবে?

না । আর কিছু না ।

তেঁতুলের চকলেট এক প্যাকেট নিয়েছে ।

রঙিন পেন্সিল দেখে, পেন্সিলও নিয়েছে । পেন্সিল দেখে রুনির মন খুশি হয় । রুনিকে খুশি হতে দেখে কারিনার মনও খুশি হয় । মীরানও স্বস্তি পায় । গাড়িতে এসে বসে ওরা ।

বাসার দিকে ফিরে আসছিল গাড়ি ।

হঠাৎ বলে, চলো চিড়িয়াখানায় যাবো ।

আজ রুনির ইচ্ছে পূরণের দিন । রুনি যেখানে বলবে সেখানে যাওয়া ভালো । রুনির ইচ্ছে পূরণের জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নেয় মীরান । কারিনার কোনো কথা নেই । সেও মনে মনে প্রস্তুত । মেয়েকে খুশি করার জন্য আজ কোনো বিতর্ক নেই । দ্বন্দ্ব নেই । শান্ত থাকতে হবে । রেগে যাওয়া চলবে না ।

মীরান বললো, চলো ড্রাইভার । মীরপুর চিড়িয়াখানায় চলো ।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে । সাত মসজিদ রোড দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে । সাতাশ নম্বর দিয়ে ঢুকে পড়ে গাড়ি । এগিয়ে যাচ্ছে । রোদ দেখা যাচ্ছে । কুয়াশা কেটে গেছে । দিন ঝলমল হয়ে উঠছে । রাস্তায়ও জ্যাম নেই । কুয়াশার জটে আটকে সকালের দিনটি এখন জটমুক্ত । বড় ভাইদের হুমকির কথা ভুলে যায় । অফিসের জটিলতার কথা ভুলে যায় । লাবণ্যের কথা ভুলে যায় । কর্কশ স্বরের মেয়েটির কথা ভুলে যায় । এখন মন গাড়িতে । রুনির কাছে । রুনির হাসি মুখের তলে চাপা পড়ে যায় কারিনার সাথে শত দ্বন্দ্ব সংঘাত, সংশয়ের কথা ।

আব্বু । আজ কতক্ষণ থাকবে আমার সাথে?

তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো । মা যতক্ষণ বলে ততোক্ষণ থাকবো ।

তোমার কথা তুমি বলো, মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? মা তো সব সময় আমার কাছে থাকে ।

মেয়ের কথা শুনে কারিনার মুখে হাসি ফোটে । কিছু বলে না সে । মনে মনে ভাবে ঠিকভাবে ধরেছে রুনি ।

তুমি যতক্ষণ চাইবে, ততোক্ষণ থাকবো, কেমন? মীরান বললো ।

রুনি খলখল করে ওঠে । প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে । হাসছে । তালি দিচ্ছে । মা-বাবাকে এভাবে একসাথে কম পেয়েছে সে । এটা তার জন্য স্মরণীয় দিন । আনন্দের দিন ।

কারিনা উজ্জ্বল শাড়ি পরেছে । শাড়িটির উপরের অংশে জ্বলা বাটিক নকশা, নিচের অংশে আছে কেবল ঝিমঝাম চেকস । শাড়িটি সে গিফট পেয়েছিল ম্যারেজডেতে । শাড়িটি মীরানেরও পছন্দ । মীরান এতোক্ষণে পছন্দের শাড়িটির দিকে খেয়াল করে । নিজের বউ অপূর্ব সুন্দরী । অথচ বউ এর সাথে দূরত্ব বাড়ছে । প্রায় রাগ, ঝগড়ার কারণে নিবিড় সান্নিধ্য কমে যাচ্ছে । প্রিয় রঙের শাড়িতে সুন্দরী বউকে দেখে মন ভরে যায়, অন্তরের উচ্ছ্বাস গোপন থাকে । প্রকাশ করে না । প্রকাশ না করলে অনেক ইতিবাচক অনুভূতির অকাল মৃত্যু হয় । জেনেও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে না মীরান ।

বউ এর সাথে এখনো সংলাপ হয় নি । কথা বলার আগ্রহ আছে । আলাপের প্রসঙ্গ খুঁজে পায় না সে । গাড়িতে ওঠার পরই কেমন জমে গিয়েছিল কারিনা । তাই আলাপ শুরু করতে পারে নি । এখন মনে হচ্ছে সহজ আছে ওর মন ।

এ সময় মীরানের ফোন বেজে ওঠে । মীরানের ফোনের মিউজিকটি খুব মজার । রুনির খুব প্রিয় । কল এলে মোরগের ডাক শুরু হয় ।

রুনি তালি দিতে শুরু করে । আব্বু তোমার ফোন ।

পকেট থেকে ফোন বের করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে । কয়েকবার মোরগের ডাক ডেকে ওঠে ।

ভিজুয়্যাল মনিটরে চোখ যায় তার । 'নটি' শব্দটি ভেসে ওঠে । কর্কশ স্বরের সেই নারী কণ্ঠটির নম্বর এভাবে সেভ করেছিল ।

প্রথমে লাইনটি কাটার জন্য রেজেক্ট বাটনে টিপ দিতে যাচ্ছিল । কারিনা আবার কী মনে করে । তৎক্ষণাৎ ইয়েস বাটনে টিপ দেয় ।

হ্যালো, মীরান চৌধুরী বলছি ।

কেমন আছেন? নারী কণ্ঠটির হাসিমাখা প্রশ্ন ।

ভালো আছি ।

একা ভালো । নাকি বউসহ ভালো?

আপনি কে বলেছেন প্লিজ? বুঝতে পেরেও প্রশ্নের উত্তরটি এড়িয়ে প্রশ্ন করে মীরান ।

আমাকে চিনতে চাচ্ছেন না? নাকি চিনতে পারছেন না?

চাচ্ছি না । কারণ সপরিবারে এখন ঘুরতে বেড়িয়েছি ।

ওঃ! ভেরি গুড । বউ প্রেমিক লোক আমার খুব প্রিয় । আপনি এ কারণে আমার প্রিয় । উইশ ইউ গুড লাক । গুড ট্রাভেল ।

লাইন কেটে দেয় অপরিচিত মেয়েটি ।

মোবাইলটি পকেটে ঢুকিয়ে রাখে মীরান। আড়চোখে একবার কারিনাকে দেখে। যদিও নিজের কোনো দোষ নেই। তবুও নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে। কারিনার সহজ সরল মুখটিতে কঠিন অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। ভেবেছিল আলাপ শুরু করবে। শুরু করতে পারলো না সে। দু'জনে আবার ভেতর থেকে শক্ত হয়ে ওঠে। জড়বস্তুর মতো বদলে যেতে থাকে ওদের মনের গতি-প্রকৃতি।

যে যার পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে ঘটনা বিশ্লেষণ করে। খোলামেলা সংলাপ না হলে ঘটনার ভুল বিশ্লেষণ হতে পারে। ভুল বিশ্লেষণ মনে চাপ বাড়িয়ে তোলে।

উৎফুল্ল রুনির বাবা মার মনের গহীনে এখন চাপ বেড়ে গেছে। কেউ কাউকে প্রকাশ করছে না।

রুনি টের পেলো না কঠিন সংঘাত।

গাড়ি এসে চিড়িয়াখানার সামনে দাঁড়ায়। মীরান নেমে টিকেট কাটে। রুনি আব্বুর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মুখে তার উচ্ছ্বাস। কৌতূহল ঝরে পরে।

একত্রে চিড়িয়াখানায় ঢোকে সবাই।

কিছুদূর এগোনোর পর ডান দিকে বানর রাজ্য। বানর কলা খায়। বাদাম খায়। খাবার দেওয়া নিষেধ।

নিষেধ মানে না কেউ। বাদাম ছুঁড়ে দিচ্ছে। ছোটরা বানরের কান্ড দেখে মজা পাচ্ছে। রুনিরও ইচ্ছে বাদাম ছুঁড়ে দেবে। বাদাম ভেতরে বিক্রি হয় না। বাহির থেকে কিনে আনতে হয়। কিনে আনা হয় নি।

রুনি গোঁ ধরে। বাদাম খাওয়াবেই সে।

মা-মণি। বানরকে বাদাম ছুঁড়ে দেওয়া নিষেধ। নিষেধ আমাদের মানা উচিত। মীরান বললো।

সব ছোটরা তো বাদাম ছুঁড়ে দিচ্ছে। রুনির স্বরে জেদ।

তারা ভুল করছে। একজনের ভুল আর একজন কি করা উচিত?

বানর তো বাদাম খাচ্ছে। কুটকুট করে খাচ্ছে। মজা লাগছে দেখতে। ভুল কেন হবে আব্বু?

মেয়েকে বোঝানো যাবে না, জানে মীরান।

ঠিক আছে। তোমরা এই গাছ তলে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি বাহিরে গিয়ে বাদাম নিয়ে আসি।

রুনি ভয় পায়। আব্বু ছাড়া অপরিচিত জায়গায় নিজেকে নিরাপদ ভাবে না। রুনি বললো, সবাই যায়।

আচ্ছা এসো। গেইটের বাহিরে যাওয়ার দরকার নেই। গেইটের ভেতরে থাকবে তোমরা।

সবাই গেইটের দিকে হাঁটা দেয়। দক্ষিণ পাশে বড় সোহার গেইট। ওই গেইটের কাছে এসে দাঁড়ায় রুনি এবং কারিনা। ওই গেইট দিয়ে কাউকে বের হতে দেয় না। মীরানের বিশেষ অনুরোধে ওরা রাজি হয়। বাহিরে এসে কলা নেয়, বাদাম নেয়। ফিরে আসছিল সে। রুনি গেইটের ফাঁক দিয়ে বাবাকে দেখছে। কারিনাও তাকিয়ে আছে বাহিরের দিকে।

এ সময় একটি গাড়ি এসে ঠিক মীরানের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়।

মীরান মাথা ঘুরিয়ে দেখে গাড়ি থেকে নামছে ওর চেয়ারম্যান সাহেবের ওয়াইফ। সাথে বাচ্চারা। এক ছেলে দুই মেয়ে। আর একজন মহিলা আছে।

ম্যাডাম এগিয়ে আসে। কি মীরান সাহেব, একা চিড়িয়াখানায় কি করছেন? একা না ম্যাডাম। ভেতরে বউ বাচ্চা আছে।

ওঃ। ভালো। বউ বাচ্চাকে সময় দেওয়া ভালো। আপনার স্যার তো বাচ্চাদের সময় দেয় না। কী আর করা। ওদের অগ্রহ পূরণের জন্য আমিই নিয়ে এলাম। অপরিচিত মহিলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে এ আমার ছোট বোন। উভয়ে হাসি বিনিময় করে।

মীরান বুঝতে পারে গেইটের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে কারিনা। বেশিক্ষণ ওদের একা দাঁড় করিয়ে রাখলে ক্ষেপে যাবে। দ্রুত যাওয়া উচিত। যেতে পারছে না। চেয়ারম্যান সাহেবের ওয়াইফ বলে কথা। হেলপ করা উচিত। টিকেট কেটে ভেতরে যাওয়ার সহজ ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। উচিত অনুচিত মাথায় ঢুকছে। কিছুই করতে পারছে না।

সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায় মীরান।

মীরান সাহেব। আমরা কী আপনার সাথে আসবো। চেয়ারম্যান সাহেবের ওয়াইফ প্রস্তাব দিলেন।

জ্বি ম্যাডাম। আসেন। ওইপাশে লাইন দিয়ে টিকেট কাটতে হবে।

লম্বা লাইন। সারি বেঁধে মানুষ ঢুকছে। কঠিন কিছু না। মূল কাজ হচ্ছে ধৈর্য ধরে লাইন ধরে হেঁটে যাওয়া।

ভিআইপিরা লাইন মানতে চায় না। সহজ সুযোগ নিতে চায়। চেয়ারম্যান সাহেবের ওয়াইফও সুযোগ নেওয়ার পথ খুঁজছেন।

রুনি দূর থেকে আব্বুকে দেখছে। হাতের ইশারায় ডাকছে বাপিকে। মীরান দেখতে পায় রুনির ইশারা।

আপনারা একজন লাইনে দাঁড়ান। আমি ভেতরে বাচ্চাকে এগুলো দিয়ে আসি।

ঠিক আছে আপনি যান। আপনাকে আটকিয়ে রাখা ঠিক নয়। আমরা টিকেট কেটে ঢুকে যেতে পারবো। চেয়ারম্যান সাহেবের ওয়াইফ মত পাল্টালেন।

আমি আসছি ম্যাডাম।

না, না। আসার দরকার নেই। আমরা ম্যানেজ করে নিতে পারবো। বলতে বলতে লাইনে দাঁড়ান ওরা সবাই।

মীরান এগিয়ে যায়। মন খচখচ করতে থাকে। ম্যাডামকে উপকার করা উচিত ছিল। ওইদিকে কারিনা রুনি। ওদেরও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে রাখা ঠিক নয়। ফিরে এসে রুনির হাতে বাদামের প্যাকেট দেয়। নিজের কাছে রাখে এক প্যাকেট।

আব্বু। এতো দেরি করলে কেন?

উটকো ঝামেলায় পড়েছিলাম।

উটকো ঝামেলা কী? তুমি তো কয়েকজনের সাথে কথা বলছিলে।

আমার বসের ওয়াইফ এসেছে বাচ্চাদের নিয়ে। টিকেট কাটার পথ দেখিয়ে দিয়েছি মাত্র।

তুমি তো কথা বলছিলে। পথ দেখাও নি তো। রুনির দ্রুত জবাব।

কথা বলতে বলতে বুঝিয়ে দিয়েছি কী করতে হবে। মীরান মেয়ের প্রশ্ন থেকে রেহাই পেতে চায়।

আজকে তো আমার দিন। আমাকে সময় দেবার দিন। অন্যের সাথে কথা বললে কেন?

কথা বলতে চাই নি। তবুও কথা বলতে বাধ্য হয়েছি।

বাধ্য মানে কি?

রুনির প্রশ্ন থামানো যাচ্ছে না। থামানোর জন্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না কারিনা।

গোপনে কি কারিনা মেয়ের মন উসকে দিয়েছে? এতো ক্ষ্যাপাটে হয়ে আছে কেন ওর মুখ? ভাবতে গিয়ে সেও শক্ত হয়ে ওঠে।

চলো। সামনে চলো। বানরকে বাদাম খাওয়াবো।

রুনির প্রশ্ন থেমে যায়। বানরকে বাদাম খাওয়ানোর আনন্দ সে হাতছাড়া করতে চায় না। বাদামের খোসা খুলে কী সুন্দর করে বাদাম খায় বানরের দল। তিং তিং করে লাফিয়ে খাঁচার এ মাথা থেকে ওই মাথাতে ছোটাছুটি করে। ফ্লোর থেকে মুহূর্তে ছাদের দিকে উঠে যায়। রডের সাথে ঝুলে পড়ে। দ্রুত গতিতে করে সব কাজ।

আব্বু? বানরগুলোকে বন্দি করে রেখেছে কেন?

বন্দি না করলে ওগুলো পালিয়ে যাবে।

পালিয়ে কোথায় যাবে? বাইরে তো গেইট আছে।

এক জায়গায় রাখার জন্য খাঁচায় বন্দি করা। আরো অনেক পশুপাখি আছে। চলো ধীরে ধীরে সব দেখবে।

এক জায়গায় আটকানোর দরকার কি? ওদের ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে না? করে। ইচ্ছে করবে না কেন? এদিক ওদিক চলে গেলে তোমাদের কেমনে কিভাবে?

আমাদের দেখানোর জন্য কি ওদের বন্দি করে রাখে?

হ্যাঁ। ছোট বাবুদের দেখানোর জন্য বন্দি করে রাখে।

চট করে মন খারাপ হয়ে যায় রুনির। না। আব্বু আমি আর পশুপাখি দেখবো না। ওদের ছেড়ে দিতে বলো। ওদের বন্দি করে কষ্ট দেবে কেন? বলো। ছেড়ে দিতে বলো। রুনি জেদ ধরে। চলো। বাসায় ফিরে চলো।

কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলের ইটনা উপজেলার এলংজুরী ইউনিয়নের বিচ্ছিন্ন একটি গ্রাম 'ভাটি কাক টেঙুর'। বংশগতভাবে এ গ্রামের অধিকাংশ মানুষের পেশা চুরি। এ কারণে গ্রামের নামটি পরিচিত হয়ে এসেছে 'চোরের গ্রাম' নামে। চোরেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করেছে ইউনুছ বাহিনী ও জাকির বাহিনী সমিতি। এই প্রেক্ষিতে এলাকাবাসীরা প্রতিকারের জন্য প্রধানমন্ত্রী বরাবর আবেদন করেছেন। আবেদনে দুর্ধর্ষ বংশগত অপরাধী চোর সমিতি চক্রকে নির্মূলের পাশাপাশি সৎ জীবনযাপন করতে আগ্রহীদের পুনর্বাসনের আহ্বান জানানো হয়।

নিজ অফিস রুমে বসে নিউজটি পড়ে মীরান চৌধুরী।

কোথাও চলে প্রকাশ্যে চুরি। কোথাও চলে অপ্রকাশ্য গোপন চুরি। লাবণ্যের বন্ধুর চাকরির জন্য তার বিশ্বস্ত কেউ টাকা চেয়েছে। নিজের কাছে গোপন হলেও লাবণ্যের বন্ধুর কাছে বিষয়টি প্রকাশ্য। এটি চুরি নয়। ডাকাতি। প্রকাশ্যে ডাকাতি। বংশগত জীনের কোনো প্রভাব থাকতে পারে চোরের মনে। এই চুরির জন্য নিজে অপরাধী না হয়েও অপরাধী। চোর ধরা উচিত। কীভাবে ধরবে ভেবে পাচ্ছে না। চোর ধরতে পারলে সংশোধনের কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না। পুনর্বাসনের প্রশ্নই আসে না।

লাবণ্যকে ফোন করা দরকার। পরবর্তী পরিস্থিতি বোঝা দরকার। কারণ আগামীকাল ইন্টারভিউ।

ইন্টারভিউ বোর্ডের প্রধান সে। চেয়ারম্যান সাহেবের লিস্ট আছে। লিস্ট থাকলেও লোক নিয়োগের স্বাধীনতা আছে তার।

লাবণ্যের নম্বরটি বের করে সে। ইয়েস বাটনে টিপ দিয়ে মোবাইল কানেক্ট করার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় দফায় লাইন কানেক্ট হয়।

কেমন আছেন? লাবণ্যের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস নেই। শান্ত সে।

তুমি কেমন আছ? আর তো ফোন করলে না।

ফোন করার ইচ্ছে হয়েছিল। করি নি।

কেন? ইচ্ছে আটকে রেখেছিল কেন?

লাবণ্য জবাব দেয় না। পাশ কাটিয়ে যায় সে।

লাবণ্যকে পাশ কাটাতে দেওয়া যাবে না। বিস্তারিত জানতে হবে। নরম করে কথা বলতে হবে। কথা বলে কথা বের করতে হবে। ভাবে মীরান।

আগামীকাল ইন্টারভিউ তোমার বন্ধুর চাকরির কথা বলছিলে।

জ্বি। বলেছিলাম। ও বোধ হয় ভেঙে পড়েছে। টাকা জোগাড় করার সামর্থ্য নেই।

তোমাকে তো বলেছি, টাকা লাগবে না। তাছাড়া টাকার কথা বিশ্বাস করি না আমি।

লাবণ্য চুপ থাকে। কথা বলতে চাচ্ছে না। কথা বাড়াতে চাচ্ছে না।

চুপ করে আছো কেন? কথাটিকে বিশ্বাস হয় নি?

হয়েছে। শান্তভাবে বলে লাবণ্য।

তোমার বন্ধুকে বলো ওর চাকরি হবে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো আমি। ও যেন কাউকে টাকা না দেয়। টাকা দেওয়ার দরকার নেই।

আচ্ছা বলবো।

একটা উপকার করবে আমার?

কী উপকার?

আমার সব স্টাফরা খুব সৎ। আমাকে বিকিয়ে বা আমার নাম ভেঙে ওরা অবৈধভাবে টাকা আয় করবে, বিশ্বাস হয় না।

তাহলে আমাদের অভিযোগ কি মিথ্যা?

না মিথ্যা বলছিল না। নিশ্চয় তৃতীয় কোনো ব্যক্তি কাজ করছে। গোপনে আমাদের নাম ভাঙাচ্ছে। আমাকে কি নামটা বের করে দিতে পারবে?

কার নাম?

যে আমার নাম করে টাকা চেয়েছে তার নাম।

দেখি, ওর সাথে কথা বলে বলবো।

শোনো। ওকে এনশিরও করবে। ওর চাকরি হবে। ভেঙে পরার কিছু নেই।

আচ্ছা।

মন ভালো হয় নি এখনও?

হয়েছে।

মুখে বললে হয়েছে, অভিব্যক্তিতে তার প্রমাণ নেই। কীভাবে বুঝবো যে, তোমার মন ভালো হয়েছে?

মন ভালো হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি। আপনাকে বোঝাতে পারছি না।

ছেলেটি তোমার কে হয়?

বলেছি তো বন্ধু। মনে নেই আপনার?

ও। মনে পড়েছে। বলেছিলে।

প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন কি মনে করে?

না। এমনিতে প্রশ্ন করলাম।

আপনি বাজে লোক। এমনিতে প্রশ্ন করেন নি। প্রশ্নের পেছনের উদ্দেশ্যটা কী?

কোনো উদ্দেশ্য নেই। সত্যি বলছি। কথা প্রসঙ্গে কথা এসেছে। উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করি নি।

বিশ্বাস করলাম না।

প্লিজ। বিশ্বাস করো। অনুরোধ করছি বিশ্বাস করার জন্য।

আচ্ছা বিশ্বাস করলাম।

খুশি হলাম। ধন্যবাদ তোমাকে।

ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার নেই। আপনার হাতে আমাদের কাজ। আমরা আপনাকে ধন্যবাদ দেবো চাকরি হলে।

ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার নেই।

শুনুন। ছেলেটি আমাদের এলাকায় থাকে। ওর বাবার স্ট্রোক করেছে। প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। সংসারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিল ওদের বাবা। ওর একটা বোন আছে। বোনটি আমার বান্ধবী। ছেলেটি স্রেফ আমার এলাকার। বিপদে মানবিক উদ্যোগ আমরা পদক্ষেপ নিয়েছিলাম পাড়ার ছেলেমেয়েরা। আমাদের একটি সংগঠন আছে। সাংস্কৃতিক সংগঠন। ছেলেটি ওই সংগঠনের সক্রিয় কর্মী। ভালো গান গায়। ওর চাকরিটা জরুরী। বুঝেছেন?

বুঝেছি। শান্ত কণ্ঠে বললো মীরান।

মনে আর কোনো সন্দেহ লুকিয়ে নেই তো? প্রশ্নটি করে খলখল করে হেসে ওঠে লাবণ্য।

অরিজিনাল লাবণ্যের স্বর কানে এসে বিঁধে। শেষ কথায় তাকে আক্রমণের ইঙ্গিত আছে। আক্রমণ হিসেবে ভাবছে না সে। তবুও জিজ্ঞাসা করে,

মনে আর কোনো সন্দেহের প্রশ্ন এলো কেন?

স্বভাবজ প্রবৃত্তি থেকে প্রশ্নটি এসেছে। কারণ পুরুষ মাত্রই নারীকে সন্দেহের চোখে দেখে?

নারীরা পুরুষকে অযাচিত সন্দেহ করে না?

হাঁ করে। কম।

তুমিই তো আমাকে সন্দেহ করে ফেলেছিলে? এক লাখ টাকা চাইতে পারি, এমন কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলে।

এখানে তো সন্দেহের ব্যাপার নেই। বিশ্বাসের ব্যাপার আছে। বিশ্বাস করেছিলাম আপনি টাকা চেয়েছেন।

প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাসই তো সন্দেহ।

প্রমাণ কি নেই?

না। নেই। তোমাদের তৈরি প্রমাণের পেছনে ষড়যন্ত্র আছে। গোপন চুক্তির ব্যাপার আছে। পুরো পরিস্থিতি ভেবে দেখতে পারো নি তোমরা। সুতরাং এটি প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস। ভুল মানুষকে ভুলভাবে দায়ী করেছ। অবিচার করেছ। তোমাদের আমি অবিবেচক ভাবতে পারি।

ঠিক আছে বিবেচক সাহেব। কান টানলাম। আর অবিবেচক ভাববেন না।

কান টানলে তো সব শেষ হবে না।

কীভাবে শেষ হবে?

আমার ভালো যদি চাও, সুযোগ সন্ধানীর নামটি আমার কাছে তুলে ধরতে হবে। তুলে ধরলে আমার কল্যাণ হবে। আমার কল্যাণ নিশ্চয় চাইবে?

আপনি খুব চালাক লোক। বুদ্ধিমান চালাক। চালাকির জন্য বুদ্ধির দরকার। আপনার বুদ্ধির হাড়ি টইটুম্বুর। চালাকি করে নামটি বের করার চেষ্টা করছেন। চালাকির দরকার নেই। নাম পেলে আমি অবশ্যই আপনাকে জানাবো। ঠিক আছে?

হেসে ওঠে মীরান। লাবণ্যও হাসে। মধুর সুরের ঝংকার কানে আবার আঘাত হানে। লাইন কেটে দেয় উভয়ে।

চোর ধরা সহজ হবে। ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে মীরান। যদি ইব্রাহিম সাহেব সেই চোর হন। তাকে কি সংশোধনের সুযোগ দেওয়া উচিত হবে?

প্রশ্নটি মাথায় আসার সাথে সাথে টেনশন বেড়ে যায় আবার। লাবণ্যের সাথে সংলাপের পর মন প্রসন্ন হয়েছিল। প্রসন্ন মনে আবার ঢুকে শংকা। আবার চাপ। আবার মনের কোণে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। 'ভাটি কাক চৈতুর' গ্রামের কথা আবার মনে পড়ে। চোরের গ্রাম। বংশগত চোর ওরা। এই অফিসটা তো তাহলে ডাকাতের অফিস। বংশগত ডাকাত কে সেটা ইব্রাহিম সাহেব তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সর্বত্র চোর ডাকাতের খেলা। কে কাকে ঠেকাবে কে কাকে ধরবে জানে না সে।

মন ভালো হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি। আপনাকে বোঝাতে পারছি না।

ছেলেটি তোমার কে হয়?

বলেছি তো বন্ধু। মনে নেই আপনার?

ওঃ। মনে পড়েছে। বলেছিলে।

প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন কি মনে করে?

না। এমনিতে প্রশ্ন করলাম।

আপনি ঝানু লোক। এমনিতে প্রশ্ন করেন নি। প্রশ্নের পেছনের উদ্দেশ্যটা কী?

কোনো উদ্দেশ্য নেই। সত্যি বলছি। কথা প্রসঙ্গে কথা এসেছে। উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করি নি।

বিশ্বাস করলাম না।

প্লিজ। বিশ্বাস করো। অনুরোধ করছি বিশ্বাস করার জন্য।

আচ্ছা বিশ্বাস করলাম।

খুশি হলাম। ধন্যবাদ তোমাকে।

ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার নেই। আপনার হাতে আমাদের কাজ। আমরা আপনাকে ধন্যবাদ নেবো চাকরি হলে।

ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার নেই।

শুনুন। ছেলেটি আমাদের এলাকায় থাকে। ওর বাবার স্ট্রোক করেছে। প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। সংসারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিল ওদের বাবা। ওর একটা বোন আছে। বোনটি আমার বান্ধবী। ছেলেটি স্রেফ আমার এলাকার। বিপদে মানবিক উদ্যোগ আমরা পদক্ষেপ নিয়েছিলাম পাড়ার ছেলেমেয়েরা। আমাদের একটি সংগঠন আছে। সাংস্কৃতিক সংগঠন। ছেলেটি ওই সংগঠনের সক্রিয় কর্মী। ভালো গান গায়। ওর চাকরিটা জরুরী। বুঝেছেন?

বুঝেছি। শান্ত কণ্ঠে বললো মীরান।

মনে আর কোনো সন্দেহ লুকিয়ে নেই তো? প্রশ্নটি করে খলবল করে হেসে ওঠে লাবণ্য।

অরিজিনাল লাবণ্যের স্বর কানে এসে বিঁধে। শেষ কথায় তাকে আক্রমণের ইঙ্গিত আছে। আক্রমণ হিসেবে ভাবছে না সে। তবুও জিজ্ঞাসা করে,

মনে আর কোনো সন্দেহের প্রশ্ন এলো কেন?

সহজাত প্রবৃত্তি থেকে প্রশ্নটি এসেছে। কারণ পুরুষ মাত্রই নারীকে সন্দেহের চোখে দেখে।

নারীরা পুরুষকে অযাচিত সন্দেহ করে না?

হ্যাঁ করে। কম।

তুমিই তো আমাকে সন্দেহ করে ফেলেছিলে। এক লাখ টাকা চাইতে পারি, এমন কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিল।

এখানে তো সন্দেহের ব্যাপার নেই। বিশ্বাসের ব্যাপার আছে। বিশ্বাস করেছিলাম আপনি টাকা চেয়েছেন।

গ্রাউন্ড ছাড়া বিশ্বাসই তো সন্দেহ।

গ্রাউন্ড কি নেই?

না। নেই। তোমাদের তৈরি গ্রাউন্ডের পেছনে ষড়যন্ত্র আছে। গোপন দুরভিসন্ধির ব্যাপার আছে। পুরো পরিস্থিতি ভেবে দেখতে পারো নি তোমরা। সুতরাং এটি গ্রাউন্ড ছাড়া বিশ্বাস। ভুল মানুষকে ভুলভাবে দায়ী করেছ। অবিচার করেছ। তোমাদের আমি অবিবেচক ভাবতে পারি।

ঠিক আছে বিবেচক সাহেব। কান টানলাম। আর অবিবেচক ভাববো না।

কান টানলে তো সব শেষ হবে না?

কীভাবে শেষ হবে?

আমার ভালো যদি চাও, সুযোগ সন্ধানীর নামটি আমার কাছে তুলে ধরতে হবে। তুলে ধরলে আমার কল্যাণ হবে। আমার কল্যাণ নিশ্চয় চাইবে?

আপনি খুব চালাক লোক। বুদ্ধিমান চালাক। চালাকির জন্য বুদ্ধির দরকার। আপনার বুদ্ধির হাড়ি টইটুম্বুর। চালাকি করে নামটি বের করার চেষ্টা করছেন। চালাকির দরকার নেই। নাম পেলে আমি অবশ্যই আপনাকে জানাবো। ঠিক আছে?

হেসে ওঠে মীরান। লাবণ্যও হাসে। মধুর সুরের ঝংকার কানে আবার আঘাত হানে। লাইন কেটে দেয় উভয়ে।

চোর ধরা সহজ হবে। ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে মীরান। যদি ইব্রাহিম সাহেব সেই চোর হন। তাকে কি সংশোধনের সুযোগ দেওয়া উচিত হবে?

প্রশ্নটি মাথায় আসার সাথে সাথে টেনশন বেড়ে যায় আবার। লাবণ্যের সাথে সংলাপের পর মন প্রসন্ন হয়েছিল। প্রসন্ন মনে আবার ঢুকে শংকা। আবার চাপ। আবার মনের কোণে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। "ভাটি কাক টেঙ্গুর" গ্রামের কথা আবার মনে পড়ে। চোরের গ্রাম। বংশগত চোর ওরা। এই অফিসটি তো তাহলে ডাকাতের অফিস। বংশগত ডাকাত কে সে? ইব্রাহিম সাহেব? তৃতীয় কোনো ব্যক্তি? সর্বত্র চোর ডাকাতের খেলা। কে কাকে ঠেকাবে? কে কাকে ধরবে? জানে না সে।

ইদানিং রূপক ঠিক সময়ে বাসায় ফিরছে না। কারিনার চিন্তা বাড়ে। চিন্তা বাড়লেও কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না। কারিনার কথা শোনে না রূপক।

বাসার কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ নেই। আগ্রহ বাহিরের কাজে। খেলায়। আড্ডায়। এতো ছোট ছেলের মানসিকতায় কুঁকড়ে থাকে কারিনার মন।

দু'দিন টিচার এসে ফিরে গেছে। আজ আসবে সন্ধ্যা সাতটায়। টাইম পিছিয়ে দিয়েছে। টাইম পেছানো হলেও রূপকের ফেরার টাইম পিছাচ্ছে।

ঘরের প্রতি মায়া কমে যাচ্ছে। টান কমে যাচ্ছে। স্পষ্ট বুঝতে পারে কারিনা। বুঝলেও কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না। স্বামীর সাথে খোলামেলা আলাপ করা যাচ্ছে না। স্বামীও বাসায় দেরিতে ফেরে। স্বামীর দেরি ওর মন বিষিয়ে দিয়েছে। সন্তানের বিলম্ব বিষাক্ত মনে আরো গাঢ় বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

নিজের বলে কিছু থাকলো না। নিজের সময় বলে কিছু থাকলো না। নিজের আনন্দ বলে কিছু থাকলো না। সবাইকে ঘিরে নিজের বলয় তৈরি করতে চেয়েছিল। বৃত্ত তৈরি করতে চেয়েছিল। চাওয়া পূর্ণ হলো না। অপূর্ণ চাওয়ার ফাঁকফোকর দিয়ে কেটে যাচ্ছে দিন। কেটে যাচ্ছে সময়। বৃত্তের পরিধিতে ফাটল তৈরি হয় নি। হবে মনে হচ্ছে। আত্মবিশ্বাসের কাছে নিজেই ধসে যাচ্ছে কারিনা।

টিভির সামনে বসেছিল কারিনা। নতুন চ্যানেল শুরু হয়েছে। আরটিভি। টিভির সামনে বসে থাকলেও মন নেই টিভির পর্দায়। নানান দিকে ভেসে বেড়াচ্ছে মন। রুনি সোফার ওপর ঘুমিয়ে আছে।

এ সময় কলিংবেলের শব্দ হয়। এখনো পাঁচটা বাজে নি।

কীহোলে চোখ রেখে দেখে রূপক দাঁড়িয়ে আছে।

দ্রুত দরজা খুলে দেয় কারিনা। রূপকের মাথা নিচু। মুখ ফুলে আছে। বাম পাশের চোখের নিচে কালো হয়ে গেছে। ফুলে আছে বাম চোখ। ছেলের থুতনিতে হাত রেখে মুখ উঁচু করে ধরে কারিনা। অন্য সময় হলে ঝট করে হাত সরিয়ে নিতো। এখন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। উহ্। আহ্! শব্দ করলো না রূপক।

কোনো প্রশ্ন না করে দ্রুত ছেলেকে বাথরুমের দিকে নিয়ে যায়। হাত পা ধুয়ে

দেয়া। বেডরুমে নিয়ে আসে। ঠান্ডা পানিতে টাওয়াল ভিজিয়ে চোখের ওপর হালকা চাপে ধরে রাখে।

রূপক স্বাভাবিক কথা বলছে, পানি দাও। পানি খাবো।

কারিনা দ্রুত বিছানা থেকে ওঠে। এক গ্লাস পানি নিয়ে রূপকের কাছে দাঁড়ায়। রূপক উঠে বসে। হাতে গ্লাস নেয়। একবারে গ্লাসের পানি শেষ করে। আবার শোয়। ভেজা টাওয়ালের আলতো চাপ ভালো লাগছে। চোখ বন্ধ করে থাকে সে।

কী হয়েছে বাবা? ঠান্ডা মাথায় প্রশ্ন করে কারিনা।

কিছু হয় নি।

কিছু হয় নি মানে? মনে হয় কেউ মেরেছে তোমাকে?

কেউ মারে নি।

কীভাবে এ অবস্থা হলো?

ক্রিকেট খেলতে গিয়ে এমন হয়েছে। বল এসে আঘাত করেছে। মিথ্যা বললো রূপক। সহজ মিথ্যা ধরতে পারলো না কারিনা। ছেলের স্বাভাবিক কথা অবিশ্বাসের কিছু নেই।

তোমার আব্বুকে খবর দেই? হসপিটাল নিয়ে যাবে?

না। দরকার নেই। টাওয়াল দিয়ে ঠান্ডা দাও। ভালো লাগছে।

ব্যথা করছে না?

না। ব্যথা করছে না। তুমি যাও। আমি একা থাকি। ঘুমাবো।

তোমার টিচারকে আজ আসতে না করে দেই।

দাও। রূপকের আবারো ঠান্ডা স্বর।

টিচারকে ফোন করে কারিনা। আজ আসতে নিষেধ করে।

টিচার কিছু বুঝতে পারে না। কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে লাইন কেটে দেয়।

রূপক চোখ বুঁজে আছে। ঘুমাবে বলেছে। ঘুম আসছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কারিনা রুম থেকে যাচ্ছে না। চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে।

বুকটা উথাল পাতাল করছে। মীরানকে জানানো দরকার। জানাতে পারছে না। রূপক 'না' করেছে। বাসায় এলে ওকে কী বলবে বুঝতে পারে কারিনা। তবুও জানানোর প্রয়োজন দমিয়ে রাখে সে।

এমন সময় নিজের মোবাইলের রিংটোন শুনে নিজের রুমে ফিরে আসে কারিনা।

ডিসপ্লে মনিটরে ভেসে আছে ডলি-২।

বুকে কাঁপন ধরে যায় কারিনার। আড্ডায় মজার খেলায় নামতে গিয়ে কোথায় নেমে যাচ্ছে সে বুঝতে পারে না। চায় না সে ফোন করতে। ফোন আসুক সেটাও চায় না। অথচ কথা বলতে ইচ্ছে হয়। ভালো লাগে কথা বলতে। মনে মনে নাঈম আহমেদের টেলিফোন কামনা করেছিল। টেলিফোন এসেছে। কামনা পূরণ হয়েছে। গোপন কামনা পূরণ হওয়াতে গোপন ভয় তৈরি হচ্ছে। এই ভয়ে অভ্যস্ত নয় কারিনা।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে ফোন ধরে সে।

কেমন আছেন অপরিচিতা? নাঈম হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে।

ভালো নেই।

ভালো নেই, না ভয়ে আছেন? গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে ভয়ে আছেন। কথা বলা কি যাচ্ছে না?

কথা বলা যাচ্ছে। ভয় তো আছে। মন ভালো নেই। সত্যি বলছি?

ওঃ। কোনো উপকার করতে পারি?

হ্যাঁ পারেন। বুদ্ধি দিতে পারেন।

সমস্যা বলুন, দেখি সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

কারিনা রূপকের ঘটনা খুলে বলে।

নাঈম বললো, আমার মনে হয় ওকে হাসপাতালে নেওয়া উচিত।

ও তো রাজি হচ্ছে না। রাজি না করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ক্ষেপে যাবে।

তবুও ভাবতে হবে। চোখের ব্যাপার। অবহেলা করা উচিত নয়। নাঈম আবারো জোরালোভাবে বললো কথাটি। বন্ধুর মতো এগিয়ে এলো।

কারিনা একা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। নাঈমের সাপোর্ট পেয়ে বিপদের সময় মনোবল বাড়ে।

নাঈম বললো, ওর বাবাকে ফোন করুন। জানানো উচিত। দূরে থাকলে আমাকে বলুন। ঠিকানা দিন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। হাসপাতালে নিয়ে যাবো।

না। আপনাকে ঠিকানা দেওয়া যাবে না।

কেন? আমি কি ডাকাত নাকি?

না। তা বলছি না। ফোনের সম্পর্ক ফোনে থাকুক। বাস্তবে দেখা না হওয়া ভালো।

ফোনে কথা বলছি, এটাও তো বাস্তবতা। বাস্তবতা নয়?

তবুও দূরত্ব আছে। দূরত্ব থাকা ভালো।

আমার তো মনে হয় কোনো দূরত্ব নেই। আপনার মুখ তো আমার মুখের সাথে লেগে আছে। টের পাচ্ছেন না?

কী কথার শ্রী! হাসি মুখে বললো কারিনা।

বিশ্রী কিছু বলি নি। যা সত্যি তাই বলেছি। দৃঢ়ভাবে বললো নাঈম।

কথা বলতে বলতে মনের চাপ হালকা হয়। বোঝে কারিনা।

আজ আর কথা বলবো না। রাখি।

আচ্ছা। আবার খোঁজ নেবো। নেওয়ার অধিকার পেলাম তো? নাঈম বিনয় করলো। কারিনা জবাব দেয় না। কেবল হাসি দেয়। হাসি মুখ রেখে লাইন কেটে দেয়।

লাইন কেটে রূপকের রুমে আসে। রূপক ঘুমায় নি। নড়াচড়া করছে। তবে কি ব্যথা করছে?

আব্বু। কেমন লাগছে? ছেলের সামনে এসে প্রশ্ন করে মা।

রূপক কথা বলে না। ব্যথা করছে। ব্যথার কথা মাকে বলতে পারছে না। ব্যথা অসহ্য নয়। সহ্যের মধ্যে আছে।

টাওয়াল আবার ভিজিয়ে দাও। শান্তভাবে বললো রূপক।

টাওয়াল নিয়ে বাথরুমে যায় কারিনা। ভিজিয়ে ফিরে আসে। রূপক ডান কাত হয়ে শুয়েছে এবার। বা চোখে আবার টাওয়ালটি বসিয়ে দেয় কারিনা।

শান্তি লাগছে। ঘুমিয়ে যাচ্ছে।

খাবে না? মা প্রশ্ন করে।

খেতে ইচ্ছা করছে না। ঘুমিয়ে নেই। ঘুম থেকে উঠে খাবো।

আজকাল বাসায় ফিরতে দেরি করে মীরান। অফিসের কাজে চাপ আছে। দেরিতে অফিস থেকে বের হয় সে। বাসা টানে না। কারিনার শীতল ব্যবহার ভালো লাগে না। রুক্ষ ব্যবহার অসহ্য লাগে। নিজের ক্রোধও আটকে থাকে না। রূপকের ব্যবহারও মনে অসহ্য বেদনার ছোপ বসিয়ে দেয়। বাহিরে যতোক্ষণ থাকা যায় ততোক্ষণ ভালো। তবুও তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরে। সন্ধ্যা সাতটা ত্রিশ মিনিট। বাসায় এসে হোঁচট খায়। দরজা খোলা। কলি ড্রয়িং রুমের সোফায় ঘুমে।

মীরান বেডরুমে ঢোকে। কারিনা নেই রুমে। কোথায় সে? মনে প্রশ্ন জাগে। বেডরুম থেকে বের হয়ে রূপকের রুমে ঢোকে।

নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে কারিনা। কারিনার এই অভিব্যক্তি চেনে মীরান।

ভয়াবহ কিছু ঘটেছে কি? মুখে প্রশ্ন করে না। চোখ থেকেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় মীরান।

কারিনা অমৌখিক প্রশ্নটির উত্তর দেয় না। রুম থেকে চুপচাপ বেরিয়ে আসে। ইশারায় মীরানকে বেরিয়ে আসতে বলে।

কারিনা বললো খেলতে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। চোখ ফুলে আছে।

বলো কি? চোখে লেগেছে? মীরান প্রায় চিৎকার করে প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ।

আমাকে জানাও নি কেন? ধমক দিয়ে প্রশ্ন করে মীরান।

কারিনা শান্ত থাকে। বুঝতে পারে এটি ধমক নয়। এটি ভেতরগত ভয়ের প্রকাশ মাত্র। সন্তানের জন্য অজানা ক্ষতির সম্ভাবনায় কুঁকড়ে যাবে যে কোনো বাবা, যে কোনো মা। এটি সন্তানের জন্য মৌলিক মমতা, শুদ্ধতম ভালোবাসার গোপন প্রতিক্রিয়া মাত্র।

আমি ফোন করতে চেয়েছিলাম। ও দেয় নি। বলেছে ব্যথা তেমন নেই। কারিনা শান্ত থেকে জবাব দিলো।

মীরান ক্ষুব্ধ চোখে তাকায় কারিনার মুখের দিকে। কারিনাকে এ মুহূর্তে গর্দভ ছাড়া কিছু মনে হয় না তার।

ছেলে 'না' করলো, তুমি চুপ থাকলে? আবারো ধমক দেয় মীরান।

কারিনা কোনো জবাব দিতে পারছে না। প্রত্যেকটি কথার পিঠে মীরান ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। নিজেকে গুটিয়ে নেয় সে। অন্য রুমে চলে আসে।

মীরান ছেলের পাশে বসে।

রূপক ঘুমায় নি। ঘুম আসছে না। বাবার উপস্থিতি টের পেয়েছে। বাবা মার উচ্চস্বরে কথাবার্তা শুনেছে সে। পাথরের মতো বিছানায় পড়ে থাকে।

আস্তে করে ছেলের হাত ধরে মীরান।

বাবার মমতামাখা হাতের ছোঁয়া এই মুহূর্তে ভালো লাগে। ধমক দেয় না বাবাকে। হাত সরিয়ে নেয় না সে।

কেমন লাগছে এখন আব্বু?

ব্যথা সামান্য আছে। টাওয়াল ভিজিয়ে দেওয়াতে আরাম লাগছে। রূপক বললো।

মীরান আলতো করে টাওয়ালটি হাত তুলে নেয়। ফোলার ভয়াবহতা বোঝার চেষ্টা করে।

ছেলের চোখ দেখে মাথায় অজানা উদ্বেগ খাই বসায়।

ভয়ে আঁৎকে উঠে মীরান।

আব্বু। চলো হাসপাতাল চলো। চোখের হাসপাতাল আমাদের সামনে। বাংলাদেশ আই হসপিটাল। চলো ওখানে একবার চেক করিয়ে আসি। মীরান কাতর স্বরে বললো।

রূপক বাবার ইচ্ছেয় বাধা দিলো না। সহজে রাজি হয়ে গেল।

মীরান বেডরুমে আসে। কারিনা গম্ভীর হয়ে খাটের কোনায় বসে আছে। ওর দিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না মীরান।

অন্যদিকে তাকিয়ে বললো, ও কে রেডি করে দাও। হসপিটাল নিয়ে যাবো।

ও কি রাজি হয়েছে? কারিনার কণ্ঠে কিছুটা স্বস্তি ঝরে পড়ে।

রাজি হবে না কেন? চোখের ব্যাপার। অবহেলা করা কি ঠিক হয়েছে? মীরান এখনো ঝাঁঝালো স্বরে কথা বলছে।

এই মুহূর্তে ঝগড়া করার কিছু নেই। ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই উত্তম কাজ। তবে মীরানের সব কথা হজম করতে পারছে না সে। 'অবহেলা করা কি ঠিক হয়েছে?' প্রশ্নটি শ্লেষাত্মক। আক্রমণাত্মক। প্রশ্নটির মাধ্যমে তাকে দোষারোপ করা হয়েছে। দোষ ধরা হচ্ছে তার। মনের মধ্যে গোপনে গেঁথে গেছে বিদ্বেষ। অবিবেচক স্বামীর প্রতি বিদ্বেষের ফনা উথলে উঠতে চাইছে।

সর্বোচ্চ শক্তি খাটিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে কারিনা।

ছেলেকে বাহিরে নিয়ে যাওয়ার মতো ড্রেস পরিয়ে দেয়। চুপ থাকে। নিজেও যেতে প্রস্তুত হয়।

তোমার যাওয়ার দরকার নেই। রুনি ঘুমাচ্ছে। শেলীও ঘুমাচ্ছে। তুমি বাসায় থাকো। রুনিকে দেখো। মীরান বললো।

কারিনার মন মানছে না। যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয় সে।

রূপক বলে, আম্মুও আসুক।

ছেলের কথা ফেলতে পারে না মীরান। কারিনা দ্রুত সার্ভেন্টস রুমে ঢোকে। শেলীকে ঘুম থেকে তোলে। রুনির পাশে বসিয়ে রূপককে নিয়ে বেরিয়ে আসে।

প্রাইভেট হাসপাতালে এখন প্র্যাকটিস আওয়ার। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা আছেন। পিক আওয়ার চলছে। লম্বা লাইনে বসে আছে অনেকে। রূপকের সিরিয়াল কুড়ি। দশ নম্বর সিরিয়াল চলছে। আরো দশজন বাকী আছে। ওয়েটিং রুমে বসে আছে। ওয়েটিং রুমটি চমৎকার। কোণায় টিভি সেট আছে। টিভি চলছে। চোখের রোগীদের জন্য টিভির ব্যবস্থা দেখে মুখে শ্লেষ জেগে ওঠে। মীরান বসে থাকতে পারছে না। নিজে একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। কোথাও গিয়ে

বসে থাকার সয় না। ইমারজেন্সি রোগীদের জন্য আগে ব্যবস্থা করা উচিত। এটেন্ডেন্টকে উপদেশ দেয় সে।

জ্বি স্যার। গুরুতর সিরিয়াস রোগীদের আমরা জরুরী বিভাগে পাঠিয়ে দেই।

গুরুতর কিনা বুঝবে কি করে?

গুরুতর রোগী আমরা দেখে চিনতে পারি। আমরাই জরুরী বিভাগে নিয়ে যাই।

আমার ছেলের অবস্থা কি জরুরী নয়?

কোনো জবাব দেয় না এটেন্ডেন্ট। প্রশ্নের উত্তর পাশ কাটিয়ে যায়। প্রতিদিন রোগীরা বাকবিতণ্ডা করে। তারাও ক্ষেপে যায়। এনার সাথে রাগ দেখানো যাচ্ছে না। কারণ দেখতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ লোক মনে হচ্ছে।

স্যার আপনি ধৈর্য ধরে বসুন। জরুরী বিভাগে পাঠাতে পারি আপনার ছেলেকে। আপনি ওখানে গিয়ে খুশি হবেন না। কারণ জরুরী বিভাগে এখন কোনো সিনিয়র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই।

এটেন্ডেন্টের কথা শুনে চুপ হয়ে যায় মীরান। করিডরের বাহিরে এসে দাঁড়ায়।

কাবিনা বসে আছে রূপককে নিয়ে।

এমন সময় মোবাইল বেজে ওঠে। ডলি-২। আবার ফোন করেছে। ডলি-২ এর আড়ালে আছে নাঈম আহমেদ। এ সময় এই টেলিফোন বিপজ্জনক। মীরানকে দরজার বাহিরে দেখা যাচ্ছে। অস্থির হয়ে এদিক ওদিক হাঁটছে।

হ্যালো। বলুন। কেন ফোন করেছেন? কাবিনা কৌশলে প্রশ্ন করলো।

ছেলের অবস্থা কেমন? স্বামী সাহেব এসেছেন?

ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছি আমরা। লম্বা লাইনে বসে আছি। এখনো দশজন রোগী সামনে।

কোন হাসপাতালে আছেন?

বাংলাদেশ আই হাসপাতালে আছি। ভেতরগত টেনশন লুকিয়ে থাকে না। বেরিয়ে এসেছে টেনশনের প্রতিক্রিয়া। তাই [illegible] গোপন করার কথা ভুলে গেছে কাবিনা। সত্য কথা বলে দিয়েছে।

ওহ। আপনি ওখানে থাকুন। আমি ব্যবস্থা করছি।

নাঈম আহমেদের কথা শুনে ঘাবড়ে যায় কাবিনা।

না, না। আপনাকে আসতে হবে না।

ভয় পাবেন না। আমি যাবো না। আমার বন্ধু এই হাসপাতালের এমডি।

এমডিকে ফোন করে দিচ্ছি। সে আপনার ছেলেকে খুঁজে নেবে। লাইন ছাড়া দেখিয়ে দেবে।

না না, থাক। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

এখানে কষ্টের কী আছে? বন্ধুর উপকারে বন্ধু কাজে লাগবে না? ছেলের নামটি বলুন প্লিজ। ভুল নাম বলবেন না। ভুল নাম দিলে এমডি আপনাদের খুঁজে পাবে না।

দ্রুত কথোপকথনে কাবিনা সব কিছু গোপন রাখতে পারে না। এলোমেলো হয়ে যায় সে। ছেলের নাম বলে দেয় রূপক চৌধুরী।

কিছুক্ষণ পর হাসপাতালের এমডি স্বয়ং বাহিরে আসেন। ওয়েটিং রুমে খোঁজ করেন।

রূপক চৌধুরী কে?

কাবিনা ছেলেকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

আসুন আমার সাথে আসুন। সাথে আর কেউ আছে?

জ্বি। আছে। ওর বাবা বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকে বাহিরে ঘুরছে। অনেকে বসে আছে। সবাই আগে দেখানোর জন্য উদ্বিগ্ন থাকে। অধিকাংশ পেশেন্টের ধৈর্যের অভাব নেই। ধৈর্যের অভাব অভিভাবকদের মধ্যে। কিছু সজ্জন ভিআইপি আছে। তারা চুপচাপ লাইনে বসে আছে।

কাবিনা ইশারায় মীরানকে ডাকে। এমডি সাহেব ওদের নিয়ে পেছনের গলি দিয়ে ভেতরে ঢোকেন। সিনিয়র চক্ষু বিশেষজ্ঞের চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের কাজে ফিরে যান।

মীরান কিছুটা অবাক হয়। দ্রুত ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারে না সে। একটি ধূম্রজালে আটকে যায়। তবুও প্রশ্ন খুঁজে দেখার প্রয়োজনবোধ করে না।

বিশেষজ্ঞ রূপককে দেখেছেন। বলেছেন ভয়ের কিছু নেই।

শুনে কাবিনার ভয় কেটে যায়। মীরানের মনে শান্তি আসে।

কীভাবে এমন হয়েছে? বিশেষজ্ঞ প্রশ্ন করেন।

ক্রিকেট বল লেগেছে। খেলতে গিয়ে আঘাত পেয়েছি। রূপক বললো।

ভ্রূ কুঁচকালেন বিশেষজ্ঞ।

সিওর? সত্য বলছো? আবারো প্রশ্ন করলেন চোখের ডাক্তার।

প্রশ্ন শুনে থতমত খায় রূপক। উত্তর না দিয়ে চোখ তুলে ডাক্তারের দিকে

অসহায়ভাবে তাকায় সে।

মনে হচ্ছে কেউ তোমাকে ঘুষি মেরেছে। কয়েকটি। একটি নয়। ঠিক না?

হুঁ। মাথা দোলায় রূপক।

আর মারপিট করো না। কেমন? আদর দিয়ে বললেন ডাক্তার।

না। মারপিট করবো না। সরল উক্তি রূপকের।

আপনাদের আবারো আশ্বস্ত করছি, ভয়ের কিছুই নেই। তবে ছেলের দিকে নজর রাখবেন। কয়েক দিন যেন বাহিরে না যায়। সপ্তাহ খানেক পর ফলোআপে আসবেন। আজ নাম লেখিয়ে যান যেন পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে না হয়।

মীরানের সব কথা কানে ঢোকেনি। ছেলে মারপিঠ করে। এই কঠিন সত্য শুনে তার বোধশক্তি প্রায় উবে গেছে। চুপচাপ বসে ডাক্তারের কথা শুনছে। কোনো প্রশ্ন করে নি। প্রশ্নের জবাবও দেয় নি। কারিনাই সব কথা বলেছে।

সামনের দরজা দিয়ে ওরা বেরিয়ে আসে। এটেন্ডেন্টকে কাছে ডেকে ধন্যবাদ দেয় মীরান। একশো টাকার একটা নোট ওর হাতে গুঁজে দেয়। পুরনো অভ্যাস মতো চট করে টাকাটি লুফে নেয়। বুঝতে পারে না কী হয়েছে। কেন এমডি ওদের নিয়ে গেল, কেন সে বকশিস পাচ্ছে, উপকার তো কিছু করে নি সে, বিনা উপকারে বিনা শ্রমে একশো টাকা রোজগার। অনেক বড় পাওনা।

শোনো, সাত দিন পরে আমরা আবার আসবো। সিরিয়াল দিয়ে রাখো এটেন্ডেন্ট সিরিয়াল নম্বর দেয়। সাতদিন পর সিরিয়াল নম্বর তিন।

ওই দিন আমরা নিয়ম মেনে আসবো। ঠিক আছে? মীরান এটেন্ডেন্টের গায়ে থাঙ্কর দিয়ে বাহবা দেয়।

কারিনা মনে মনে স্বস্তি পায়। কোত্থেকে কি হয়েছে বুঝতে পারে নি মীরান। রূপক কিছু বুঝেছে। ততোটুকু বুঝতে পারে নি। ডাক্তার বলেছে বিপদের কিছু নেই। এটাই স্বস্তি।

মারপিটের ঘটনা ফ্লাশ হয়ে গেছে। তবুও পারোয়া করে না রূপক। সহজ ভঙ্গিতে বাবা মার সাথে বাসায় ফিরে আসে।

বাসায় ফিরে দেখে চাচাজান মীরপুর থেকে ফিরে এসেছে। রুনি চাচাজানকে পেয়ে মহা খুশিতে আছে। ওনার আত্মীয় চাচাজানকে বাসায় রেখে চলে গেছে।

আজ চাচাজানকে আর একজন ইওরোলাজিস্ট দেখানোর কথা। ইওরোলজিস্ট মীরানের বন্ধু। এ্যাপয়েনমেন্ট করা ছিল। চাচাজান ভুলে নি। কারিনা এবং মীরান উভয়ে ভুলে গিয়েছিল।

ওদের দেখে চাচাজান অবাক। রূপকের চোখের ওপর ব্যান্ডেজ। রুনিও ভয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে। ভাইয়ার কাছে যায়। হাত ধরে ভাইয়ার পাশে বসে থাকে।

আজ রূপক ধমক দেয় নি। রুনিও বাড়াবাড়ি করে নি। ভাইয়ের চোখে ব্যান্ডেজ দেখে ভীত হয়ে পড়ে সে।

সব কথা শুনে চাচাজান স্তব্ধ হয়ে কতোক্ষণ বসে থাকেন।

চাচাজানকে অন্য বেশ ভালো দেখা যাচ্ছে। বিধ্বস্ত অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে তিনি। তাঁর শারীরিক উন্নতি লক্ষ্য করার সাথে সাথে মীরানের মনে পড়ে যায় সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেওয়ার কথা। এ্যাপয়েনমেন্টের কথা মনে পড়ে।

মীরান বলে, চলেন চাচাজান আপনাকে ডাক্তার দেখিয়ে আনি।

চাচাজান ভেতর থেকে খুশি হন। জামাই তার কথা মনে রেখেছে। মেয়ের মনে নেই। এ অবস্থায় মনে না থাকা স্বাভাবিক। কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন গলে যায়।

চাচাজানের চিকিৎসার কথা মনে রেখেছে মীরান। ভাবতে গিয়ে কারিনার মনও বেশ নরম হয়। প্রসন্ন হয়। মীরানের ঢেলে দেওয়া সব বিষ এই মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার জোয়ারে ভেসে যায়। সাময়িকভাবে মনে শান্তি আসে। ঝড়ঝাপটার পরও ওই শান্তিটুকু টের পায় কারিনা।

চাচাজানকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে মীরান। ধানমন্ডির পাঁচ নম্বর রোডের দুই নম্বর বাড়ি সেন্ট্রাল হসপিটাল। বাসা থেকে একদম কাছে। কয়েক মিনিটে পৌঁছে যাবে ওরা হাসপাতাল।

রূপক নিজের রুমে ঢুকে গেছে।

রুনি বলে আম্মু, আমার দিকে তাকাও।

কারিনা মেয়ের দিকে তাকায়।

আমাকে ঘুমে রেখে চলে যাও কেন?

কারিনা রূপকের কথা খুলে বলে।

রুনি অভিমান করে, আমাকে নাও নি কেন?

তুমি ঘুমোচ্ছিলে।

ঘুমে থাকলে আমাকে টর্চ মেরে চোখে আলো ঢেলে দিবে। টর্চের আলোয় আমি জেগে উঠবো।

আচ্ছা, কারিনা আশ্বস্ত করলো।

রুনি আবদার মাখা কণ্ঠে বললো, আম্মু চোখ বন্ধ করো। কারিনা চোখ বন্ধ করলো। রুনি তার চোখের পাতার ওপর টর্চ লাইট জ্বেলে দিলো। লাইট অফ করে চোখ খুলতে বললো। আবার চোখ বন্ধ করো আবার চোখ খোলো।

কারিনা চোখ খোলে আর বন্ধ করে। রুনি দারুন মজা পেয়ে খলখল করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

এক সময় নরম হয় রুনি। টিভি সেটে অন করে। কার্টুন ছবি চালিয়ে দেয়।

কারিনা নিজের রুমে আসে। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। রাতের অন্ধকার তেমন বোঝা যায় না। চারপাশের আলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বেলকনিতে আলো আঁধারী মায়াবি এক পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে।

মোবাইল টিপে ডলি-২ কানেক্ট করে সে।

ওপার পাশ থেকে শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী স্বর ভেসে আসে, কেমন আছেন উপকের মা?

হাসি ফোটে কারিনার ঠোঁটে। কৃতজ্ঞতার মন গলে আছে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা জানা নেই তার। উপযুক্ত সময়ে বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লোকটি। এমন লোককে বন্ধু ভাবতে দোষ কী?

ভালো আছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কারিনা ভদ্রভাবে বললো।

ধন্যবাদ দিয়ে ঋণ খারিজ করতে চান নাকি? নাঈমের দুষ্ট উক্তি।

ঋণী বানানোর জন্য উপকার করতে এগিয়ে এসেছিলেন? কারিনা পাল্টা প্রশ্ন করে।

কী মনে হয়েছে আপনার?

আমার মনে হয়েছে বন্ধুর বিপদে বন্ধু হাত বাড়িয়েছে। ঋণের কোনো ব্যাপার নেই।

এই উপলব্ধির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি এমন ভাবতে পেরে নিজেকে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য করেছেন।

আপনার ধন্যবাদ পেতে চাই না। জোরালো চন্ডে বললো কারিনা।

কী পেতে চান? অন্য কিছু? হো হো করে হেসে ওঠে নাঈম আহমেদ।

না, না। অন্য কিছু না। ধন্যবাদ গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞ করলে বাধিত হবো।

তো। আগে আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কারণ আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে ফেলেছেন। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করলে আপনার ধন্যবাদও আমি গ্রহণ করবো। ঠিক আছে?

আচ্ছা ঠিক আছে।

হেসে ওঠে নাঈম। হো হো হাসির ধমক কানে এসে প্রবল বেগে আকর্ষণ করে কারিনাকে। কারিনাও হেসে ওঠে। স্বতঃস্ফূর্ত হাসির ছটায় দু'টি মানুষের

টেলিফোন কণ্ঠস্বর বন্ধুত্বের বৃত্তে ঢুকে পড়ে। টের পায় না কারিনা। সন্তর্পণে টের পায় না নাঈম আহমেদ।

কিছুক্ষণ পর মীরান চাচাজানকে নিয়ে বাসায় ফেরে।

মীরান উদ্ভাসিত। চাচাজান উদ্ভাসিত।

ডাক্তার বলেছেন, অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। আপাতত অপারেশনের প্রয়োজন নেই। অপারেশন ছাড়াই প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে।

অপারেশনের ভয়ে লুকড়ে ছিলেন চাচাজান।

চাচাজানকে চেনা যাচ্ছে না। উচ্ছ্বাসে ভরে আছে তার সব অভিব্যক্তি, রুনিও খুশি হয়। আব্বু খুশি। আম্মু খুশি। রুনিও তাই খুশি।

খুশির উচ্ছ্বাস শেষ হওয়ার পর বলে, নানাজান তুমি আর গ্রামে যেতে পারবে না। আমাদের এখানে থাকবে।

তা কী হয় নানা ভাই। আমাকে বাড়িতে যেতে হবে না?

রুনি হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। রুনির চোখ ছলছল করে ওঠে।

কারিনার চোখেও পানি। মায়ার জগৎ এমনই। বেদনার সুর এমন। প্রিয় কারুর সান্নিধ্য হারালে বুকে কান্না আসে। বুকে কষ্ট আসে। কেন আসে? জানে না কেউ। কেউ জানে না।

বাচ্চাদের ঝুলে ঢুকিয়ে সবাই একে একে আসছে আড্ডায়।

ডেকে ডেকে সবাইকে বসাচ্ছে ডলি। ডিডি রেস্টুরেন্টের সামনে বসার জায়গায় লেকের দিকে মুখ করে সবাই এল শেপ নিয়ে বসে গেছে।

শীতের কাপড় সবার গায়ে। কারিনা একটা কাশমিরি শাল গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। পরনে সালোয়ার কামিজ। জমিলা'পাও শাল গায়ে। ডলির গায়ে সোয়েটার। উচ্ছল ডলির শীত লাগছে। উচ্ছ্বাস শীতের কারণে বিবর্ণ মনে হচ্ছে। ডলি কৌশল বের করে। কারিনা এবং জমিলা'পা'র মাঝখানে বসে দু'পাশ থেকে শালের দুই অংশ টেনে নেয়। শালের উষ্ণতা গায়ে লাগছে। কারিনা এবং জমিলা'পার শালের উষ্ণতা পেয়ে নেতার ভূমিকা গ্রহণ করে।

কারিনার অস্বস্তি লাগে। ডলির উচ্ছ্বাসের কাছে নিজেকে হেয় মনে হয়। ম্রিয়মান মনে হয়। ছোট মনে হয়।

ছন্দা বলে, বল ডলি, আগে তোর অভিজ্ঞতার কথা বল।

ডলি বলে অবশ্যই আমি শুরু করবো। আগে সবাই প্রতিজ্ঞা করো সত্য কথা বলবো। সত্য নিষ্ঠুর হলেও বেদনার্ত হবো না। কষ্ট পাবো না। আগে প্রতিজ্ঞা করুক সবাই।

কারিনা এবার ভয় পেতে থাকে। তবুও সবার উল্লসিত হাসির সাথে তাল মেলাতে চেষ্টা করে। মীরানের প্রতি বিশ্বাস তার ক্ষীণ। না জানি কী সংবাদ দেবে মুখরা ডলি। দুরু দুরু বুকে আরোপিত হাসিমুখে বসে থাকে, সবার সাথে প্রতিজ্ঞায় শরিক হতে হয় তাকেও।

জমিলা'পা এবার কথা শুরু করে। ডলি নিষ্ঠুর সত্যের কথা বলেছে। যেটাকে সে নিষ্ঠুর বলছে সেটাকে আমি বলবো প্রত্যেক পুরুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য আমরা পুরুষের বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে যুদ্ধ ঘোষণা করবো না। ঠিক আছে? কেবল আড্ডার রসালো খোরাক হিসেবে সত্যটা উন্মোচিত করবো। সবাই রাজি?

সমস্বরে সকলে চিৎকার দেয়, রাজি।

কারিনার স্বর উদ্ভাসিত হয় নি। ফেটে পড়ে নি উল্লাসে। সবার উল্লাসের মাঝখানে ওর ম্লান স্বর কেউ টের পায় নি। কাছে বসা ডলিও না।

শুরু করো ডলি। প্রথমে তুমি বলো। জমিলা'পা বললো।

ডলি বললো, জমিলা'পা সবচেয়ে সাহসী মহিলা। জীবনে সবচেয়ে বেশি পোড় খেয়েছেন। অভিজ্ঞতার ঝুলিতেও নিষ্ঠুরতা এবং নির্মমতা বেশি জমা হয়েছে। প্রথম জমিলা'পার স্বামীর বয়ান শুরু করি।

সবাই তালি দেয়। কারিনাকে তালি দিতে হয়। সবার সাথে অংশ নিতে হয়।

প্রথম দিন আমি ফোন করি, ডলি বলা শুরু করে। দয়াল মোর্শেদ ফোন রিসিভ করে বলে, কে বলছেন?

আমি বললাম, কণ্ঠ শুনে কি বুঝতে পারছেন না আমি একটি তরুণী?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাতো পারছি। আপনি পুরুষ নন। টীনএজার কিশোরী।

ওঃ! বুঝে ফেলেছেন?

বুঝবো না কেন কিশোরীর কণ্ঠ চেনার অভিজ্ঞতা কি আমার নেই মনে করছ?

না না। আপনাকে আন্ডারএ্যাস্টিমেট করবো কেন? আপনি অভিজ্ঞ। অভিজ্ঞদের তোয়াজ করতে হয়। অভিজ্ঞদের সাথে খাতির জমাতে হয়।

কেন? খাতির জমাবে কেন? দয়াল কৌতূহলী প্রশ্ন করলো।

ওমা! আপনি জানেন না? বিদেশ টীনএজ মেয়েরা অভিজ্ঞ পুরুষ খুঁজে বেড়ায়।

তুমি কি অভিজ্ঞ পুরুষ খুঁজে বেড়াচ্ছ?

অভিজ্ঞ পুরুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি বললে ভুল হবে। আপনাকে খুব মানালি লাগে। এই বয়সেও আপনি দেখতে দারুণ। আমি আপনাকেই...।

বলো কি? আমাকে চেনো?

হ্যাঁ। চিনি। কাছ থেকে রোজ আপনাকে দেখি।

তোমার নাম কি গো?

আমার নাম ঝুমু। সবাই ঝুমঝুমি বলে ডাকে। আপনিও আমাকে ঝুমঝুমি বলে ডাকবেন?

ঝুমঝুমি, কোথায় তুমি আমার সাথে দেখা করতে চাও?

আপনি যেখানে বলবেন সেখানে দেখা করবো।

গোপন কোনো স্থানে নিয়ে গেলে যাবে?

গোপন জায়গা কোথায়, বলবেন?

না। এখন বলা যাবে না। আগে তুমি আসো। পরে বলবো। এলে বলবো।

আমি বললাম, আজ রাখি?

আচ্ছা। সব ঠিকঠাক করে তোমাকে বলবো আমি। চলে আসবে। আমাকে ফোন করার জন্য তোমাকে একটা চুমু।

হো হো করে দলের সবাই হেসে ওঠে। জমিলা'পাও হাসে।

আসলে পুরুষ মানুষগুলো এমনই। অল্পতে গলে যায়। পটে যায়। কিছুই বাছবিচার করতে পারে না। বিচার করার ধৈর্য্য তাদের থাকে না। হাতের মুঠোয় যা পাবে তাই পেতে চাইবে।

না, আপা সবাই একরকম নয়। একেকজনের কৌশল একেক রকম। যেমন কারিনার হাজবেন্ড। তিনি ধূর্ত। মনে হচ্ছে ধরা দেবেন, তবে ধরতে পারি নি তাকে।

ধরতে পারি নি মানে? কানিজ প্রশ্ন করলো।

প্রথমবার ফোন করলাম নিজের বেডরুমের বাথরুমের ভেতর ছিল। বাথরুমের কথোপকথন খুলে বলে ডলি। আবার ফোন করলাম, বউ বাচ্চা নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছে। আক্রমণ করার সুযোগও পাই নি পরিবেশের কারণে। তবে মনে হয় পরিবেশ অনুকূলে থাকলে মুঠোয় চলে আসবে। বলেই হো হো করে হেসে ওঠে।

আর চেষ্টা করো নি? ছন্দা বললো।

মেসেজ পাঠিয়েছিলাম। নাম ছাড়া, উত্তর দেয় নি। মনে হয়েছে প্রথমবার আমার ফোন এন্ট্রি করে নি। ধমক খেয়েছি প্রথমবার।

চেষ্টা চালিয়ে যাও। দেখবে ধরা পড়বে গভীর জলের মাছ। জমিলা'পা হাসিতে ফেটে পড়ে। শোনো ডলি, দয়াল মোর্শেদের বাকি পর্বটা শেষ করো।

ছন্দা বলে বাকি পর্ব কি? গোপন জায়গা ঠিক করে ফোন করে নি?

বারবার ফোন করেই চলেছে। সাড়া দেই নি আর। দেবো। সুবিধে মতো সময়ে সাড়া দেবো। জমিলা'পা পারমিশন দিলে গোপন জায়গাটি দেখে আসবো।

কানিজ বলে, কারিনা'পা আপনি বলুন। আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন। আপনার তো ডলির হাজবেন্ডকে ফোন করার কথা ছিল।

মৃদু হাসি ফোটে কারিনার ঠোঁটে। মোনালিসার হাসি। রহস্যময় হাসি। চাপা স্বভাবের কারিনা বলে, প্রথম দিন ফোন করলাম। নো আনসার। দু'বার করলাম। নো।

দ্বিতীয় দিন ফোন করলাম, ইয়েস বলুন, বলেই চুপ করে থাকে। ভারি স্বর শুনে আমি থতমত খাই।

আপনি কি বিজি আছেন? আমি বললাম।

হাঁ বেশ বিজি। পরে ফোন করবেন প্লিজ। বলেই ফোন রেখে দেয়।

আর ফোন করার সাহস পাই নি। আমাকেও কল দেয় নি। বাচ্চা মানুষ ডলির ভালোবাসায় হাপুস হুপুস। আমাকে কি আর নজর দেবে? কথা শেষ করে মৃদু হাসি ফাটা হাসিতে বদলে যায়।

কারিনা অকপটে মিথ্যা বলে গেল। নাঈম আহমেদের সাথে টেলিফোনে বন্ধুত্বের কথা বেমালুম গায়েব করে দিলো।

কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য দেখা যাচ্ছিল। দিনের আলো ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সূর্যের তেজ আবার ম্লান হয়ে এসেছে। কুয়াশার চাদরে ঢেকে যাচ্ছে দিনের আলো। বিন্দু বিন্দু পানি ঝরছে চারদিক।

এ অবস্থায় আড্ডা চালানো যাচ্ছে না। ডিভি রেস্টুরেন্ট এখন বন্ধ। ভেতরে গিয়ে বসার উপায় নেই।

তবুও তারা আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

ছন্দা তুমি বলো, কানিজের স্বামীর কথা বলো। কারিনাকে দিতে হবে না। ডলির নাঈমকে পাকড়াও করতে পারে নি সে। পাকড়াও করতে হলে ডলির মতো অন্য একটি জাঁদরেল মেয়ের দরকার। বলেই জামিলা'পা হেসে ওঠে।

কুয়াশার বিরূপ আবহাওয়া দমাতে পারছে না ওদের। আড্ডায় ভাটা পড়ছে না।

ছন্দা বলে, আমি ফোন করলাম। উনি ফোন ধরে বলেন, আসসালামু ওয়ালাইকুম। আপনি কে বলছেন?

আমি বললাম, একজন তরুণী বধূ। আপনার সাথে একটু বন্ধুত্ব করতে চাই।

উনি বিড়বিড় করে বললেন, নাউযুবিল্লাহ। নাউযুবিল্লাহ।

আমি বললাম, নাউযুবিল্লাহ কেন?

উনি বললেন, নাউযুবিল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ।

এবার আমি ভড়কে যাই। ভড়কে গিয়েও দৃঢ় হই। বলি আপনি কি কথা বলবেন না আমার সাথে?

উনি চুপ থাকেন কতোক্ষণ। লাইন ধরে আছেন। কেটে দেন নি।

আমি আবার বললাম, কথা বলেন। কথা বললে তো আর মুখ দেখা হলো না। পর্দাপ্রথা অনুযায়ী তো দেখা দেওয়া যাবে না। আড়াল থেকে কথা বলা যাবে।

উনি আবারো চুপ থাকেন। লাইনে আমার কথা শুনছেন।

অনেকক্ষণ পরে বলেন, আপনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। এক সপ্তাহ নামাজ পড়ার পর যদি আমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হয় ফোন করবেন।

বাপরে! কী তাবলিগের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলাম।

সবাই আবার হো হো করে হেসে ওঠে।

ছন্দা ধাক্কা দেয় কানিজকে।

এই তোর জামাই যে তাবলিগ করে এই কথা বলিস নি কেন আগে?

জমিলা'পা বলে, তাবলিগ বলো আর যাই বলো। পুরুষ পুরুষই। তুমি আলাপ চালিয়ে যাও। ফাঁদে পা দেবে পুরুষ জাতি।

না আপা, আপনার দর্শন মানতে পারলাম না। সবাই এক না। কানিজ বললো।

ঠিকই বলেছ কানিজ, ডলি বলে, ব্যতিক্রম আছে। সবাইকে এক পাল্লায় মাপা উচিত না।

জমিলা'পা বলে, আরো বয়স বাড় ক বুঝবে পুরুষ কি? কারো হয়ত নৈতিক শক্তি কিছুটা ভালো। নারীর ব্যাপারে তলে তলে সবাই এক। সুযোগ পেলে নৈতিকপাল্লা থেকে উড়ে চলে আসবে নারীর পাল্লায়। বুঝেছ?

কারিনা চুপ ছিল। কথা বলছিল না। জমিলা'পার কথা শুনে ঘাবড়ে যায়। নাঈম আহমেদের বিষয়টি গোপন রেখেছে। গোপন রেখে সবার সাথে আনন্দে শরিক হতে পারে নি। সেও কি তবে নৈতিক শক্তি নিজের অজান্তে হারিয়ে ফেলেছে? নাঈম কি তবে ঝাপ দেবে তার দিকে? শংকিত হয়ে ওঠে কারিনার মন। শংকার সাথে মিশে থাকে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। কোথা থেকে কি ঘটে যাবে কে জানে। নিজেকে শোধরাতে হবে। সংযত রাখতে হবে। আর বেশি দূর এগোনো যাবে না, এগোনো উচিত হবে না। জমিলা'পার খারাপ উদাহরণের মধ্যে থেকে ভালো অংশটুকু টেনে নেয় কারিনা। নিজের মনে স্থান করে নেয়।

লোক নিয়োগ হয়ে গেছে। বসের লিস্ট অনুযায়ী সকলকে নিয়েছে মীরান। বাদ দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। লাবণ্যদের বস্তুটি আসে নি। এলে তাকেও দেওয়া যেত। আসে নি কেন? বুঝতে পারছে না।

মীরানের মন খচ খচ করতে থাকে। কী কারণে অস্থিরতা, জানে না সে। নিশ্চয় তাকে অসৎ ভেবেছে লাবণ্য, নিশ্চয় ভুল ভাঙে নি তার।

লাবণ্যের ফোন পেলে ভালো হতো। কারণ জানা যেতো মেয়েটি কি কেবলই চাকরির জন্য এমন ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলেছে। এমন আপন করে কাছে টেনেছে? কেবলই কি স্বার্থ? নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল? বুঝতে পারে নি ঠিকভাবে।

মোবাইল সেটটি হাতে নেয় মীরান। টিপে টিপে লাবণ্যের নম্বরটি বের করে। কানেক্ট করার জন্য টিপ দেয়। কানেক্ট হচ্ছে না। মোবাইল ক্যান নট বি রিচড্ এট দা মোমেন্ট, কম্পিউটারাইজড্ কথা ভেসে আসে।

সেট রেখে অফিস ফাইলে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে মীরান। মন বসছে না। অনেক কাজ জমে আছে। আগে তার টেবিলে ফাইল থাকতো না। ঝটপট সব কাজের ডিসিশন দিয়ে দিতো, ইদানিং কাজের ত্বরিত গতিতে বাধা আসছে। নিজেকে চিনতে পারছে না, নিজেকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

কারিনা প্রায় রেগে গিয়ে বলতো, তুমি জাতে মাতাল তালে ঠিক। নিজেরটা ছাড়া কারুরটা বোঝ না। কারিনার উপলব্ধি মিথ্যা না। নিজের ঝোল আগে চাই। অন্যেরটা পরে। তবে কারিনার সব কথার সাথে একমত নয় সে। নিজের জন্য যা করে সবই ওর পরিবারের জন্য করা। এই বোধে ঘাটতি আছে কারিনার, ফলে প্রায়ই ঝগড়া বাধে, অশান্তি হয়।

চাচাজান বাড়িতে চলে গেছেন। উনি থাকলে রুনি খুব ভালো থাকতো। এটিও সত্যি চাচাজানকে রেখে দেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছিল। নিজের স্বার্থে না, নিজেদের স্বার্থ হিসেবে বিষয়টিকে দেখতে চায় মীরান। উনি ওনার বাড়িতে যাবেন। এটাই স্বাভাবিক। ওনার চলে যাওয়াতে ক্ষতি হচ্ছে রুনির। নিজের ক্ষতিও বাড়বে। কারিনার উদ্যত রাগ আরো বেগবান হবে। নিজের রাগ সামাল

দিতে পারবে না সে। ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের ইস্যুটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। নিজেদের ফ্ল্যাটটি যেন কেবল মীরানের। কারিনার এই বোধেও ভুল আছে। এটাকে নিজের ফ্ল্যাট ভাবতে পারে না সে। ভাবে নিজের বলে কিছু নেই।

ওর কষ্ট বাড়ে তখন। রাগ বাড়ে তখন। ভাবনাগুলো বদলানোর উদ্যোগ নেওয়া দরকার। কোন পথে এগোবে বুঝতে পারে না। ইদানিং কারিনা বেশি শীতল ব্যবহার করে। বরফ জমা এই আচরণের তলে কী লুকিয়ে আছে কে জানে। কিছুটা অন্যমনস্কও থাকে। প্রায়ই চমকে ওঠে। বিষয়টা কি?

নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করে মীরান। কারিনার সাথে দূরত্ব কমানোর উদ্যোগের কথা ভাবে। পথ খুঁজে পায় না। ছোটখাটো বিষয় জটিল আকার ধারণ করে। চট করে ওই মুহূর্তে কাছে ঘেঁষার মানসিকতাও থাকে না। দীর্ঘদিন দৈহিক উপোসে ভুগছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে শিথিলতা বাড়ছে। ইচ্ছে নেই বলা যাবে না। ইচ্ছেগুলো কোথায় যেন আটকে থাকে।

এ সময় পিয়ন এসে স্লিপ দেয়। একটি মেয়ে দেখা করতে চায়। পাঠাবো স্যার?

স্লিপে লেখা, দেখা করতে চাই। লাবণ্য।

নামটি পড়ার সাথে সাথে বুকের শব্দ বেগবান হয়। সাঁই করে পুরো দেহে এক অজানা কম্পন জেগে ওঠে।

সহজ হয়ে বলে, পাঠিয়ে দাও।

লাবণ্য ঢোকে। হাসি মুখ। কম বয়সী মেয়ে। চেহারার ঔজ্জ্বল্য বলে দিচ্ছে লক্ষ্মী মেয়ে সে। ভালো মেয়ে। মিষ্টি মেয়ে। মেক-আপ করেছে, মুখে ফাউন্ডেশন লাগিয়ে থেমে থাকেনি, গলা এবং কানেও সুন্দরভাবে মিশিয়ে দিয়েছে। ফাউন্ডেশনের ওপর লুজ পাউডার মেখেছে। হালকা আইশ্যাডো করেছে, সরু করে আই লাইনারও লাগানো আছে। মাসকারা দিয়ে চোখের পাতা ঘন করেছে। ঠোঁটে গ্লস এবং ন্যাচারাল লিপস্টিক লাগানো।

গরম কাপড়ের ট্র্যাডিশনাল সালোয়ার কামিজ পড়েছে লাবণ্য, ওড়নাটি দেহের ওপর কায়দা করে প্যাঁচিয়ে রেখেছে। শীতে কাঁপুনি হলেও মেয়েরা গরম জামা পরতে চায় না। গরম কাপড় পড়লে ফ্যাশনেবল দেখাবে না। এই ভয়ে কাঁপুনি খেতে রাজি, কাপড় পরতে রাজি না আধুনিকারা। লাবণ্যও সিম্পল ফ্যাশন করে এসেছে। হাতে একটা সোয়েটার, ক্রিম কালারের সোয়েটারটি দু'হাতে ধরে হাঁটুর ওপর রেখে চেয়ারে বসে।

মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে মীরান। কোনো প্রশ্ন করছে না। মুখে মৃদু হাসির

রেখা ফুটে আছে?

চিনতে পারছেন? লাবণ্য বললো।

মীরান কোনো উত্তর দেয় নি মুখে। মাথা এবং চোখ নেড়ে জবাব দিলো। চিনতে পেরেছে। প্রথমবার দেখেছিল। আজকের মতো করে খেয়াল করে নি। তখন এক চাকরি প্রার্থীর সাথে এসেছিল। এখন এসেছে নিজে। অপরিচিত মেয়েটি লাবণ্য হয়ে সামনে বসে আছে। সেজেছে।

মনে হয় বোবা হয়ে গেছেন। কথা বলছেন না কেন?

মীরান তবুও কথা বলতে পারছে না। কথা খুঁজে পাচ্ছে না। তার মতো বড় একজন কর্মকর্তা তরুণীটির সামনে যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে।

বিবেচক স্যার কথা বলুন। বলেই হাসিতে ঢলে পড়ে লাবণ্য।

বিবেচক শব্দটির সাথে অবিবেচক শব্দটি ব্যবহারের কথা মনে পড়ে। নড়ে বসে মীরান। গলার স্বর একদম নরম হয়ে আছে। হালকা হাসি ফোটে মুখে। উচ্ছ্বাস কন্ট্রোলে রেখে বলে, ভালো আছো লাবণ্য?

হুঁ। খুব ভালো আছি। বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। বর ইঞ্জিনিয়ার। বিদেশ থাকে। গরগর করে বলে গেল লাবণ্য।

মীরানের উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখের ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ ম্লান হয়ে যায়। মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাওয়ার খবর শুনে নয়, পাত্র বিদেশী খবর শুনে মনে ঠাস করে বাড়ি খায়। বিষয়টি মেনে নিতে পারে না।

বিয়েতে তোমার মত আছে?

না। নেই। ভেবে রেখেছি বিয়ে করবো না। এটাই আমার মত।

এটা কি স্বাভাবিক ভাবনা?

না। স্বাভাবিক না। কিছু কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে। অস্বাভাবিক তখন স্বাভাবিক হয়ে যায়।

টেলিফোনেও এমন কথা মনে হয় বলেছিলে?

মনে নেই বলেছি কিনা।

তো, বিয়ের দাওয়াত দিতে এসেছ?

হাসির ঝলকে আবার নেতিয়ে পড়ে লাবণ্য। বললাম তো বিয়েতে মত নেই। গার্ডিয়ান তো চাইছে।

ওঃ। তোমার তাহলে শক্ত মত, বিয়ে করবে না।

হ্যাঁ।

কেন, এই কঠিন সিদ্ধান্ত কেন?

বলেছিলাম না, পুরানো ক্ষতে নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই।

ওঃ। তোমার তো আবার পুরনো ক্ষত আছে।

হ্যাঁ আছে। কারুর ক্ষত নতুন। কারুর পুরনো। আমারটা পুরনো। পুরনো ক্ষত যাক ভেসে যাক। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে বলে উঠে লাবণ্য।

তোমার বয়সই বা কতো। এটা নতুন ক্ষত না হয়ে পুরনো কেন?

এই যে চালাক সাহেব, আপনি খোঁচাচ্ছেন। কথা বের করতে চাচ্ছেন।

ওঃ। সরি। আর খোঁচাবো না।

ধন্যবাদ না খোঁচানোর জন্য।

তবে খোঁচানো না গেলেও টিপে দেওয়া যাবে নিশ্চয়। কি বলো?

টেলিফোন সংলাপের পুরনো কথাটি মনে করে দু'জনে হো হো করে হেসে ওঠে।

কী খাবে?

কফি চলতে পারে। আর কিছু না।

মীরান বেল টিপে। বাহিরে রিং বেজে ওঠে। পিয়ন এসে ঢোকে।

দু'কাপ কফি পাঠাও।

বেল টিপতে গিয়ে মুখে হাসি ফোটে।

পিয়ন চলে যাওয়ার সাথে সাথে লাবণ্য প্রশ্ন করে এই মুহূর্তে হাসলেন কেন? বলবো?

হ্যাঁ বলেন। কেন, বলার সৎ সাহস নেই?

আছে। তবে সংকোচ লাগছে।

আচ্ছা সংকোচ বাবু, বলেন। সংকোচ ছেড়ে বলুন। আমি আজ কিছুতেই মাইন্ড করবো না। বলেই হেসে ওঠে লাবণ্য।

কলিং বেলের আঙুল সমান বেলটিকে দেখায়। দেখো। বেলটি যখন টিপছিলাম সাথে সাথে মনে হয়েছে তোমার নাকও টিপে দেই। দেখি দুধ বের হয় কিনা।

হো হো করে দু'জনই হেসে ওঠে।

এ সময় পিয়ন এসে ঢোকে।

দু'কাপ কফি রাখে টেবিলে।

মীরানের একটি নির্দিষ্ট কাপ আছে। সব সময় ওকে ওর কাপে কফি দেয়। একই পিয়ন। কখনো ভুল করে না। হাসির উচ্ছ্বাস পিয়নের কানে ঢোকে। এই উচ্ছ্বাসের চমকে ভুল হয়ে যায় তার। মেহমানকে কফি দিয়েছে স্যারের কাপে।

কাপ রেখে ফিরে যাচ্ছিল পিয়ন। একবার পিয়ন ফিরে কাপ দু'টির দিকে তাকায়। বুঝতে পারে ভুল হয়ে গেছে। বড় ভুল। ভয়ে স্যারের মুখের দিকে তাকায় সে।

পিয়নের ভুল বুঝতে পারে মীরান। হাসি মুখে পিয়নকে চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করে। পিয়ন চলে যায়। আজ স্যার রাগ করেন নি। হাসি দিয়েছেন। ভয় চলে যায়। নির্ভয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যায় পিয়ন।

কফির কাপ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। হালকা ধোঁয়া ঘুরতে ঘুরতে উড়ে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে। ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আছে মীরান। মানুষের জীবনটাও তো ক্ষণিকের ধোঁয়ার মতো। এই আছে এই নেই। সব মিলিয়ে যায় শূন্যে। অথচ শূন্য নিয়ে পূর্ণ হওয়ার বাসনা মানুষের চিরন্তন। কোন গোপন টানে জাগে অদৃশ্য বাসনা? কোন গোপন টানে পূর্ণ হয় নীরব ইচ্ছের অদৃশ্য কাপ? জানে না সে।

কফির কাপে চুমুক দেয় লাবণ্য।

নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে মীরান। কফির কাপে লাবণ্যের ঠোঁটের ছোঁয়া দেখছে। কাপটি একমাত্র সেই ব্যবহার করে। কাপটিতে নয় যেন লাবণ্য ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে নিজের ঠোঁটে। ভাবতে গিয়ে তরল হাসির ঢেউ ভেসে ওঠে মুখে।

লাবণ্য বলে, মিটিমিটি হেসেছেন কেন?

মিটিমিটি হাসি আবার অট্টহাসিতে বদলে যায়।

বলা যাবে না। মীরান বললো।

কেন? বলা যাবে না কেন?

বলা যাবে না। ব্যাস বলা যাবে না।

বাহ্। কৌতূহলী কাজ করবেন, অথচ জানতে পারবো না?

হ্যাঁ। জানতে পারবে না।

এতো লুকোছাপার কী আছে?

আছে। কিছু কিছু বিষয় লুকিয়ে উপভোগ করা ভালো। প্রকাশ্যে মজা চলে যায়।

মজায় আমাকেও শেয়ার করেন।

না। শেয়ার করা যাবে না।

কেন যাবে না কেন?

এই যে দেখো, তুমি খোঁচাচ্ছো আমাকে। খুঁচিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করছো।

এবারও হেসে দেয় লাবণ্য। খুশেরাংটি ফিরিয়ে দিয়েছে মীরান।

কথা বলতে বলতে কফি শেষ হয়ে যায়। কাপটি পাশে রাখে লাবণ্য। কিছুটা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে বলে টেলিফোন না করে আপনার কাছে আসার একটা উদ্দেশ্য আছে।

ওঃ। উদ্দেশ্য ছাড়া বুঝি চলতে পারো না তুমি।

হ্যাঁ। উদ্দেশ্য ঠিক করে তো চলতে হয়। উদ্দেশ্য ঠিক না থাকলে তো জীবন নানা ভুলে ভরে ওঠে।

তবুও তো ভুল হয়।

হ্যাঁ হয়। ভুল যাতে না হয়, বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে না?

ঠিক আছে। হার মানলাম। তোমার উদ্দেশ্যটি বলে ফেলো।

আজ এসেছি আপনাকে সরি বলতে। লাবণ্যের স্বরে এতোক্ষণে উচ্ছ্বাসহীন সাবলীলতা ফিরে আসে।

সরি কেন বলবে?

কারণ আমাদের পুরো গ্রুপ আপনার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ধারণা পুষে নিয়েছিল। আমাদের বন্ধুর চাকরিটা নিয়ে এই বিদ্বেষ তৈরি হয়েছিল। আমার মনেও আপনার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এবং রাগ এসেছিল।

এখন কি ঘৃণা নেই? রাগ নেই?

না, নেই। চলে গেছে। ঘৃণা কিংবা রাগ নিয়ে কি কারুর সামনে আসা যায়?

যাক। বাঁচালে। ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তোমাদের বন্ধু পরীক্ষা বোর্ডে হাজির হয় নি। তার অনুপস্থিতি ভীষণভাবে মুষড়ে দিয়েছিল আমাকে।

ওর চাকরি হয়েছে। একটা ফুলে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছি আমরা। তাই অনুপস্থিত ছিল বোর্ডে।

তবুও ভালো। চাকরি হয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো মীরান।

হ্যাঁ। চাকরিটা খুব দরকার ছিল। ওর উপকার করতে পেরে আমরা খুশি। তোমাদের বন্ধুর উপকার করতে পারলে আমিও খুশি হতাম।

জানি আমি।

কীভাবে জানো? আমার সাথে তো তোমার দেখা হয় নি।

দেখা হয় নি, কথা হয়েছে।

কথা দিয়ে কি আর মানুষ চেনা যায়?

আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি ভালো মানুষ।

এতো সহজে কি একজনকে ভালো বলা যায়?

যায়। যতোটুকু দিয়ে ভালো বলা চলে ততোটুকু গুণ আপনার আছে।

খারাপ গুণও থাকতে পারে।

হ্যাঁ পারে। যেটুকু দিয়ে পুরুষকে খারাপ বলা যায় সেটিও আপনার মধ্যে থাকবে। সব পুরুষেরই তাই আছে। পুরুষ নারী লোভী। সুযোগ পেলে নারীর দেহ চায়। এই অর্থে সব পুরুষ খারাপ। আপনিও সুযোগ পেলে আমাকে চাইবেন। চাইবেন না? সেই অর্থে কি আপনাকে খারাপ ভাবা ঠিক হবে?

কঠিন এবং ঝাঁঝালো প্রশ্নটির মর্মার্থ মীরানের কর্ণমূলে একটা ঝাঁকি দেয়। সহজ হয়ে বসে। কথা বাড়ানোর সাহস পায় না আর। মেয়েটির এই অসাধারণ উপলব্ধির উচ্চতা মাপতে পারে সে। চুপ হয়ে যায় ব্যাথা শুনে।

লাবণ্য আবার কথা শুরু করে। বলেছিলাম আপনার উপকার করবো। বন্ধুর কাছ থেকে জেনে নেবো কে টাকা চেয়েছে।

জেনেছ?

হ্যাঁ জেনেছি।

কে?

আপনাকে বলতে চাচ্ছি না। তবে এটুকু আশ্বস্ত করছি আপনার বিশ্বস্ত কেউ নয়। তৃতীয় কেউ আছে।

কেন? বলা যাবে না কেন? না জানলে তো ভবিষ্যতে আমরা ক্ষতি ঠেকাতে পারবো না।

ক্ষতি ঠেকাতে হবে না। ওই চক্র আর আপনাদের নাগালের মধ্যে আসবে না।

আর ইউ শিওর?

ডেফিনিটলি?

লাবণ্যের জোরালো উচ্চারণটি শুনে এ প্রসঙ্গ আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। তবুও মনের কোণে মেঘ জমে থাকলো তার।

লাবণ্য বলে, দুশ্চিন্তা কমেছে?

কমেছে। আবার কমেও নি।

এ বিষয়ে আর ভাববেন না। আপনার মঙ্গল আমিও চাই। বুঝতে পেরেছেন?

পেরেছি। থমথমে গলায় জবাব দিলো মীরান।

আজ তাহলে উঠি। লাবণ্য হাসিমুখে বিদায় চায়।

আচ্ছা। সহজেই রাজি হয় মীরান। বসার জন্য পীড়াপীড়ি করে না।

লাবণ্য মুগ্ধ হয়। সাধারণত কোথাও গেলে কেউ তাকে ছাড়তে চায় না। কথার পিঠে কথা দিয়ে ধরে রাখতে চায়। মীরান তেমন নয়। বা এমনকার মনের অবস্থায় তেমনটি ঘটে নি।

নাক টিপে দেখবেন না? হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে লাবণ্য।
মীরানের ভারি মন থেকে আবার হাসির ফোয়ারা বের হয়।
নাক টেপা হয়ে গেছে। হাসতে হাসতেই বললো মীরান।
কী পেলেন? জানতে চায় লাবণ্য।
বলবো না। মীরানের উত্তরেও রহস্যময়তা।
তাহলে আসি এবার। আবার দেখা হবে। কথা হবে। বলেই হাত বাড়ায় লাবণ্য। মীরান কিছুটা হোঁচট খায়। তবুও হাত বাড়ায়। হ্যান্ডশেক করে ওরা। হালকা ছোঁয়া দিয়ে বেরিয়ে আসে লাবণ্য। বারবার দেখা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়।

কেন নাঈম আহমেদের কথা গোপন করলো সে? গোপন করার কোনো প্লান ছিল না। অথচ সাবীলল মিথ্যা বলে গেছে।

কেন এমন হলো? বারবার প্রশ্ন আসে মনে। উত্তর খুঁজে পায় না কারিনা।

বেডরুমে একাকী হাঁটছে। হঠাৎ চোখ যায় রুমের কোণে শার্ট ঝোলানোর হ্যাঙ্গারটির দিকে। স্টিলের মোটা পিলারের মতো লম্বা হ্যাঙ্গারটির মাথা থেকে মাঝামাঝি স্থান পর্যন্ত রয়েছে বাঁকানো কাচির মতো সরু সরু লোহার দাঁত। দাঁতে শার্ট ঝুলিয়ে রাখে মীরান।

অনেকগুলো শার্ট ঝুলে আছে। একটাও পরিষ্কার নেই। পড়া শার্ট ঝুলে আছে। কয়েকটি শার্ট উঠিয়ে গন্ধ শোকে। পচা গন্ধ। বালু জমে আছে। কলারের ভেতরের দিকে চিটচিটে হয়ে আছে। এমন তো কখনো থাকে নি। ময়লা শার্ট একদম পড়তে পারে না মীরান।

তবে কি ময়লা শার্ট পরছে সে? ইদানীং তো ঘ্যান ঘ্যানানিও কমিয়ে দিয়েছে। তবে কি বিরক্তির শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে মীরান? কারিনাকে কি আর প্রয়োজন নেই?

বাথরুমে আসে। সেভিং রেজারটি পুরনো হয়ে গেছে। নতুন ব্লেডের লম্বা প্যাকেটটিও খালি। সেভিং ফোমও প্রায় শেষ। আফটার সেভ লোশনও তলায় চলে এসেছে।

মীরান এগুলো কিনে না। সেই কিনে দেয়। শেষ হওয়ার আগেই সব টিপটপ থাকে।

অনেকদিন এ ধরনের সূক্ষ্ম কাজে মন দিতে পারে নি। নিজের রাগ এবং জেদের তলে চাপা ছিল কোমল অনুভূতিগুলো। বুঝতে পারে সে।

নিজেকে অপরাধী মনে হয়। নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করছে না। এমন নয় যে মীরান জোর করে দায়িত্বগুলো তাকে দিয়েছে। বিয়ের পর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজগুলো নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল কারিনা। স্বামীর কাজ নিজে করে আনন্দ পেতো। অনেক দিন সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত আছে।

ভাবনার সাথে সাথে মন শক্ত হতে থাকে।

এই বঞ্চনার জন্য মীরান দায়ী। নিজের দোষে নিজে ভুগবে এটাই স্বাভাবিক। কেন সে আগে বাড়িয়ে সব কাজ করতে যাবে?

মন দ্রুত বদলে যায়। শক্ত মন কঠোর হয়।

যার কাজ সেই করুক। কেন করবে সে? তার কি অধিকার পূরণ করেছে? কোন ইচ্ছের দাম দিয়েছে?

কঠিন মানুষের কঠোর সাজা পাওয়া উচিত?

বেডরুমে ফিরে আসে সে। ড্রেসিং টেবিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়।

দেখে এক কঠিন রমণী আয়নার সামনে দাঁড়ানো।

নিজের চেহারা নিজের কাছে বিদঘুটে লাগে। বিশ্রী লাগে, এমন হয়েছে নিজের মুখ!

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সরে আসে সে আয়নার সামনে থেকে। এমন সময় মোবাইল রিং শুনতে পায়।

নাঈম আহমেদের ফোন নয় তো? মনের মধ্যে ঢুকে যায় প্রশ্নটি। সাথে সাথে ছুটে আসে ড্রয়িং রুমে। নিজের অজান্তে ছুটে আসে সে। নিজের মধ্যে যেন অন্য একটি রমণী ঢুকে গেছে। সেই রমণী টেনে নিয়ে এসেছে তাকে ফোনের কাছে।

হ্যাঁ। নাঈম আহমেদ। ভিজুয়াল মনিটরে ভেসে আছে ডলি-২।

হ্যালো। কথা বলা যাবে? কানেক্ট হওয়ার সাথে সাথে নাঈম প্রশ্ন করে।

যাবে। বলুন স্থপতি সাহেব। কারিনার মুখ ফসকে কথাটি বেরিয়ে যায়।

দুম করে অফ হয়ে যায় নাঈম আহমেদ।

হ্যালো হ্যালো। লাইনে আছেন? কারিনা অস্থির হয়ে জানতে চায়।

গম্ভীর কণ্ঠে নাঈম বলে, আমার পরিচয় জানলেন কীভাবে?

কারিনা তার সব পরিচয় জানে। এই সত্য নাঈম জানে না। আচমকা মনের সত্য সহজ ছন্দে বেরিয়ে এসেছে। তবুও নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করে।

এইটুকু জানি। আর কিছু জানি না। মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে কারিনা।

সত্যি বলছেন?

মিথ্যা কেন বলবো?

মিথ্যা বলবেন কেন, সত্যিই তো বলেছেন।

ওঃ। তাহলে আপনি স্থপতি? কৌশলের আশ্রয় নেয় কারিনা।

হ্যাঁ সঠিক তথ্য পেয়েছেন। কোত্থেকে পেলেন?

কারিনা জবাব না দিয়ে বলে, জেনে অন্যায় করেছি?

না। অন্যায়ের কথা না। কথা হচ্ছে গোপন কথা গোপন থাকা ভালো। অনেক কথা জানাজানি হলে বিপদ। আপনি নিজেও বলেছিলেন।

ঠিক বলছেন আপনি? কারিনার জিজ্ঞাসা।

কী ঠিক?

কারিনা সতর্কতা নিয়ে বললো, আমরা একে অপরকে না জেনা উচিত?

তেমনই তো কথা ছিল। আমাদের বন্ধুত্ব হবে কণ্ঠের সাথে কণ্ঠের।

বলেছিলাম তবুও একটু খোঁজ পেয়ে গেছি আপনার।

কীভাবে?

সেটা যে বলতে পারবো না।

আমি কি আপনার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না?

যতটুকু জেনেছেন, ওইটুকু নিয়ে তৃপ্ত থাকেন।

কোন টুকু জেনেছি?

জেনেছেন, আমি রূপকের মা। জানেন নি?

ওঃ। জেনেছি। আরও কিছু যে জানতে ইচ্ছে করে।

জানলে ক্ষতি হবে।

কার?

দু'জনেরই।

দু'জনের মানে?

মানে আপনার আমার। কারিনা স্পষ্ট করে বললো এবার।

কী ক্ষতি হতে পারে? নাঈম প্রশ্ন করে।

আপনার বউ কষ্ট পাবে। আমার স্বামীও কষ্ট পাবে।

ওঃ। আমার বউ আছে তাও জানেন?

একের পর একটি ফাঁদে পা দিচ্ছে কারিনা। নিজের মনের আড়াল থেকে বারবার বেরিয়ে আসছে চরম সত্য। সত্য কি তবে চাপা থাকে না? সব সত্যিরই কি প্রকাশ ঘটে?

কারিনা ভয় পেয়ে যায়। কথা বলতে ইচ্ছে করছে তবুও ইচ্ছের লাগাম টেনে ধরে।

আজ রাখি।

কেন, রাখবেন কেন? বলেছিলেন এখন কথা বলার পরিবেশ আছে। কথা বলবেন না কেন? কী অপরাধ করলাম?

আপনি সব জানতে চাচ্ছেন। আমার মোড়ক খুলতে চাচ্ছেন।

মোড়ক খুলতে চাচ্ছি। কাপড় খুলতে চাচ্ছি না কিন্তু। বলেই হো হো করে

হেসে ওঠে নাঈম। কারিনার দেহে শিহরণ খেলে যায়। পর পুরুষের মুখে কাপড় খোলার কথা শুনে টানএজের মতো বিদ্যুৎ খেলে যায় পুরো দেহে।

রাগ করেছেন? নাঈমের বিনয়ী প্রশ্ন।

না।

চুপ করে আছেন কেন?

ভয় করছে।

কিসের ভয়?

আমার সব জানতে চাচ্ছেন। কোনো পরিচয় আপনাকে জানাতে চাই না। জানতে চেয়ে আপনি আমার ওপর জোর খাটাচ্ছেন।

শুনুন। আমরা বন্ধু। জোর খাটাবো না। মনে চাপ দেবো না। কথা দিলাম। আর কিছু জানতে চাইবো না আমি।

ধন্যবাদ আপনাকে।

না। ধন্যবাদ পেতে চাই না। নাঈম বললো।

কি চান আমার কাছে? বলেই হেসে দেয় কারিনা।

কী চাই? নিজেই জানি না তবে আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগে। ভালো লাগাটাই চাই বোধ হয়। সহজ জবাব দেয় নাঈম আহমেদ। মনে মনে ভাবে আরো কিছু চাই, আরো কিছু।

কারিনা কথাটি বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে প্রায় বলেই ফেলেছিল, বউকে ভালো লাগে না? প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেওয়ার আগেই ফেরৎ নেয় সে।

কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন? নাঈম জানতে চাইলো।

বলতে চাওয়া কথা ফেরৎ না নিলে আবার বিপদে পড়তাম। ভালো লাগার মুহূর্তে কঠিন বিপদ টেনে আনা উচিত নয়। এজন্য থেমে গেছি।

আপনার দেখছি অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।

নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সব জায়গায় খাটে না।

আমার ওপর কি খাটে?

খেটেছে মনে হয়। বুঝতেই পারছেন। আবারো হেসে দেয় কারিনা।

মনে মনে ভাবে স্বামীর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। ইচ্ছে মতো রাগ ঝাড়ে সে। ওই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না নিজেকে। এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। নিজের লাগাম নিজে টেনে ধরতে পারছে।

রূপক কেমন আছে?

চোখ ভালো। তবে ওকে নিয়ে চিন্তার শেষ নেই।

এতো চিন্তার কী আছে? আপন গতিতে বেড়ে উঠবে সন্তান। এটাই তো স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক না। কিছু কিছু বিষয় অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

সেটা আবার কি?

ও খুব আউট গোয়িং হচ্ছে। কারিনা চিন্তিত মুখে বললো।

উঠতি বয়সী বড় ছেলেরা এমনই হয়। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। নাঈম আশ্বস্ত করে কারিনাকে।

নাঈমের কথা শুনতে ভালো লাগছে। তবুও মন আশ্বস্ত হচ্ছে না। রূপককে নিয়ে আজকাল কেমন যেন ভয় লাগে। বিষয়গুলো নীরবের সাথে খোলামেলা আলাপের সুযোগ পায় না সে। এখন সুযোগ পাচ্ছে। আলাপের কারণেই ভালো লাগছে। মনের ভয় কাটে না। ভেতরে জমাট ভয় শেকড় বিস্তার করছে।

আউট গোয়িং বলতে কি বোঝাচ্ছেন?

বাহিরে বেশি সময় কাটায়। রাত করে বাড়ি ফেরে। ঘরের প্রতি আকর্ষণ নেই। এমন আচরণ করে যেন আমরা ওর কেউ নই।

বাহিরে তো এই বয়সের ছেলেরা সময় কাটাবে। বাহিরে কী করে সেটা জেনেছেন?

খেলে। ক্রিকেট খেলে।

এটা তো এ যুগের ছেলেদের প্রধান আকর্ষণ। বাংলাদেশ এখন টেস্টে জয় পাচ্ছে। ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তানের মতো টীমকে হারিয়েছে। ওরা তো ক্রিকেট খেলতে চাইবেই। এটা তো অপরাধ না। এটা তো জেনারেশন ক্রেজ।

এতো ক্রেজ ভালো না। অস্বাভাবিক। পড়ালেখা ঠিকমতো চালানো উচিত। পড়ার প্রতি আগ্রহ নেই। রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে। এসব নিয়ে চিন্তিত।

সব মা-বাবা রেজাল্ট নিয়ে চিন্তিত থাকে। আপনি সহজাত মা। আপনার চিন্তা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

তবুও দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় না।

দুশ্চিন্তা করলে কী ছেলের মঙ্গল হবে?

না। হবে না। তবুও ভেতর থেকে চিন্তা আসে। নিজেকে রোধ দিতে পারি না।

আমি একটা কথা বলবো। মনোযোগ দিয়ে শোনেন। ছেলে খেলবে। খেলাটাকে না করা উচিত নয়। ছেলে রাতে বাহিরে সময় কাটায়, বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বিষয়টিকে।

কী করবো আমি?

রাতে বেশি সময় বাহিরে থাকার সুযোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কোন ঔষধ্য দেওয়া যাবে না ছেলেদের। আপনাদের বেশি ষ্টেবল হতে হবে।

কারিনা মুগ্ধ হয়ে শোনে সব। এতো ভালো উপদেশ কোথায় পাবে? এমন ভালো বন্ধু কি আছে আর এ জগতে? ভাবতে গিয়ে চমকে যায় কারিনা। রুনি এসে পাশে দাঁড়ায়। ঘুম জড়ানো চোখে মায়ে আঁচলে ঢোকার চেষ্টা করে।

মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

পরে কথা হবে। এখন রাখি। বলেই লাইন কেটে দেয় কারিনা।

মেয়ে কেবল টিভি পাগল হয়েছে। কার্টুন ছবি ছাড়া কিছুই বোঝে না। পড়ালেখার প্রতিও অগ্রহ নেই। কীভাবে যে মানুষ হবে ছেলেমেয়ে? অনিশ্চিত হতাশায় আবার ঠেসে যায় মন। যতোক্ষণ নাঈমের সাথে কথা বলে ততোক্ষণ ভালো লাগে। ভালো লাগার রেশে ভরে থাকে অনেক সময়। আবার ফোন আসার ব্যাকুলতাও গোপনে বাসা বেঁধেছে মনে।

আগে মীরান দেরিতে এলে টেনশন হতো। দুশ্চিন্তা হতো। এখন হয় না। মনে হয় ও ঘরে না থাকলেই ভালো। যতো বাহিরে থাকবে ততো ভালো। নাঈমের সাথে কথা বলার সুযোগ বেশি পাওয়া যায়। বিনে সুতোর মোবাইলের ওয়েতে ভেসে আসে নাঈমের কণ্ঠ। অন্দরমহলে বসে সেই কণ্ঠের সাথে মিলে যায় নিজের কণ্ঠ। মর্ডানাইজেশনের কারণে জীবন চিত্রে এসেছে নতুন হাওয়া। নিজের একান্ত কষ্ট শেয়ার করা যায়। ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। হালকা হওয়া যায়। অথচ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই ঘটা উচিত এ সব।

না। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটি আসলেই জটিল। স্বার্থের টানাপোড়নে বাঁধা সম্পর্ক। সামাজিকতার সূক্ষ্ম তারে বাঁধা সম্পর্ক। বায়োলজিক্যাল টানে বাঁধা সম্পর্ক। সামান্যতে বাঁধে ফাটল ধরে। সামান্যতেই ধস নামে। সামান্যতেই দূরত্ব বাড়ে।

ভাবতে চায় না কারিনা। তবুও ভাবনা এসে যায়। ভাবনাগুলো তাড়ানো যায় না। এমন ভাবনা তাড়াতে যে নাঈমের কণ্ঠের বিকল্প নেই।

নাঈমের কি লাভ?

নিজের কি লাভ?

কেবলই কি ভালো লাগা? নাকি জৈবিক অন্য কোনো গোপন টানে এগিয়ে যাচ্ছে তারা! গোপন সাম্রাজ্যের গোপন খবর কি জানে না সে? জীবনের ধারাই কি কেবল এমনই!

বদলে যায় আবহাওয়া। বদলে যায় শীত। বদলে যায় কুয়াশা। রোদ ওঠে। মেঘ আসে। বৃষ্টি ঝরে। বদলে গিয়ে নতুন আসে। পুরাতন ঝরে যায়। প্রকৃতির কোন গোপন খেলায় মেতেছে তারা? জানে না। কেউ জানে না কিছু।

দ্বিতীয় পর্ব

কারিনার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মীরান।

শান্ত সৌম্য কারিনার ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ঝিলিক দিচ্ছে। রাগ নেই। বিরক্তি নেই। ঘরোয়া কাজে স্বচ্ছল গতি জানান দিচ্ছে সে এখন কেবল রূপবতীই নয়, সুখবতীও।

নিজের খাটে লেপ জড়িয়ে বসে আছে মীরান। এমনটি কখনো ঘটে না। লেপ জড়িয়ে বসে থাকার সময় নেই। মন মন্ত্রমুগ্ধের মতো গোপনে কারিনাকে দেখছিল। দেখতে গিয়ে থেমে যায়। মুগ্ধ চোখে বউকে দেখে। না দেখার ভান করে বসে থাকে। চোরা চোখ ঘুরে ফিরে।

কারিনা বেডসাইড টেবিলে কফি রেখে গেছে। কফি থেকে ধোঁয়া উড়ছে। পেপার রেখে গেছে।

পেপারটি হাতে নেয়। আড়চোখে বারবার দেখে সে কারিনাকে। অনেকদিন দেখা হয় নি, নিজের বউ এর দিকে চোখ যায় নি। নতুন করে দেখছে। বউকে নতুন মনে হয়। নতুন বউ বউ লাগছে।

মুখে এতো লাবণ্য কেন? এতো রুপ ঝলসে উঠছে কেন? এতো সুখী কেন সে?

কয়েক বছর ধরেই তো সম্পর্ক শীতল চলছে। শারীরিক সম্পর্কে নেই বললেই চলে। গোপন কী ঐশ্বর্য কারিনাকে তৃপ্ত করছে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসছে মনে।

চোরা প্রশ্ন আসছে মনে। শয়তানী ভাবনা আসছে মনে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ভাবনাগুলো তাড়ানোর চেষ্টা করে। পারে না। দেখছিল বউ এর সৌন্দর্য। এ সময় শয়তানী প্রশ্ন আসছে কেন বুঝতে পারে না।

মন অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করে সে। কাপে চুমুক দেয়। পেপারে চোখ বুলায়।

মিনায় নিহত হয়েছে এগারো বাংলাদেশী হাজী। হজের অন্যতম আনুষ্ঠানিকতা শয়তানের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে পদদলিত হয়ে মারা গেছে মোট ৩৬৫ জন হাজী। এদের মধ্যে আছে বাংলাদেশের এগারোজন।

কারিনার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মীরান।

শান্ত সৌম্য কারিনার ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ঝিলিক দিচ্ছে। রাগ নেই। বিরক্তি নেই। ঘরোয়া কাজে স্বচ্ছল গতি জানান দিচ্ছে সে এখন কেবল রূপবতীই নয়, সুখবতীও।

নিজের খাটে লেপ জড়িয়ে বসে আছে মীরান। এমনটি কখনো ঘটে না। লেপ জড়িয়ে বসে থাকার সময় নেই। মন মন্ত্রমুগ্ধের মতো গোপনে কারিনাকে দেখছিল। দেখতে গিয়ে থেমে যায়। মুগ্ধ চোখে বউকে দেখে। না দেখার ভান করে বসে থাকে। চোরা চোখ ঘুরে ফিরে।

কারিনা বেডসাইড টেবিলে কফি রেখে গেছে। কফি থেকে ধোঁয়া উড়ছে। পেপার রেখে গেছে।

পেপারটি হাতে নেয়। আড়চোখে বারবার দেখে সে কারিনাকে। অনেকদিন দেখা হয় নি, নিজের বউ এর দিকে চোখ যায় নি। নতুন করে দেখছে। বউকে নতুন মনে হয়। নতুন বউ বউ লাগছে।

মুখে এতো লাবণ্য কেন? এতো রূপ ঝলসে উঠছে কেন? এতো সুখী কেন সে?

কয়েক বছর ধরেই তো সম্পর্ক শীতল চলছে। শারীরিক সম্পর্কে নেই বললেই চলে। গোপন কী ঐশ্বর্য কারিনাকে তৃপ্ত করছে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসছে মনে।

চোরা প্রশ্ন আসছে মনে। শয়তানী ভাবনা আসছে মনে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ভাবনাগুলো তাড়ানোর চেষ্টা করে। পারে না। দেখছিল বউ এর সৌন্দর্য। এ সময় শয়তানী প্রশ্ন আসছে কেন বুঝতে পারে না।

মন অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করে সে। কাপে চুমুক দেয়। পেপারে চোখ বুলায়।

মিনায় নিহত হয়েছে এগারো বাংলাদেশী হাজী। হজের অন্যতম আনুষ্ঠানিকতা শয়তানের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে পদদলিত হয়ে মারা গেছে মোট ৩৬৫ জন হাজী। এদের মধ্যে আছে বাংলাদেশের এগারোজন।

হায়! জীবন কতো তুচ্ছ। ভালো কাজেও পদদলন।

তুচ্ছ কাজেও শয়তানের ভূমিকা থাকে। শয়তান ভুল ভালে প্ররোচিত করে মন। ঢিল মেরেও শয়তানকে শাসন করা যায় না। কৌশলের আশ্রয় নেয় শয়তান। ঢিল এড়িয়ে পায়ের তলে চলে আসে। একজনের পা উঠে যায় আরেক শয়তান। ঢিল এড়িয়ে পায়ের তলে চলে আসে। একজনের পা উঠে যায় আরেক জনের দেহে। চাপা দেয়। শত শত মানুষ মরে যেতে পারে মীনার মতো জায়গায়। ধূর্ত শয়তান তাড়াবে মানুষ কীভাবে? প্রতি বছরই এমনি মৃত্যুর খবর আসে। হায়! জীবন কোথায় নিরাপদ? সব জায়গাতেই তো শয়তানের বিচরণ।

পেপার থেকে চোখ ফেরায় সে।

অনেকক্ষণ কারিনা আসছে না রুমে। লেপের তলা থেকে পা বের করে সে। প্রচন্ড শৈত্য প্রবাহ চলছে। প্রতিবছর এমন হয়। শৈত্য প্রবাহ চলে। প্রতিবছর লোক মারা যায়। আজকের নিউজে এসেছে তেতাল্লিশ জনের মৃত্যুর খবর।

মৃত্যু আসবেই। যে কোনো পথে এসে হাজির হবে। মৃত্যু ঠেকানো যাবে না। আগে মনে হতো মৃত্যু ঠেকানো সহজ। কারিনার রাগ ঠেকানো কঠিন। কঠিন কাজ সহজ হয়ে গেছে। রাগ ঠেকে গেছে। মৃত্যুর ফাঁকে প্রতিদিনই পা দিচ্ছে মানুষ। গাড়ি উল্টাচ্ছে। মরে যাচ্ছে। মৃত্যু আটকানো যাচ্ছে না। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মরে যাচ্ছে। মৃত্যুর দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে মানুষ।

তার মনেও ঝাঁকে ঝাঁকে ভাবনা আসছে। ভাবনাগুলোর সাথে মিশে যাচ্ছে সন্দেহ। বাপরে। সন্দেহ মৃত্যুর চেয়ে কঠিন যন্ত্রণাময়। বরং মৃত্যু হোক সেটাই ভালো। সন্দেহ যেন জায়গা না পায় মনে।

লেপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে গুটি গুটি পায়ে, এদিক ওদিক তাকায় মীরান। কেউ নেই।

রূপকের রুমে আসে। রূপক এখন কলেজে উঠেছে। রেজাল্ট কোনো রকম হয়েছে। নগরীর অখ্যাত এক কলেজে ডোনেশন দিয়ে ভর্তি করা গেছে।

রুনি এবার নবম শ্রেণীর ছাত্রী। পড়ালেখায় মোটামুটি।

রূপকের রুমে নেই কারিনা। রুনির রুমে যাচ্ছিল। ফিরে আসে। শীতে পা টন টন করে ওঠে। খালি ফ্লোরে হাঁটা যাচ্ছে না। ফ্লোর যেন বরফ মেখে শীতল হয়ে আছে। পা ফ্লোরের স্পর্শ পাওয়ার সাথে সাথে মাথা ধরে যায়। নিজের রুমে ফিরে আসে সে। মোজা পরে। স্লিপারটি খুঁজে বের করে। আরাম লাগছে এখন। আরাম পায়ে হেঁটে আসে। রুনির রুমের দিকে তাকায়। কারিনা কী করছে দেখার ইচ্ছে হয়। শয়তান মনে ভর করেছে। মন এখন কারিনার খোঁজে নিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য কি?

জানে না মীরান। চুপে চুপে এগোচ্ছে।

মন থেকে পায়ে নেমে গেছে শয়তান। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে মীরান।

রুনির রুমের দরজা ভেজানো। লক করা কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বুঝতে হলে দরজার নব ঘোরাতে হবে। ঘোরালে ভেতরের যে কেউ বুঝে যাবে।

না। নব ঘোরাবে না সে। চুপচাপ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভেতরে ফিসফিস কথা চলছে। দু'জন কথা বলছে। ফিসফিস করে কথা বলছে কে? রুনি?

না। রুনি তো এখন কোচিং ক্লাসে থাকার কথা। রুনি এ সময় বাসায় থাকে না।

তবে কি কারিনা কারো সাথে কথা বলছে?

ভেতরে আর একজন কে হতে পারে বুঝতে পারে না। হঠাৎ মনে হয় কথা বলার জন্য তো দ্বিতীয় ব্যক্তির শারীরিক উপস্থিতির দরকার নেই। মোবাইলে কথা বলা যায়। মোবাইলে চড়ে অন্য একজন বেডরুমে গোপনে হাজির হতে পারে।

ভাবনাটি আসার সাথে সাথে মীরান চট করে নব ঘোরায়। দরজা ভেতর থেকে ভেজানো ছিল। দরজা খুলে গেছে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কারিনা মোবাইলে কথা বলছিল।

দরজায় ঠুস শব্দ হওয়ার সাথে সাথে কানের কাছ থেকে মোবাইলসহ হাত নেমে আসে। ক্ষিপ্র গতিতে নিজেকে সহজ করে নেয়। জানালার পর্দা ঠিকঠাক করার কাজ শুরু করে।

ওঃ। তুমি। আমি ভেবেছিলাম রুনি আছে ভেতরে। রুনির সাথে কথা বলতে এসেছি। বলতে বলতে কারিনার মুখের দিকের খেয়াল করে মীরান।

রুনি এ সময় কোচিং যায়। জানো না? মুখের পেশীতে দৃঢ়তা ভেসে ওঠে।

ওঃ! ভুলে গিয়েছিলাম।

ভুলে গেলে চলবে কেন? মেয়ে এখন চৌদ্দতে পড়েছে। মেয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে না?

খেয়াল রাখবো। ফিরে আসছিল মীরান। আবার ঘুরে দাঁড়ায়। ঘুরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

মনে হচ্ছিল ভিতরে কেউ কথা বলছে। ভুল শুনেছিলাম?

না ভুল শুনবে কেন? আমি ফোনে কথা বলছিলাম। আমার এক বান্ধবী ফোন করেছিল। ওর সাথে কথা বলছিলাম। উত্তর দেয় কারিনা।

কার সাথে কথা বলছিলে তা তো জিজ্ঞেস করি নি। কথা বলছিলে কিনা

সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম। বলেই বেরিয়ে আসে মীরান। সে নিজেও মোবাইলে কথা বলে। ফিসফিস কথা যার তার সাথে চলে না। ফিসফিসানির সুযোগ থাকে বিশেষ কারুর সাথে।

লাবণ্যের মতো বিশেষ কোনো মানুষ কি কারিনার জীবনেও এসেছে? শয়তান মগজের ভেতর ঢুকে গেছে এখন। ভেতর থেকে ঠেলে প্রশ্নটি জাগিয়ে দিয়েছে মনে। বিষের ছোবল টের পায় সে। দেহে দেহে বিষের অনুরণন ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিষে নীল হয়ে যাচ্ছে পুরো দেহ। বুকের ভেতরের ঘরে সুঁই ফুটে গেছে। বিষাক্ত সুঁই। টেনে বের করতে চাচ্ছে সে। পারছে না।

দম বন্ধ করে থাকে। চুপ হয়ে থাকে মীরান। অল্পক্ষণ। তারপর বড় করে দম ছেড়ে দেয়। বুকটা একটু হালকা লাগছে। শয়তান নিঃশ্বাসের সাথে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেছে। হালকা বোধ হচ্ছে। প্রশ্নটি রেশানালাইজড করে মীরান। নিজের থাকলে বউ এর থাকবে না কেন? থাকুক। যার যারটা তার তার। ভাবনা দিয়ে শয়তান দৌড়ানোর চেষ্টা করে। আংশিক সফল হয়। কষ্ট কমে গেছে। সহজ করে নিয়েছে পুরো পরিস্থিতি।

ভেতর থেকে কি সহজ বোধ এসেছে? মনে হয় না। মনে হয় এখনো বিশেষ আলামত রক্তের অনুতে পরমাণুতে মিশে আছে। মিশে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুরো দেহে।

আল্লাহ পাক শয়তানকে এতো ক্ষমতা দিলেন কেন! কেন তাঁর সৃষ্টির বুকে আগুন ছড়িয়ে দেয় শয়তান? কী মোজেজা আছে আল্লাহ পাকের! বোঝার চেষ্টা করে নি মীরান। কোনোদিন বোঝার উদ্যোগ নেয় নি। ঘা খেয়ে বুঝতে পারছে। বিশৃঙ্খলা হলে জীবনের পাতায় পাতায় পোকা ধরবে। শেষ হয়ে যাবে জীবন। মীরানের জীবনও কি তবে শেষ? সে নিজেই বিশৃঙ্খল হয়েছে। লাবণ্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এর সাজা কি বেঁচে থাকতে পেতে হবে?

মর্মজ্বালা নয় কেবল। মর্মপীড়ায় ডুবে যেতে থাকে মীরান।

নিজের রুমে ফিরে আসে। মনে মনে ভাবে শয়তানের প্ররোচনায় পদদলিত হয়ে মরে যাওয়াই ভালো। বেঁচে থাকার যাতনা ভয়াবহ। ভয়াবহ কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যই বোধ হয় আল্লাহ পাক মীনায় এতো লোকের প্রাণ সংহারের ব্যবস্থা করেছেন। কে জানে কিসে মঙ্গল। কিসে অমঙ্গল। আল্লাহ ছাড়া তো কেউ জানে না।

শীত কমছে না। শীত আরো বেড়ে যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে দেহ। কাঁপছে মন। কাঁপছে শীতল ফ্লোর। পায়ে পায়ে নিজের রুমে আসে। লেপের ভেতর ঢুকে যায়। লেপ দিয়ে মুখ ঢেকে দেয়।

রুনির সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। রুনির সাথে কথা বলতে পারলে বোধ হয় ভালো হতো। কথা বলার স্কোপ নেই। ক্লাসে মোবাইল বন্ধ রাখে সে।

লাবণ্যকে ফোন করা যেতে পারে। না। ইচ্ছে হচ্ছে না। লাবণ্যের কথা মনে আসার সাথে সাথে বিষের জ্বালা আরো বেড়ে যায়। কারিনার অন্য কেউ থাকবে ভাবতেই পারে না মীরান। লাবণ্যের কথা মনে হওয়ার সাথে সাথে মনে হয় কারিনারও অন্য কেউ আছে।

লেপ মুখ থেকে সরিয়ে দেয়। গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার মুখ দিয়ে ছাড়ে।

কারিনা এসময় রুমে এসে ঢোকে। সহজ স্বাভাবিক।

টুকটাক এটা সেটা করছে। ঘরে বাতাসে টোকা খায় নি, যেন পৃথিবীর কোথাও কোনো পরিবর্তন হয় নি। এমনি ভঙ্গিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

মীরান আড় চোখে একবার কারিনাকে দেখে।

একি! এমন লাগছে কেন? চোখ ডলে দেয় একবার। না ফর্সা হচ্ছে না। চোখ ঝাপসা লাগছে। কারিনাকে চেনা যাচ্ছে না। নিজের বউকে চেনা যাচ্ছে না। অন্য কোনো নারী, অচেনা কোনো মেয়ে যেন ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে। মা, মাগো এমন লাগছে কেন! এতো কষ্ট কেন মা? রুনির কথা মনে পড়ে। মামণি তুমি চলো এসো। মাথায় হাত দাও। আব্বুর চুলগুলো টেনে দাও। ঘুম পাচ্ছে না। আব্বুর খারাপ লাগছে। চুল টেনে দাও মামণি।

কারিনা বলেছে রুনির জন্য সাবধান হতে। রুনি এখন টীন্স বয়সের কিশোরী।

মীরানের মনে প্রত্যয় জেগে ওঠে। সাহস জেগে ওঠে। সাহসী মন বলে মেয়ের জন্য ভয় নেই। ভয় এখন বউ এর জন্য। বউ এর অন্য কেউ আছে। অন্য কেউ, নিজের লাবণ্যের মতো পুরুষ কেউ কি আছে কারিনার জীবনে?

সত্য মিথ্যা জানে না সে। না জেনেই এমন অবস্থা! এমন কিছু যদি বাস্তবে থাকে কী অবস্থা হবে?

মুখে একবার লেপ টেনে দেয়। আবার সরিয়ে দেয় লেপ।

কারিনা। জানালার পর্দা সরিয়ে দাও।

কারিনা পর্দা সরিয়ে দেয়।

আলো এসে ঢুকে রুমে। স্লাইডিং গ্লাস লাগানো। বাতাস আসছে না। আলো আসছে। বাইরে কুয়াশার প্রভাব এখনো কাটে নি। তবুও আলো আসছে। যেন অন্ধকারে ছিল রুম। আলোর বন্যায় ধ্বসে উঠেছে পুরো রুম।

মনে মনে বলে মীরান, আলো চাই। আলো। আরো আলো। বাতাস চাই। নিঃশ্বাসের জন্য বাতাস দাও আরো বাতাস। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন? স্লাইডিং গ্লাস কি খুলে দেবে কারিনা? ফিসফিস করে বলে যায় মীরান।

কারিনা খেয়াল করে কথাটি। স্লাইডিং উইন্ডো খুলে দেয়, বাতাস আসছে এখন। শীতের বাতাস। কুয়াশা মাখা শীতের কনকনে বাতাসে বুকের হিম ভেঙে যায়। চোখে পানি আসে। কারিনা খাটের পাশে বসে।

অসুবিধে হচ্ছে তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?

কপালে হাত রাখে কারিনা।

ডান হাত দিয়ে নিজের কপালে বউ এর হাত চেপে ধরে।

উহ্ শান্তি। শান্তি। চোখ জুড়িয়ে যায়। দেহ জুড়িয়ে যায়। মীরান শান্তি পায়। কপালে হাত দিয়ে বসে থাকে কারিনা।

শান্তি বেশিক্ষণ সয় না।

মনে হতে থাকে এটি তার বউ এর হাত নয়। এটি অন্য কোনো রমণীর হাত। এই হাতে আছে অন্য পুরুষের হাতের ছোঁয়া।

ভাবনার সাথে সাথে হাত সরিয়ে দেয় মীরান। একপাশ হয়ে শোয়। কারিনা উঠে দাঁড়ায়। রুম থেকে বেরিয়ে আসে। রুনির রুমে ঢোকে। মোবাইলটি অন করে সে। ডলি-২ তে ফোন করে। নাঈম আহমেদের উদ্বিগ্ন গলা ভেসে আসে।

এনিথিং রং?

মনে হয় মীরান আমাদের কথা কিছু শুনেছে। কারিনার কণ্ঠেও উদ্বেগ।

শুনুক। ভয় পেয়ো না তুমি। শক্ত থাকবে। যে কোনো পরিস্থিতি বুদ্ধি দিয়ে জয় করবে। আবেগে ভেঙে যাবে না। আমি তোমার পাশে আছি।

নাঈম কারিনার সম্পর্ক তুমিতে নেমে গেছে কয়েক বছর আগেই। নিজেদের মধ্যে গড়ে উঠেছে অন্য রকম সম্পর্ক। বাহিরে দেখা সাক্ষাৎ ঘটে তাদের।

কারিনা বলে, ভয় করছে।

বললাম তো ভয়ের কিছু নেই। যে কোনো বিপদে তোমার পাশে আছি। ওর কাছে আমাদের সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে। ধরা দেবে না।

আচ্ছা। রাখি। নাঈমের সাথে কথা বলতে পেরে সহজ হয়ে যায় কারিনা।

নিজের রুমে ফিরে আসে। মীরান ওপাশ হয়ে শুয়ে আছে। মনে হয় তেমন ভয়ের কিছু নেই।

নিজে থেকেই অনেক দিন পর অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

ওঠো। অনেক বেলা হয়েছে। কারিনার গলার স্বর একদম স্বাভাবিক, একদম নিষ্পাপ।

একটু আদর পেয়ে মন গলে যায় মীরানের। নড়ে ওঠে সে। উঠছি। আর একটু শুয়ে থাকি।

আর কতো শোবে। প্রায় সকাল ১০টা এখন। ওঠো। নাস্তা খাও।

রুনি আসে নি? মীরান বললো।

রুনি এগারোটায় আসবে।

এখন রুনির সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। রুনি আসুক। রুনি এলে উঠবে সে। মনে মনে ভাবে। রুনি চৌদ্দতে পা দিয়েছে। রুনির জন্য ভাববে কী, ভাবনা ঢুকে গেছে বউ এর জন্য।

মনকে বোঝায়। না তেমন কিছু ঘটে নি। অতিরিক্ত ভাবছে সে। অতিরিক্ত ভেবে নিজেকে কাহিল করে ফেলেছে। কারিনা তো স্বাভাবিক আছে। অস্বাভাবিক কোনো কাজ ঘটিয়ে এমন স্বাভাবিক কি থাকতে পারে কেউ?

চিন্তাটি মনে শান্তি এনে দেয়। উঠে বসে সে।

মিথ্যা ভেবেছিল সে। মিথ্যা ভেবে কষ্ট পেয়েছে। এটা নিশ্চয় শয়তানের কারসাজি। ওই তো তার বউ। কারিনা। কতো সহজ। কতো স্বাভাবিক। এমনি ভাবনার জাল মগজে ছড়িয়ে কি সে বউ এর প্রতি অবিচার করছে না?

মনকে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নেয়। উঠে এক গ্লাস পানি পান করে। তারপর বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে। উপলব্ধি করে লাবণ্যে কোনো সুখ নেই। মোহ আছে। সুখ বউ-এর হাতের ছোঁয়ায়। বউকে বেশি সময় দেবে সে। বেশি সময় বাসায় কাটাবে। ভাবতে গিয়ে মনে সুখ টের পায়।

মোবাইলে রিং হচ্ছে। ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর সেট। কারিনা মার্কেটে, হাটবাজারে শপিং করছে। কয়েকবার বেজে থেমে যায়।

রুনি সাথে আছে। বিকেল চারটা বাজে। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায় কারিনা। বিকেল পাঁচটার দিকে ফোন আসার কথা।

নাঈম বলেছে, পাঁচটায় ফোন আসবে। এখন চারটা।

মোবাইলের দিকে মনোযোগ যায় তার।

আবার রিং বেজে ওঠে। দ্রুত ব্যাগ থেকে সেটটি বের করে। ডলি-২ ভেসে আছে। রুনি থেকে একটু আড়ালে চলে আসে কারিনা।

হ্যালো। মেয়ে কণ্ঠ ভেসে আসে।

কারিনা চুপ হয়ে যায়। ভয়ে বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেছে। অথচ ভয় পেলে স্পন্দন বেড়ে যাওয়ার কথা।

হ্যালো। কারিনা। আমি ডলি। ফোন অন করে চুপ আছিস কেন? কথা বল। ডলি বললো। সহজ গলা। সহজ কথা।

ও। ডলি! কেমন আছিস? ভয়ে ভয়ে জবাব দেয় কারিনা।

ভালো নেই রে।

কী হয়েছে?

নোশিনকে নিয়ে চিন্তায় আছি। সকালে কোচিং ক্লাসের নাম করে বেরিয়েছে। এখনো ফেরে নি। রুনিকে জিজ্ঞেস করতো, সত্যিই কোচিং ক্লাস ছিল কিনা?

আচ্ছা। জিজ্ঞেস করছি। অনেকদিন তো ফোন করিস নি। তাছাড়া 'আন নোন' নম্বর। হঠাৎ বিস্মিত করিনা আমি।

আমার ফোন ভুলে নাঈম নিয়ে গেছে। ওরটা রেখে গেছে।

আমার নম্বর কি এখানে সেভ করা আছে? নম্বর পেলি কোথেকে? দীর্ঘদিন তো দেখা সাক্ষাৎ নেই।

ডায়েরিতে তোর নম্বর তুলে রেখেছিলাম।

নাঈম ওর সেটে নম্বরটি এন্ট্রি করে রাখে নি। সব সময় মুখস্থ নম্বর টিপে কথা বলে। ফলে রক্ষা হয়েছে। নইলে বিপদ হতে পারতো। বাচ্চা মেয়ে শেখা। সেও ডলি-২ ডিলিট করে দেবে। নম্বর মুখস্থ রাখবে। মুখস্থ নম্বর টিপে কথা বলবে। অথবা কল লগে গিয়ে নম্বর বের করে কানেক্ট করবে। এটাই নিরাপদ।

কারিনা বলে, দিন কেমন চলছে?

কেমন আর চলবে? নোশিনকে নিয়ে চিন্তার শেষ নেই।

রাত জেগে ডি-জুসে কথা বলে। দরজা বন্ধ করে কথা বলে। দিন ভর ঘুমায়। পড়ে না। রেজাল্ট ভীষণ খারাপ হচ্ছে। মনে হয় ফেল করবে এবার। পড়ালেখার জন্য বকেছি আজ সকালে। রাগ করে কোথায় গিয়ে বসে আছে। ফোন বন্ধ।

এ সময় রুনি মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। কারিনা বলে, নাও, ডলি আন্টির সাথে কথা বলো। নোশিনের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছে।

হ্যালো স্লামালেকুম আন্টি। সেটটি হাতে নিয়ে কথা শুরু করে রুনি।

তোমাদের কি আজ কোচিং ছিল?

হ্যাঁ ছিলো তো। এগারোটায় শেষ হয়েছে। নোশিনকে তো কোচিং এ দেখি নি আজ।

ধ্রিম করে আঘাত খায় ডলি।

কারিনা কথা শুনছিল। দ্রুত সেটটি হাতে নেয়।

ভেঙে পরিস না। দেখ কোথাও পাবি। সান্ত্বনা দেয় ডলিকে।

জীবনটা ছারখার হয়ে গেল। ওর বাবাটাও যেন কেমন বদলে গেছে। ঘরে সময় দেয় কম। বেশি ব্যস্ত। মেয়েও বাপের মতো হচ্ছে।

আহা। ধৈর্য ধর। সব ঠিক হয়ে যাবে। সব বাচ্চাদের এখন এমন ক্রেজ চলছে। রাত জেগে ডি-জুসে কথা বলে। দিনে ঘুমায়। পড়ায় ডাব্বা মারে। সব বাচ্চাদের এখন এই অবস্থা। আমার রূপকের অবস্থাও খুব খারাপ। রুনির কথা বললো না কিছু।

গ্রামীণে ফোন করে জানানো উচিত 'রাতে ফ্রি দেওয়া বন্ধ করুন। অফ টাইমে দিনে এক ঘণ্টা ফ্রি দিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফ্রি দিয়ে রাত জাগিয়ে এ প্রজন্মের বারোটা বাজাচ্ছেন আপনারা। ডলি নিজের ঝাঁঝ ঝাড়ে।

আচ্ছা। জানাস। আগে মাথা ঠাণ্ডা কর। পরে জানাস। আমিও গ্রামীণে ফোন করবো ভাবছি।

লাইন কেটে যায়। রুনির সামনে এসে দাঁড়ায়।

মা! ব্যাকডেটেড কথাবার্তা বলো কেন?

কী ব্যাকডেটেড?

ওই যে, ফ্রি কথা বলার সুযোগ বন্ধ করার কথা বলছো। এটা ব্যাকডেটেড নয়?

সন্তানের ক্ষতি রোধ করতে সব মা'ই চাইবে। চাইলেই ব্যাকডেটেড হয়ে গেল? তোমাদের মর্ডানাইজেশনের কুফল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিজনেস ম্যাগানেটরা তো দেখবে না। আমরা প্রতিবাদ না করলে কে করবে?

রুনি আর তর্ক বাড়ায় না। মা-র হাত ধরে হাটবাজার থেকে বেরিয়ে আসে।

অনেকদিন ডলির সাথে কথা বলা হয় নি। ডলিকে এড়িয়ে চলে সে। আজ প্রয়োজনে কথা হয়ে গেল। ভয় পেয়েছিল। ভয় চলে গেছে। সম্পর্ক নিজের দিক থেকে সহজ হয়ে গেল। নাঈম এখন তাকে ছাড়া বোঝে না, কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে। কথা বলার জন্য অস্থির থাকে। ডলির স্বামী এখন নিজের বড় বন্ধু। নাঈমকে কি ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে? ডলির কাছে নিজেকে ছোট মনে হয়। হীন মনে হয়।

রাতে নিজের রুমে শুয়ে আছে রুনি। চাঁদনি রাত। প্রায় বারোটা বাহিরে চাঁদের আলো, চারপাশের কৃত্রিম আলোর কারণে চাঁদের আলো টের পাওয়া যায় না। দূর আকাশে ফুটফুটে চাঁদ বাঁকা হাসি দিয়ে তাকিয়ে আছে।

এ সময় নোশিনের কথা মনে হয়। ফোন করে সে। ভি-জুসে এখন নোশিনের সাথে ফ্রি কথা বলা যাবে।

প্রথম বারেই লাইন পেয়ে যায় রুনি। সাধারণত বারোটার পর লাইনে জ্যাম লেগে যায়।

হ্যালো, নোশিন বলছি।

তাতো জানি, নোশিনই তো বলবে। রুনি হাসিমুখে জবাব দিলো।

নোশিনের মুখে হাসি নেই। কেমন আছিস তুই? জানতে চায় সে। নিরাসক্ত স্বর।

আগে বল বাসায় ফিরেছিস?

ফিরেছি। আবারো নিরাসক্ত জবাব।

সারাদিন কোথায় ছিলি? আন্টি খুঁজে খুঁজে হয়রান। রুনি ধমক দিয়ে জানতে চাইলো।

নোশিনের কথা বলতে ভালো লাগছিল না। কোথায় ছিলি প্রশ্নটার সাথে সাথে নড়ে বসে সে। কথা বলতে ইচ্ছে হয়। ভেতরটা খালি করতে ইচ্ছে হয়। ভেতরে ভীষণ কষ্ট।

তোর সাথে কিছু কথা শেয়ার করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাটকে বলিস না তো?

আমার ওপর বিশ্বাস রাখ। একশো ভাগ। তুই তোর কথা বল আমি আমার কথা বলবো। শেয়ার করবো। বিটিভির "আমার কথা আমি বলবো" অনুষ্ঠানে সেদিন তুই ছিলি, আমিও ছিলাম। মনোচিকিৎসকের পরামর্শ শুনিস নি? কষ্টের কথা চাপা দিয়ে রাখলে নিজের ক্ষতি। অন্যের কারণে আমরা কষ্ট পাই। কেন কষ্ট পাবো? কেন ঝেড়ে ফেলে দেবো না সব কষ্ট?

নোশিন সহজ হয়। একটু সময় নেয়। বড় করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, সারাদিন আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ছিলাম।

এটা তো আনন্দের কথা। এখানে কষ্টের কি আছে?

কষ্টরে ভীষণ কষ্ট। সে দীর্ঘদিন ধরে পটাচ্ছিল ডেটিং এর জন্য। নিয়ে তোল এক ফ্ল্যাটে। ওর এক বন্ধুর বাসায়। বাসায় ওর বন্ধুর বাবা মা নেই। কেবল বন্ধুটি ছিল। আমরা ওর বন্ধুর রুমে ঢুকে দরজা লক করে দিলাম।

বাহ! হেভি রোমান্সের ব্যাপার দেখছি।

হ্যাঁ। রোমান্সের ব্যাপার। প্রায় এক ঘণ্টা আমরা রুমের ভেতর। যা হবার তাই হলো। আদরে আদরে ভাসিয়ে দিলো ও। পৃথিবীর চরম ঐশ্বর্যের স্বাদ পেলাম।

তো কষ্ট কীসের? এতো দেখছি আনন্দ! আনন্দের ঘটনা!

পরের ঘটনা শোন। ও আমাকে রুমে রেখে বেরিয়ে গেল। আমি ফ্রেশ হয়ে নিলাম। কতোক্ষণ পর ফিরে এসে বলে, নোশিন আমার আরো এক বন্ধু এসেছে। আমরা তিনজন জানের জান। তুমি তো দারুন সেক্সি। ওদেরকেও কি একটু দেবে?

বলিস কি? ওর সাথে তোর এ্যাফেয়ার না? নিজের প্রেমিকাকে কি অন্যের হাতে দেবার প্রোপোজাল দিতে পারে?

তখনই তো বুঝলাম। আমার মতো একটি মেয়েকে নয়। ওরা প্রায়ই এখানে মেয়ে নিয়ে আসে। এ্যাফেয়ারের ভান করে। তারপর গ্রুপ বেধে মেয়েটিকে সেক্স করে। সেক্সি মেয়ে খোঁজে। সেক্সিদের নাকি বাগে নেওয়া সহজ।

তোকেও কি...? প্রশ্নটি পুরো করতে পারে না রুনি।

সে সুযোগ দেই নি আমি। প্রচণ্ড সাহস নিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

এ তো দেখছি ভয়াবহ ঘটনা।

ভয়াবহ না। কষ্টকর। কারণ আমি তো পুরোপুরি ভালোবাসার টানে ওর কাছে গিয়েছি। ওর মুখোশ খুলে যাওয়ার কারণে কষ্ট পাচ্ছি। ভালোবাসার যাতনায় ভুগছি। বিশ্বাসহীনতার দহনে পুড়ছি আমি।

আকাশের বাঁকা চাঁদ মিলিয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল আলো ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

রুনির মনের আলোও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে। নোশিনের কথা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। নরম গলায় বলে, আমারও অনেক কষ্ট আছে। কষ্টে ভেঙে পড়লে কি চলবে নোশিন?

তোর আবার কি কষ্ট? তোকে দেখে সুখী মনে হয়। তোর লাভার তো তোকে প্রচণ্ড ভালোবাসে।

ভালোবাসার রূপ দেখে সব বোঝা যায় না। আমিও আমার ফ্রেন্ডকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। ইদানীং মনে হয় ভালোবাসা সব মিথ্যা।

কেন? কোনো সমস্যা?

সমস্যা না। মন খারাপ। মন খারাপের উৎস বাবা-মার সম্পর্ক। প্রচণ্ড খারাপ ওদের অবস্থা। বাবা এক তরুণীর প্রেমে পড়েছে। প্রায়ই ডেটিং করে। অথচ বাবার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি।

তুই দেখেছিস?

নিজের চোখে দেখেছি। গোপনে বাবার কথা কানে শুনেছিও।

কি দেখেছিস?

ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি।

দূর। ও কিছু না। এই বয়সী লোকের সাথে আমাদের বয়সী কোনো মেয়ের কি প্রেম করবে নাকি?

আরে করে। আমি প্রেমালাপ শুনেছি।

দেখ। মেয়েটি হয়ত কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ঘুরে বেড়ায়। সেক্স-টেক্স করবে না।

সেক্সি সব আলাপ করে। কানে শুনেছি আমি।

আরে নিজেকে দিয়ে বুঝিস না। বুড়ো লোকগুলো সুযোগ পেলে কেমন গায়ে পড়ে কথা বলে। সরাসরি দেহ চায়। অভিজ্ঞতা হয় নি তোর? নোশিন নিজের কষ্টের কথা ভুলে যায়। রুনিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজের কষ্টের কথা চাপা পড়ে যায়।

রুনি বলে, আমার আর একটা সমস্যা হয়। দেহঘটিত সমস্যা।

বুঝতে পারছি কী সেটা। তবুও বল। নোশিন বললো।

হঠাৎ সেন্সুয়াল সেনশেসন আসে, নিজেকে সামাল দিতে পারি না। ভীষণ কষ্ট হয়। মাথা পুড়তে থাকে। তল পেটে মোচড় খায়। রাতে বিএফ দেখায় ডিশ লাইনে। ওগুলো দেখলে আরো গরম হয়ে ওঠে দেহ।

হ্যাঁ ওটা দানব। টীনএজ দানব। সেক্সের জন্য টীনএজ দেহে এমনি প্লাবন আসে। বন্যা আসে। এটা স্বাভাবিক।

তো ঠেকাবো কেমন করে ওই স্বাভাবিক দানব?

সুযোগ পেলে আমাদের বয়সী মেয়েরা সেক্স করে। দানব ঠাণ্ডা করে।

এটা তো অনৈতিক। দানব ঠাণ্ডা করার আর কি উপায় আছে?

আছে। আমাদের সাথে কয়েকটি মেয়ের কাছে শুনেছি। ওরা যেন কী খায়। খেলে দানব ঠাণ্ডা থাকে। জ্বালায় না। ভালো ঘুম হয়।

কী খায়?

মনে হয় মাদক জাতীয় কিছু।

তুই খেয়েছিস?

না।

খাবি?

খেয়ে দেখতে পারি। তবে ভালোবাসায় ঘা খেয়ে আমার দানব বোধ হয় মরে যাবে।

আরে যাবে না। আমি কী ঘা খাই নি। বাবার আচরণে কি আমার কষ্ট কম? তবুও তো দানবটা আছে।

বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরে বেড়াবে, রাতে বিএফ দেখবে, দানব চাঙ্গা হবে না? মরবে কেন? এগুলো ছাড়। নৈতিক শক্তি বাড়া। নিজের জীবনের শিক্ষা রুনিকে দেয় সে।

কথা বলতে বলতে নোশিন সহজ হয়। রুনিও সহজ হয়। একটু হাসে ওরা। ওদের ভেতরের কষ্ট কমে আসে।

দানব ঠাণ্ডা করার ওষুধটা তুই জোগার করে রাখিস। দু'জনে একসাথে খাবো।

দেখা যাক। নোশিন বললো। মনে মনে ভাবে ওষুধ না, নৈতিক শক্তিই বড় ওষুধ। জীবন খোঁড়া শিক্ষাটি পেয়েছে নোশিন।

লাইন কেটে দেয় নোশিন। সাথে সাথে তার বয়ফ্রেন্ডের কথা মনে হয়। বয়ফ্রেন্ডের কুশ্রী মানসিকতার কথা মনে হয়। কষ্ট আবার এসে বুকের মাঝে জমতে থাকে। কত দিনে ভুলবে সে এ যাতনা, জানে না। কিছুই জানে না। বাহিরে অন্ধকার, মনের ঘরেও অন্ধকার জেগে ওঠে।

রূপকের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কারিনা। দরজা ভেতর থেকে আটকানো। দুপুর প্রায় বারোটা। এখনো ঘুম থেকে ওঠে নি ছেলে। নাস্তা খায় নি। বাহির থেকে লক খোলা যায়। খুললে ক্ষেপে যেতে পারে। এজন্য কয়েকবার চাবি নিয়ে দরজার কাছে গেছে কারিনা। না খুলে ফিরে এসেছে।

নাঈমের প্রতি অপ্রতিরোধ্য একটা ক্রেজ কাজ করছে, গত কয়েক বছর চলছে এ অবস্থা। ছেলের প্রতি তো মমতার ঘাটতি নেই। মেয়ের প্রতিও আদরের অভাব নেই। স্বামীর প্রতি টান নেই সত্যি কিন্তু স্বামী ছাড়া তো চলতে পারে না সে। ছেলের প্রতি কী তবে অবহেলা করেছে! এমন মানসিকতা হলো কেন ওর! দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবে। এক সময় ভাবনা থামায়। দরজায় হালকা টোকা দেয়।

ভেতরে কোনো সাড়া নেই। কতোক্ষণ টোকা দিয়ে ফিরে আসে। আবার ফিরে আসে। জোরে দরজায় টোকা দেয়।

না। সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

অস্থির হয়ে ওঠে কারিনা। চাবি দিয়ে লক খোলে। দরজা খুলে অবাক হয়ে ছেলের রুমের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বেঘোরে ঘুমাচ্ছে রূপক। খাটের পাশে লেপের অর্ধেক ঝুলে আছে মেঝেতে। সাধারণ দুটি বালিশ মাথায় ব্যবহার করে। একটি এখন নিচে পড়ে আছে। কোল বালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারে না রূপক। বালিশও পায়ের কাছে ফ্লোরে ঝুলে রয়েছে। বিছানা কোঁকড়ানো। তোষক প্রায় উদোম হয়ে আছে। বালিশের ডান পাশে তোষকের উপর একটি দেয়াশলাই।

টেবিলের দিকে চোখ যায় কারিনার। টেবিলে একটি পাঁচ টাকার কয়েন। কয়েনের একপাশে পোড়া দাগ। পোড়া কালির ছাপ বসে আছে। আগুনের লালচে পোড়া দাগ। মনে হচ্ছে কয়েকটি ম্যাচের কাঠি দিয়ে পুড়িয়েছে কয়েনটি। সিগারেট মোড়ানোর সাদা ঝিলমিলে ফয়েল আছে একটি। ফয়েলেও যেন পোড়া কালি।

এ আবার কি খেলা খেলে রূপক? এমন কাজ তো জীবনে দেখে নি কারিনা। শোনেও নি।

রূপকের পাশে খাটে বসে সে।

মাথায় হাত বুলায়। চুলে ময়লা জমে আছে। শরীর থেকে কেমন দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। মুখের ত্বকের মায়াবি আলো ম্লান হয়ে গেছে। মরচে পড়া মুখর ত্বক দেখছে সে।

এই অবস্থা ছেলের! বুকটা খা খা করে ওঠে। ছেলেকে কি তাহলে অবহেলা করেই চলেছিল এতোদিন!

আস্তে আস্তে চুল টেনে দেয় কারিনা।

গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে ওঠে বসে রূপক।

কো কো গলার ভেতর থেকে ভয় ছুটে আসে। রুমের পর্দা সরিয়ে দিয়েছিল কারিনা। রোদ ঢুকছে রুমে। কড়া রোদ মায়ের মুখের ওপর এসে পড়েছে। চোখ খুলেই মা-র মুখ দেখে রূপক।

ভয়ার্ত ডাক দিয়ে আবার মাথা নামিয়ে নেয়। বালিশের ওপর মাথাটি ছুঁড়ে দেয়।

অনেক কষ্টে আবার চোখ খোলে।

আবার দেখে মাকে। এবার স্পষ্ট দেখতে পায়। রোদের আলো মায়ের মুখের একটি লম্বা ছায়া ফেলে দেয়। মনে হয় এটি মা নয়। মনে হয় অন্য কোনো নারী। মনে হয় ডাইনী। মনে হয় দানবী।

হাত দিয়ে ঝাপটা মারে সে। মায়ের হাত দূরে সরিয়ে দেয়। অস্পষ্ট আওয়াজ দিয়ে ওঠে। চোখ বন্ধ করে হাতের মুঠি শক্ত করে ধরে। দাঁতে দাঁত চেপে ক্রোধ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে।

কারিনা ভয়ে সিটিয়ে যায়। এমন করছে কেন ছেলে? মা-র জন্য কি কোনো শ্রদ্ধা নেই, সম্মান নেই? কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে রূপক?

কতোক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে কারিনা। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। ধৈর্য্য হারায় না। আবার হাত দিয়ে ছেলের চুলে আঙুল বোলাতে চেষ্টা করে।

আবার চিৎকার করে ওঠে রূপক, সরো?

কারিনা চুপসে সরে বসে।

রূপক চোখে খুলে মাকে দেখার চেষ্টা করে। চোখের পাতায় ভেসে ওঠে দু'মাস আগে দেখা একটি দৃশ্য ঃ

ধানমন্ডির লেকের পাড়ে রবীন্দ্র সরোবরের সামনে বসেছিল সে। সাথে ওর

গার্লফ্রেন্ড মনা। ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়ায় রাস্তার পাশে হাঁটু সমান ইটের দেয়ালে বসে ফুসকা খাচ্ছিল ওরা। রোড এখান থেকে বাঁক নিয়ে ডান দিকে চলে গেছে। মোড়ে জ্যাম লেগেছে। হঠাৎ চোখ যায় একটি গাড়ির ভেতর। সামনের সীটে বসে আছে একজন মাঝ বয়েসী মহিলা এবং একজন পুরুষ। মহিলাটিকে চেনাচেনা লাগছে। পুরুষটি ড্রাইভিং সীটে বসে তার বাম হাতটি মহিলাটির কাঁধে তুলে দিয়েছে। রূপক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, লোকটি আলতোভাবে মহিলাটির কাঁধে চাপ দিচ্ছে। অকস্মাৎ লোকটি মহিলাটিকে কাছে টেনে গালে চুমু দিলো। মহিলাটি কপট লাজুক হেসে একটু বামে মুখ ঘুরাতেই রূপক চিনতে পারলো। না, তিনি কোনো অচেনা মহিলা নন। খুব চেনা। ওর জন্মদাত্রী মা।

হাহাকার করে ওঠে বুকে। মাথায় যেন জেএমবির উদ্ভত বোমা বিস্ফোরিত হলো। জেটের গতিতে কানের ভেতরের পর্দায় সহস্র মাইল বেগে আঘাত হানে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ। প্রায় পড়ে গিয়েছিল রূপক। টাল সামলে আবার উঠে দাঁড়ায়।

জ্যাম ছুটে গেছে। গাড়ি দ্রুত বাঁক নিয়ে ডান দিকে চলে গেছে।

মনা বলে, একি এমন লাগছে কেন তোমাকে?

রূপক বলে, আমাকে ধরো। আমাকে এই ইটের দেয়ালের ওপর শুইয়ে দাও।

মনা ওকে ধরে শুইয়ে দেয়।

মনা দ্রুত একটা পানির বোতল আনে। মুখ খুলতে পারছে না সে। তাড়াহুড়োরজন্য বোতলের মুখ খুলছে না।

রূপক বলে, পানি দাও, পানি।

মনা বলে, বোতলের মুখ খুলছে না।

রূপক চোখ খোলে। চোখ আকাশের দিকে, পড়ন্ত বিকেলের আকাশ কতো পরিচ্ছন্ন। কতো শুভ্র। কত সুন্দর। সাদাসাদা উড়ন্ত মেঘের কোলে নরম রোদের কী সুন্দর খেলা।

মুখ বন্ধ থাকুক মনা। বোতলের মুখ খুলো না। আমার জীবনের মুখ বন্ধ হয়ে যাক। শেষ হয়ে যাক। পানি দিও না। বোতল খুলো না। বিড়বিড় করে বলে রূপক।

বোতলের মুখ খুলতে সক্ষম হয় মনা, পানি দিয়ে মুখ দুইয়ে দেয়। মাথাটি তুলে বলে হা করো।

রূপক হা করে। পানি পান করে। অর্ধেক পানি পান করে চোখ বোজে আবার।

ঘটে যাওয়া ঘটনাটি থেকে চোখ ফিরে আসে বর্তমানে। নিজের বেডরুমে মা-র দিকে চোখ যায় তার। মা পাশে বসে আছে। মুখে ভয়। ভয়ে জড়োসারো হয়ে আছে।

ঠাণ্ডা মাথায় রূপক বলে, উঠে যাও। আমার রুম থেকে বের হয়ে যাও তুমি। আমার বাগ্দত্তী মনা আসবে। ও এলে আমার রুমে পাঠিয়ে দিও। আমি আর একটু ঘুমাই।

বাগ্দত্তী নিয়ে আসবে রুমে? এটা কি ঠিক?

কেন ঠিক না? কেন? আমার বাগ্দত্তী আমার রুমে আসবে। একশো বার আসবে। তুমি যাও। যাও। চিৎকার করে ওঠে রূপক।

কারিনা রুম থেকে বেরিয়ে আসে। আম্মা হিম হয়ে গেছে। ছেলের একি পরিণতি? এ কিসের আলামত। কিছুই বোঝে না সে।

কিছুক্ষণ পর আসে মনা। কলিং বেলে টিপ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নিচে থেকে দারোয়ান আগেই মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে।

কারিনা কীহোলে দিয়ে দেখে।

অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালো গরম কাপড়ের ওপর উজ্জ্বল সবুজের চেক শার্ট। কালো ট্রাউজারের সঙ্গে কালো কেডস্ পরেছে মেয়েটি। দারুন স্মার্ট। চিকন দেহ। কটি মুখ। কাঁধে একটি চামড়ার ক্যাজুয়াল ব্যাগ।

দরজা খুলে পাশে দাঁড়ায় কারিনা।

আমি মনা। রূপকের ফ্রেন্ড। রূপক আসতে বলেছিল। তাই এলাম। ও কি ভালো আছে?

কারিনা কোনো কথা বললো না। মেয়েটিকে দেখে ভালো লাগছে। তবুও ছেলের বেডরুমে একটি মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া শোভন মনে হয় না তার। করার কিছু নেই। মনাকে রূপকের বেডরুমে দেখিয়ে দেয়।

মনা আসার সাথে সাথে ওঠার চেষ্টা করে রূপক। পারে না।

মনাকে বলে, দরজা লাগিয়ে দাও।

মনা বলে, দরজা লাগানো কি ঠিক হবে?

লাগাও, দরজা লাগাও মনা। আমাকে ভয় পাচ্ছো?

না। তোমাকে ভয় পাবো কেন? দীর্ঘদিন তোমার সাথে মিশি। ভয়ের তো কিছু তোমার মধ্যে দেখি নি।

তাহলে দরজা লাগাও।

মনা এবার দরজা লাগিয়ে দেয়। ফিরে আসে।

আমাকে ধরো। বাথরুমে যাবো। আমি গোসল করবো।

রূপক কী হয়েছে তোমার? কিসের এতো কষ্ট?

আমাকে গোসল করতে দাও। আর কথা বাড়িয়ো না।

রূপক যা বলছে মনা তাই করছে।

গোসলের পর কাপড় পরে। পরিষ্কার কাপড় পরে খাটে এসে বসে। মনা চেয়ারে বসে আছে।

বলো তোমার কষ্টের কথা বলো। মনা বললো।

রূপক কিছুই বলে না। মনার হাত দু'হাতের মাঝখানে চেপে ধরে চুপচাপ বসে থাকে। ভালো লাগছে। ভীষণ ভালো লাগছে তার। কোথেকে আসছে ভালো লাগা?

কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল মনা। থামিয়ে দেয় রূপক।

কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বসে থাকো চুপচাপ।

আমি পুরুল নাকি? কথা বলবো না, কোনো কাজ করবো না। চুপচাপ বসে থাকা কি সম্ভব?

বসে থাকো প্লিজ। তুমি বসে থাকলে আমার শক্তি। আর একজনকে শক্তি দেওয়া হবে।

কাকে শক্তি দিতে চাচ্ছো?

বলতে চাচ্ছি না তোমাকে। শুনতে চেও না।

আচ্ছা শুনতে চাইবো না, দরজা খোলা রাখি। দরজা বন্ধ রাখলে আমি কী ভাববে?

যা ভাববে ভাবুক।

ছিঃ। অবান্তব আচরণ করো না। অশোভন লাগছে, দরজা খুলে দেই আমি।

না। দরজা খুলবে না। ধমক দেয় রূপক।

আমাকে ধমক দিচ্ছো? মনা বললো।

না। তোমাকে না। নিজেকে নিজে ধমক দিচ্ছি। তোমাকে ধমক দেওয়ার অধিকার নেই আমার। যোগ্যতাও নেই। জানি।

এ আবার কি কথা। যোগ্যতা নেই কেন?

নেই। নেই। আমি জানি। আমি আমাকে চিনি। আমি নিজে একটা বাজে ছেলে। বাজে ছেলে বাজে আচরণ করবে। এটাই স্বাভাবিক।

নিজেকে বাজে বলছো কেন?

তুমি আমাকে কতোটুকু চেনো? রূপক বললো।

যতটুকু জানি, ততোটুকুতে তুমি অসাধারণ। তোমার মেজাজটা মাঝে মাঝে চটে যায়। এছাড়া খারাপ কিছু তো দেখি নি।

খারাপ আছে। ধীরে ধীরে জানতে পারবে। আমি সিগারেট টানি, জানো?

জানি তো। সিগারেট আমার পছন্দ নয়। এটা ছেড়ে দিলে আমি খুশি হবো।

কেন? ছেড়ে দেবো কেন?

আমার জন্য ছাড়বে? আমি পছন্দ করি না। এ কারণে ছাড়বে।

তুমি আমার কে?

আমি তোমার ফ্রেন্ড। ফ্রেন্ডের জন্য সিগারেট ছাড়তে পারবে না?

পারবো না।

পারার চেষ্টা করলে পারবে।

আমি চেষ্টা করবো না। নিজেকে শেষ করে দেবো। নিঃশেষ করে দেবো।

মনা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রূপকের দিকে। যাচাই করার চেষ্টা করছে রূপকের কথার গভীরতা। নিজের মনে রূপকের জন্য একটু একটু ভালোবাসা জমা হচ্ছে। বুঝতে দেয় না তাকে। সমবয়সীদের ভালোবাসা টেকে না। সফল হয় না। বড়দের থেকে এ ধরনের কথা শুনে আসছে। শুনলেও মন মানে না। মন রূপকের জন্য যেন কেমন করে। কেমন করার সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই। ও ভালো চায়। রূপকের ভালো চায়। রূপকের অনেক গুণ আছে। ভালো ক্রিকেট খেলে। দুর্দান্ত খেলে। রূপক যখন ছক্কা পেটায় মাঠের পাশে বসে মনা তখন খেলা দেখে। মনে হয় এটি তার ছক্কা। বুকের ঘরের ছক্কায় আনন্দ উথাল পাতাল ঢেউ তোলে। নিজের গোপন টান বুঝতে দিতে চায় না। সেই রূপক নিজেকে শেষ করে দিতে চায়। কেনো? সে কি কোনো খারাপ কাজে জড়িয়ে গেছে? ক্রাইম করছে? ওর দলের ছেলেরা তেমন ভালো না। ওদের সাথে না মিশেও উপায় নেই। মিশতে হয়। খেলতে হয়। রূপকের মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে মনা।

দেখো রূপক তুমি পড়ালেখায় ভালো না। একেবারে ফেলনাও না। সবাই পড়ালেখায় ভালো হবে, এমন কথা খাটে নাকি? তুমি খেলায় ভালো। দেখবে একদিন জাতীয় দলে খেলবে তুমি। জীবনে শাইন করবে। নিজেকে শেষ করে দিতে চাও? এ কেমন কথা! মনার স্বরে বিস্ময়। বিস্ময়ের গহীনে লুকিয়ে আছে শংকা। শংকার সাথে মিশে আছে অচেনা এক ভালো লাগার গোপন প্রলেপ।

তুমি তো আমার ফ্রেন্ড। ব্রেক ফ্রেন্ড। আমাকে আশাবাদী করে তুলতে চাও কেনো? আমার আশার আলো শেষ। আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছে শেষ, স্বপ্ন শেষ।

মনা নড়ে বসে। কাজুয়াল ব্যাগটির ভেতর থেকে লেদারের ছোট একটি পার্স বের করে। পার্সের ভেতর থেকে বের করে ছোট্ট একটি মাল্টি ইউজ নেইল কাটার। নেইল কাটারের বোতাম টিপে বের করে ছোট্ট একটি ছুরির ফলা। ডান হাতের সামনে তুলে ধরে। রূপকের দিকে বাড়িয়ে বলে, নাও এটা নাও। তোমাকে শেষ করার আগে আমার বুকে এটা বসিয়ে দাও। তারপর নিজেকে শেষ করো। ঠাণ্ডা স্বর। শীতল অভিব্যক্তি।

রূপক এবার কঠিন এক ঝাঁকি টের পায়। নিজের ভেতর থেকে আসে মৃদু কম্পন। মনার দিকে চোখ তুলে তাকায়। সরল শীতল চাহনি চোখে। বয়সের তলে কী জমা আছে বুঝতে পারে না। বোঝে মনা তার ভালো বান্ধবী। ফ্রেন্ড বান্ধবী। তবে কি মনা তাকে ভালোবাসে? কখনও তো ভালোবাসার কথা বলে নি। গায়ে পড়া স্বভাব কখনো ওর মধ্যে দেখে নি। এমন করে বললো কেন সে? সব সময়ই বলেছে আমরা সমবয়সী ফ্রেন্ড। কেবলই ফ্রেন্ড। ফ্রেন্ডের জন্য কি ফ্রেন্ড এমন উক্তি করতে পারে?

উঠে দাঁড়ায় রূপক। মনার কাঁধে হাত রাখে। ঝাঁকি দেয়।

মনা। আমাকে তুমি ভালোবাসো? এমন কথা বললে কেন?

আমি তোমাকে ভালোবাসি না। আমি তোমার ভালো চাই। তোমার খারাপ কিছু সইতে পারি না। কেউ তোমাকে নিয়ে কটূক্তি করলে আমার কষ্ট হয়। কষ্ট। মনার স্বরে কাঁদো কাঁদো ভাব। কাঁদছে না। চোখ পানিতে টলমলো। চোখ থেকে পানি ঝরছে না।

সর্বনাশ মনা! মনে হয় ভেতরে ভেতরে তুমি আমাকে ভালোবাসো।

মনা এবার চিৎকার করে ওঠে। না ভালোবাসি না। ভালোবাসি না। চিৎকার করে কেঁদে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে বলে তোমার ভালো চাই। শুধু ভালো চাই। এর নাম ভালোবাসা না। তুমি আমার কাছ থেকে ভালোবাসা চেও না। নিজের গহীন কোণে শেকড় গেড়ে বসা রূপকের জন্য ভালোবাসা লুকিয়ে রাখতে চায় সে।

মনার পাশে দাঁড়ায় রূপক। ওর মুখটা দু'হাত দিয়ে তুলে ধরে। মনার চোখে পানি। ওর জন্য কেউ কাঁদতে পারে জানা ছিল না। অবাক হয় রূপক। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে কেবল। অন্য একটি মনাকে দেখে।

ভেবেছিলাম আমাকে কেউ ভালোবাসে না। বাবা না, মা না, রুনি না। কেউ ভালোবাসে না। ভেবেছিলাম আমি মূল্যহীন। ছোট বেলা থেকে বাবা মার ঝগড়া, অশান্তি দেখে বড় হয়েছি। বাহিরে বাহিরে ঘুরেছি। কারোর সাথে মিশতে পারি নি ভেবেছিলাম আমি ভালোবাসা পাওয়ার অযোগ্য। অযোগ্য আমি। অনেক খারাপ পথে নেমে গেছি। নিজের অজান্তে নেমে গেছি। সর্বনাশ মনা! আমাকে ভালোবেসো না। আমার ভেতর ভালোবাসা নেই। তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারবো না। সব পুড়ে গেছে। সব ঝলসে গেছে। সব ছাই হয়ে গেছে। বলতে বলতে রূপক শক্ত হয়ে ওঠে। দেহের ভেতর অন্য রূপক মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। মনের কোমল অনুভূতি কঠোর হয়ে ওঠে। মনার উপস্থিতি ভুলে যেতে থাকে।

থাকে। বাহিরে বেরুনোর জন্য কাপড় পরতে থাকে সে।

মনার কষ্ট থেমে যায়। সামনের রূপকের মন বদলে যাচ্ছে বুঝতে পারে। চোখের চাউনি বদলে যাচ্ছে বুঝতে পারে। ক্রমশ রূপক অচেনা হয়ে উঠছে, বুঝতে পারে। ঘরে আলো আছে। এখন দুপুর। পর্দা সরানো রুমে আলোয় ভরা, তবুও মনে হচ্ছে রূপকের মুখ চেনা লাগছে না। অন্য একটি ছেলে যেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে। টিউব লাইটের সুইচ টিপে সে। আলো জ্বালে। না আসল রূপককে চেনা লাগছে না। ক্রমশ বদলে যাচ্ছে সে। বাহিরে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করছে। হাত কাঁপছে। দেহ কাঁপছে। ধীরে ধীরে কাঁপুনি বেড়ে যাচ্ছে।

মনা দ্রুত ফিরে আসে বাস্তবে। আবেগের ঘোড়ায় চরে বসেছিল। চড়ে টের পেয়েছে নিজেকে। প্রকাশ না করলেও বুঝেছে সে রূপককে ভালোবাসে।

এখনকার রূপককে নয়। এই রূপকের ভেতর যে রূপক আছে তাকেই ভালোবাসে। সেই রূপককে বাঁচাতে হবে। ফেরাতে হবে।

তোমার কি খারাপ লাগছে?

কথা বলছে না রূপক। কী যেন খুঁজছে। খুঁজে পাচ্ছে না।

মনা। তোমার কাছে টাকা আছে? পরিবর্তিত স্বরে কথা বলছে রূপক।

কেন টাকা দিয়ে কী করবে?

শরীর খারাপ লাগছে। ওষুধ কিনতে হবে। ওষুধ খেলে ভালো লাগবে। টাকা দাও। মিথ্যা অজুহাত দেখায় রূপক।

আন্টিকে বলো। উনি ডাক্তার দেখাবেন।

না। ওকে বলার দরকার নেই। তোমার কাছে টাকা থাকলে দাও। এক্ষুনি বাইরে যেতে হবে আমাকে।

আমার কাছে অল্প টাকা আছে। মাত্র দু'শো আছে।

তাই-ই দাও।

মনা ব্যাগে টাকা খুঁজছে।

দ্রুত করো। টাকাটা দাও।

ব্যাগ থেকে টাকা বের করে হাতে দেয় মনা। ছোঁ মেরে টাকা নিয়ে নেয় রূপক, নিয়েই মনাকে কিছু না বলে দরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

মনা অবাক হয়ে ওর চলে যাওয়া দেখে। ওকে সে আসতে বলেছে। বলেছে কাকে যেন শাস্তি দেবে। নাম উল্লেখ করে নি। অনুচ্চ নামের আড়ালে ভয়াবহ কষ্ট জমে আছে রূপকের। টের পেয়েছিল সে। বুঝতে পারে নি কষ্টের ধরনটি।

কাকে কষ্ট দেবে? কেন কষ্ট দেবে? তবে কি নিজেকে নিজেই কষ্ট দেবে? কি

যন্ত্রণা তার বুকে পেঁথে আছে। খুঁজে বের করতে হবে। ওর যন্ত্রণার শেকড় উপড়ে ফেলতে হবে। নইলে নষ্ট হয়ে যাবে, পচে যাবে রূপক।

না। কিছুতেই ওকে নষ্ট হতে দেবে না। কিছুতেই ওকে পচতে দেবে না। কিছু একটা করতে হবে। মনে মনে ভাবে মনা।

ওদের ড্রয়িং রুমে এসে দাঁড়ায় মনা। একা দাঁড়িয়ে থাকে। এ সময় কারিনা এসে সামনে দাঁড়ায়।

আন্টি! নরম করে ডাক দেয় মনা।

কারিনা কিছুই বলতে পারে না। চোখ তুলে মনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

মনে হচ্ছে রূপকের ভয়াবহ কোনো সমস্যা হয়েছে। মনে হচ্ছে ও খুব যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যন্ত্রণার কথা কিছুই বলতে পারছে না।

আমারও তাই মনে হয়। কারিনা বললো। বুঝতে পারছি না কী হয়েছে।

আন্টি! মনে হয় ওকে একটু বেশি বেশি সময় দেওয়া উচিত।

ওতো আমাকে দেখতেই পারে না। বাসায় থাকে না। টাকা নিয়ে চলে যায়। টাকা না দিলে চিৎকার করে। গালাগাল দেয়। আমি তো ওকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। আমার জন্য ওর কোনো মমতা নেই।

এড়িয়ে চললে হবে না। আরো ঘনিষ্ঠ হতে হবে। আরো সহনশীল হতে হবে। ওর কথা বুঝতে হবে। ওর ভেতরটা জানতে হবে। জানতে না পারলে ওর উপকার করতে পারবো না আমরা। মনা বললো।

মা। লক্ষ্মী মা। তুমি কোন দেবী মা! আমার ছেলের এভাবে মঙ্গল চাচ্ছো। তুমিই হেলপ করো আমাদের, করবে মা?

মনার মন একদম নরম হয়ে যায়। মা ডাক তার মনের গহীনে ঢুকে যায়। একদম গহীনে। ভেতরের কোমল ঘরে মা-এর স্থান। জন্মের সময় নিজের মা মারা গেছে। মা-র ভালোবাসা পায় নি সে। মা ডাক শুনে ভেতরে ঘোমটা ছেড়ে আপন মা যেন সামনে এসে দাঁড়ায়।

কারিনার হাত চেপে ধরে মনা। ভেবেছিলাম আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন। ছেলের রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে বসেছিলাম। ভেবেছিলাম আমাকে খারাপ মেয়ে ভাববেন। রূপককে খারাপ ছেলে ভাববেন। আমার ভাবনা ভুল হয়েছে। আপনি কতো ভালো। আমি অবশ্যই ওকে ভালো করে তুলতে আপনার পাশে থাকবো। ও আমাকে কষ্টের কথা বলবে বলেছিল। রুমে আসতে বলেছিল। বলতে পারে নি। তাড়াহুড়ো করে বাহিরে চলে গেল। ধীরে ধীরে কেমন যেন ঘোরের মধ্যে

চলে যায় সে। ঘোরে থাকা অবস্থায় ছুটে বেরিয়ে যায়। আমার পার্সে দু'শো টাকা ছিল। ওই টাকাটা ও নিয়ে যায়।

মনা কথা শেষ করে চিন্তিত মুখে ভাবতে থাকে। ওর বন্ধু অনিকের হেলপ নিতে হবে। জেনে নেবে মূল সমস্যা কোথায়।

কারিনা বুকে জড়িয়ে ধরে মনাকে।

ঐশ্বরিক এক আনন্দধারায় ভরে যায় মনার মন। কারিনাও যেন বুকে তুলে নিয়েছে মৌলিক সুখ। শুদ্ধতম সুখ। মৌলিক সুখের সন্ধান পেয়েছে। সন্তানের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য ভাবতে গিয়ে যে ভিত রচিত হয় মনে, তার চেয়ে শুদ্ধতম আর কিছু হতে পারে না। এতোদিনকার পরিবর্তিত কারিনার ভেতর থেকে আসল কারিনা ফিরে আসে। মমতার ক্ষুধা মমতা দিয়ে মেটাতে হয়। মাতৃত্বের ক্ষুধা এখন তীব্র। তীক্ষ্ণ।

এই ক্ষুধা মেটাতে নিজের নৈতিকতার বাঁধ শক্ত করতে হবে। বুঝতে পারে কারিনা।

এমন সময় রুনি আসে, মূল দরজা পেরিয়ে ড্রয়িং রুমে ঢুকে।

ঢুকেই দেখতে পায় চমৎকার দৃশ্যটি। নির্নিমেষ দাঁড়িয়ে থাকে । মা কাঁদছে। একটি অপরিচিত মেয়ে মা এর বুকে পরম মমতায় মাথা রেখেছে। চোখ বেয়ে নামছে অশ্রু কণা।

রুনির উপস্থিতি টের পেয়ে দু'জনের মাঝে পরিবর্তন আসে। কারিনা সামনে এগিয়ে এসে বলে, রুনি ও হচ্ছে মনা। তোর ভাইয়ার বান্ধবী।

ভাইয়ার বান্ধবী! চিৎকার দিয়ে ওঠে রুনি।

মায়ের হাত থেকে মনাকে ছাড়িয়ে নেয়। ঝাঁপিয়ে ধরে কপালে একটা চুমু বসিয়ে দেয়।

রুনির উচ্ছ্বাসে কারিনা ব্যালেন্স হারিয়ে পরে যাচ্ছিল। খপ্ করে আবার ধরে ফেলে কারিনা।

কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হাত ধরে নিজের রুমে নিয়ে আসে।

তুমি ভাইয়ার বান্ধবী?

হুঁ। মনা বলে।

ভাইয়ার বান্ধবী আছে?

হুঁ। আছে। আবার মাথা নাড়ে মনা। হাসে।

ভাইয়া তোমাকে লাভ করে?

জানি না। মনা বলে।

সাথে সাথে রুনির মুখ কালো হয়ে যায়।

তুমি ভাইয়াকে লাভ করো?

হাসে মনা। মুখে কোনো জবাব দেয় না। হাসিতে বোঝা যায় সে লাভ করে।

আবার উল্লসিত হয়ে ওঠে রুনি।

নিজের রুমে এলে দম বন্ধ হয়ে আসতো। বাসায় থাকতে ইচ্ছে হতো না। ভাইয়ার জগতে কখনো ঢুকতে পারে নি। ভাইয়ার আদর পাওয়ার জন্য মন মুখিয়ে থাকতো। ভালো করে কথা বলে না ভাইয়া। উঠতে বসতে বকা দেয়। সেই ভাইয়ার বান্ধবী আছে।

মনে জোয়ার আসে। আনন্দের জোয়ার। বাসাটাকে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আনন্দপুর। আনন্দপুরে কেবল আনন্দ। নিজের রুমটিকে মনে হচ্ছে স্বপ্নপুরী। স্বপ্নপুরীতে কেবল রঙীন স্বপ্নের গোলাপ। লাল, নীল, গোলাপ।

উহ্! অসহ্য সুন্দর। এতো সুন্দর পৃথিবী! এতো সুন্দর!

আমার কোনো কষ্ট নেই। দুঃখ নেই। আমার বুকে আনন্দ। কেবলই আনন্দ। যে কোনো কষ্ট সামলানোর শক্তি আমি পেয়ে গেছি।

আনন্দের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে মোবাইল সেট অন করে সে।

মনাকে মা-র হাতে তুলে দিয়ে নোশিনকে ফোন করে।

হ্যালো, নোশিন বলছি।

নোশিন, শোন। মজার খবর আছে।

কী খবর? নোশিনের কণ্ঠে বিষাদ। নিরাসক্ত প্রশ্ন।

আমার ভাইয়ার গার্ল ফ্রেন্ড আছে। গার্ল ফ্রেন্ড ভাইয়াকে লাভ করে।

নোশিনের বিমর্ষ মনে টোকা খায়। একটু কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তোর ভাইয়া কি গার্ল ফ্রেন্ডকে লাভ করে?

অবশ্যই। জোর দিয়ে বলে রুনি।

তোর ভাইয়ার মনে লাভ থাকতে পারে?

অবশ্যই? রুনি আবারো জোর দিয়ে বলতে থাকে।

তাহলে তো বলা যায় সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠেছে আজ।

ডেফিনিটলি। চিৎকার দিয়ে ওঠে রুনি।

তোর মন তো তাহলে ভালো হয়ে গেছে। আমাকে আর দরকার নেই।

দরকার নেই, তোকে না। ওই যে বলেছিলি কি খাওয়াবি মাদক জাতক। ওটার আর দরকার নেই।

ওঃ। আচ্ছা। মন খুশী থাকলে দুঃখ তোলার জন্য কিছু গিলতে হবে না।

দানব মারার জন্যে কিছু খেতে হবে, এই কথা?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওটা খারাপ পথ। ন্যাচারাল সেনসেশন ভোলার জন্য খারাপ পথে নেমে যাওয়া বোকামী।

ঠিক আছে। দরকার নেই।

থ্যাংকস্। রুনি বললো।

থ্যাংকস্ দিয়ে কি সব শেষ করা যায়? আমার তো দুঃসংবাদ আছে। আমার আরো কষ্ট আছে।

কী কষ্ট আবার?

আম্মু, রাগ করে নানুর বাড়িতে চলে গেছে।

বলিস কি? রাগ করলো কেন?

বাবার ওপর রাগ করেছে, কঠিন রাগ। মনে হয় এ রাগ ভাঙবেনা। মনে হয় ওরা আলাদা হয়ে যাবে।

চুপ বেয়াদপ। মা-বাবাকে আলাদা হতে দিবি কেন?

বেয়াদপির কি হলো?

বেয়াদপি হচ্ছে ভেঙে পড়া, কেন ভাঙবি? দুটো এক করে দে আবার।

বাবাকে ঘৃণা লাগছে।

তোর মনেও বাবার জন্য ঘৃণা?

না। আসলে বাবাকে না। বাবার মধ্যে যে পুরুষটি লুকিয়ে আছে তাকে ঘৃণা লাগছে। নোশিন যোগ করলো নিজস্ব উপলব্ধি।

কেন রে?

বাবা পরকীয়া করছে। মা'র ঘনিষ্ঠ কার সাথে যেন পরকীয়ার জড়িয়ে গেছে। প্রমাণ পেয়েছে মা।

তোর বাবাও!

হ্যাঁ। আমার বাবাও। বিশ্বাস হচ্ছে না। তবুও বিশ্বাস করতে হচ্ছে।

রুনি থমকে যায়। কতোক্ষণ ভাবে নোশিনের কথা। তুই ভালো একটি শব্দ ব্যবহার করেছিস। ভালো লাগছে শুনে।

এখানে ভালো লাগার কি আছে? নোশিন অবাক হয়।

'বাবার মধ্যে যে পুরুষটি লুকিয়ে আছে তাকে ঘৃণা লাগছে।' এই কথাটি ভালো লেগেছে। আসলে তুই বাবাকে ভালোবাসিস।

বাসি। একশোবার বাসি। হাজার বার বাসি। বলতে বলতে নোশিন কেঁদে দেয়।

নোশিন, শোন লক্ষী। আমিও আমার বাবাকে ভালোবাসি। বাবার ভেতর যে ভয়াবহ পুরুষ সত্তা লুকিয়ে আছে তাকে আমিও ঘৃণা করি। দুই আর দুই, আমরা আসলে একই সূতোয় বাঁধা। কোন নিহতি আমাদের চালায় জানি না, শক্ত হও। শক্ত হয়ে আন্টিকে নিয়ে আয়।

কথা শেষ করে লাইন কেটে দেয় রুনি। বাবা মায়ের কথা মনে পড়ে। আদরের কথা মনে পড়ে। বাবা আর বাবার পুরুষ সত্তা এক নয়। অজানা। দুটোকে একত্রে মিশিয়ে কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

মন আবার ভালো হয়ে যায়। ড্রয়িং রুমে এসে আবার মনাকে ধরে। নিজের রুমে নিয়ে আসে। উল্লাসে ফেটে পরে সে।

কারিনা ডীপ ফ্রিজ থেকে স্পেশাল আইটেম বের করে। আজ মনাকে না খাইয়ে বিদায় করবে না তারা।

আজ বাসায় সুখ এসেছে। অনেকদিন পর একটি সুখ পাখি এসে সবার মন খুশিতে ভরে দিয়েছে।

বিষাদে ডুবেছিল দিন, আঁধারে ডুবেছিল ঘরের সময়। ঘরের আঁধার কেটে যাবে। আলো আসবে, আলো। ভাবতে ভাবতে নিজের মোবাইল থেকে সীমটি খুলে নেয় কারিনা। টয়লেটের কমোডে ফেলে ফ্লাশ করে দেয়। এই সীমটিই যতো নষ্টের গোড়া। সীমই অন্য পুরুষের কণ্ঠ নিয়ে হাজির হয় বেডরুমে। বেডরুমে এসে মনে দোলা দেয়। জৈবিক দোলা। মানসিক দোলা। এই দোলায় সুখ নেই। বিশৃঙ্খলা বাড়ে, বুঝতে পারে কারিনা। সুখের জন্য প্রয়োজন নৈতিক শক্তি। নিজেদের ভুলত্রুটি কাটিয়ে উঠতে এই শক্তি গোপনে প্রাণ সঞ্জীব করে। মন সজীব করে। এমন সজীবতাই এখন কাম্য।

মনার কছে ফিরে আসে কারিনা।

মনাকে খাটে বসিয়ে দেখছে রুনি। ওর আহলাদে বাধা দিচ্ছে না মনা। যা বলছে তাই করছে। হাসছে। স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। হঠাৎ এমন উল্লাস পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় মনা।

কারিনা বলে, কী খাবে মনা? কী পছন্দ তোমার।

আন্টি। এখন খাবো না আমি। আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। আপনাদের আদর পেয়ে থেকে যেতে ইচ্ছে করছে। তবুও যেতে হবে।

যাবে। অবশ্যই যাবে। বাসায় ফোন করে দাও। একটু দেরী হবে। খেয়ে যাবে। কী কী পছন্দ বলো।

আমার মা নেই। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি। বাবা-ই আমার মা। বাবা-ই আমার বন্ধু। দুপুরে আমরা একসাথে খাই। শত ঝামেলা থাকলেও বাবা বাহিরে খাবে না। বাসায় আসবে। আমাকে নিয়ে খাবে।

শুনে মন ভরে যায় কারিনার। কী মায়াবতী মেয়েটি! কী লক্ষী মেয়ে! এমন মেয়েকে কাছ ছাড়া করতে ইচ্ছে করে না।

রুনি বলে, আমাকে বাসার নম্বর দাও। আংকেলকে ফোন করি। আজকের দুপুরটা ধার নিয়ে নেই। আজ তোমাকে ছাড়ছি না।

রুনির আবদার ফেলতে পারে না। বাবার মোবাইল নম্বরটি দেয় সে। এই নম্বরে ফোন করো। বাবা বোধ হয় এখন বাসার পথে। গাড়িতে।

কীভাবে বুঝলে যে গাড়িতে?

হাতের ঘড়িটি তুলে ধরে মনা। বলে, ঘড়িতে এখন দুটো পঁচিশ। দুটো ত্রিশে বাসায় পৌছুবে বাবা।

কারিনা বলে, সব হিসেব করা? হিসেবের গরমিল হয় না?

হয়। মাঝে মাঝে গরমিল হয়। জরুরি কাজে গরমিল ঘটে। সেটা আমরা ফোনে আলাপ করে নেই।

তাহলে তো হলোই। আজ গরমিল হোক। তোমাদের গরমিল আমাদের জন্য আনন্দের মিলনআন্তক। এই মেলা দিয়ে ওই কষ্ট পুষিয়ে নাও।

রুনি জোরালোভাবে বললো এবার।

ঠিক আছে। বাবাকে ফোন করো।

রুনি ল্যান্ডফোন থেকে ফোন করে।

হ্যালো। কে বলছেন প্লিজ। মনার বাবা আহসান সাহেবের ভারী গলা ভেসে আসে।

জ্বি। চিনবেন না আমাকে। আমি মনা'পার ঘনিষ্ঠ একজন বলছি। বলতে গিয়ে চোখ তুলে মনার দিকে তাকায়। ঠোঁট নাচিয়ে চোখ ঘুরিয়ে মনাকে আকার ইঙ্গিতে জানতে চায়, ঠিক বলছি না?

কী নাম তোমার?

আমার নাম রুনি।

কী খবর বলো। মনার কোনো খবর আছে?

জ্বি আছে। মনা'পাকে আজ দুপুরে আমাদের বাসায় খাওয়ার জন্য ধরেছি। তিনি খাবেন না। আপনার কাছে চলে যেতে চান। প্লিজ আংকেল, আজকের দুপুরটা আমাদের ধার দিন?

রুনির কথার ধরন শুনে গলে যান আহসান সাহেব।

মনা কি তোমার পাশে আছে?

জ্বি আছে।

দাও। ওকে দাও।

মনার হাতে রিসিভার তুলে দেয় রুনি। নাও। আংকেল তোমার সাথে কথা বলবেন।

আহসান সাহেবের সংলাপ আর শুনতে পায় না রুনি। তাকিয়ে আছে মনার মুখের দিকে।

থ্যাংকইউ বাপি। আই লাভ ইউ বাপি। মনার মুখে ঝলসানো হাসি ফুটে ওঠে। ওই হাসির অর্থ বুঝতে পারে রুনি। আংকেল রাজি হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হয় না। ঝপ করে মনাকে জড়িয়ে ধরে। গালে একটা চুমু বসিয়ে দেয়।

লাফাতে লাফাতে নিজের রুমে আসে রুনি। এসেই চুপ হয়ে যায়। বাবার সাথে মনার সুন্দর সম্পর্কটি টের পায় সে। কী সুন্দর করে বললো, 'আই লাভ ইউ বাপি'। সে তো কখনো এমন করে ওর বাবাকে বলে নি।

বাবার ভালো রূপও তো দেখেছে, খারাপ রূপ তাকে এমন কুঁকড়ে দিয়েছে কেন? বাবার খারাপটা উপড়ে ফেলতে হবে। মনে মনে ভাবে বাবাকে ভালোবাসা দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। ঘৃণা করলে আরো দূরে সরে যাবে। এমন বাবা আর কোথায় পাবে সে? ভাবতে গিয়ে চোখে পানি চলে আসে।

এ সময় মনা রুমে ঢোকে। রুনির চোখের পানি দেখে ফেলে সে। এই দেখেছে উল্লাস, এখনই দেখছে কান্না।

মনা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রুনির দিকে।

মনাকে দেখে আবার স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে। চোখের পানি মোছে। মুছে জোর করে মুখ টিপে হাসে রুনি।

হাসির অন্তরালে চাপা দিতে চায় কষ্ট। ভয়াবহ কষ্ট চাপা দিয়ে সহজ হতে চায়।

মনা কোনো প্রশ্ন করে না। রুনির হাত ধরে চুপচাপ বসে থাকে।

রুনি নিজের কষ্ট চেপে রাখতে পারে না। আদুরে ছোঁয়া পেয়ে হু হু করে কাঁদতে থাকে। মনের গহীন কোণ থেকে উঠে আসে কষ্টের পেরেক। মনার হাতের ছোঁয়া ভেতর থেকে উপড়ে তুলে নিয়ে আসে গেড়ে বসা পেরেকটি। জানালা দিয়ে বাহিরে তাকায়। ওর বেডরুমের পাশে উঠে এসেছে বড় এক নারকেল গাছ। গাছে চড় ই পাখির ঝাঁক। পাখি উড়ছে। কিচির মিচির করছে।

প্রকৃতির কী লীলাখেলা। কেউ কেবল আনন্দ করে। কেউ দুঃখ পায়। রুনির জীবনে মিশে আছে আনন্দ-বেদনা, দুটোই। বেদনাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দেয় সে, আনন্দ কুড়িয়ে নিতে হাত বাড়ায়। দু'হাতে চেপে ধরে বসে থাকে মনার হাত।

এ সময় কারিনা এসে সামনে দাঁড়ায়।

রুনিকে বলে, তোর বাবাকে ফোন কর। আজ আমরা সবাই এক সাথে খাবো।

মা-র কথা শুনে আবারো ভেতর থেকে নাড়া খায় রুনি। আবারো আনন্দে ঝলমল করে ওঠে পুরো দেহ। এবার সত্যি সত্যিই ঝেড়ে ফেলতে পারে সব ঘৃণা, ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আনন্দ ঢেউ নিয়ে টেলিফোনের কাছে ছুটে যায়। আজ বাবাকে ফোন করবে। অনেক দিন দুর্ব্যবহার করেছে। খারাপ ব্যবহার করে বাবাকে আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

বাবাকে দূরে সরিয়ে দিবে না সে। কাছে ধরে থাকবে। বাবার পুরুষ সত্তার মধ্যে পিতৃত্বের সত্তাটি নিবিড় করে গেঁড়ে বসাতে হবে। বুঝতে পারে।

ফোন করে সে।

পিএ ফোন ধরে।

হ্যালো। আমি রুনি বলছি। আব্বুকে দিন।

স্যার তো এখন মিটিং-এ। ফোন দেওয়া নিষেধ।

আমার জন্য নিষেধ নেই। জানেন না আপনি? ধমক দেয় রুনি।

সাথে সাথে লাইন কানেক্ট হয়ে যায়।

জ্বি বলুন। মীরান চৌধুরী বলছি।

আব্বু আমি রুনি। কথা বলতে পারবে? সময় আছে তোমার?

চেয়ার থেকে অনেকটা লাফিয়ে ওঠে মীরান চৌধুরী। তার মেয়ে ফোন করেছে! মিটিং এর কথা ভুলে যায়। আচমকা আলোড়িত হয় মন। উত্তেজিত হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, সময় নেই মানে? অবশ্যই আছে। বলো মামণি। কী ব্যাপার!

তুমি মিটিং শেষ করে গাড়িতে ওঠো। বাসার দিকে রওনা দাও। এখনই। আমরা তোমার জন্য বাসায় অপেক্ষা করছি। একসাথে খাবো। কমান্ডিং অফিসারের মতো আদেশ করে লাইন কেটে দেয় রুনি।

অনেকদিন মেয়ের আদুরে কণ্ঠ শোনে নি মীরান চৌধুরী। ওদের রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণার ব্যবহার দেখেছে। দেখে দেখে লাবণ্যের প্রতি আরো বেশি ঝুঁকে পড়ে। কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছিল সে। গভীর খাদে তার আদরের মানিক রুনি হাত

বাড়িয়েছে। এ হাত আর কিছুতেই ছাড়া যাবে না। খাদ থেকে উঠে আসতে হবে। এখন বুঝতে পারছে, লাবণ্য সম্পর্কটি আসলে এক ধরনের অবৈধ ভুতুড়ে ফাঁদ। ওই ফাঁদের সুতো ছিঁড়তে হবে। মেয়ের কাছে থেকে হবে। ছেলের কাছে থেকে হবে। স্ত্রী কাছে থেকে হবে। ছেলের কাছে ফিরতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। জীবন ছোট। খুব ছোট। ছোট সময়টা সঠিক ব্যবহার করতে হবে।

দ্রুত মিটিং শেষ করে নেমে আসে। মনে অন্য ধরনের অনুভূতি নিয়ে বাসায় এসে হাজির হয়।

কলিং বেল টিপে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার ওপাশে।

কারিনা এগিয়ে যায়। দরজা খোলে।

মীরান অবাক হয়। কারিনা দীর্ঘদিন দূরে সরেছিল। আজ এগিয়ে এসেছে! ছেলের মরণ শোকে পুড়েছে এটি তার কাল। তবুও এসেছে সামনে। মন ভরে যায় খুশিতে। মুখে কোনো শব্দ উচ্চারণ করে না মীরান।

কারিনা বলে, দাও ব্রিফকেস দাও।

মনে পড়ে যায়, পুরনো দিনের কথা। বিয়ের প্রথম দিকে দরজায় এসে কারিনা এভাবে ব্রিফকেসটি নিতো। আজও নিচ্ছে। এতো বছর পর আবার আগের কারিনা ফিরে এসেছে। নতুন কারিনার মধ্যে পুরনো কারিনা জেগে উঠেছে। ভালোবাসার কাছে ফিরে এসেছে মীরান।

যেভাবে আগে বুকে জড়িয়ে নিতো, আজও সেভাবে ধরার জন্য হাত বাড়ায় সে। লজ্জার খোলস ভেঙে যায়। স্বামীর বুকে মাথা ছোঁয়ায় কারিনা। কেঁপে ওঠে। বুক ভেঙে কান্নার ঢেউ আসে।

রুনি নিজের রুম থেকে বেরিয়ে আসছিল। দৃশ্যটি দূর থেকে দেখে। দেখে এক ছুটে আবার নিজের রুমে ফিরে যায়। উল্লসিত হয়ে মনাকে আবারও জড়িয়ে ধরে।

কিছুক্ষণ পর সহজ হয়ে কারিনা স্বামীকে নিয়ে রুনির রুমে আসে।

পরিচয় করিয়ে দেয়, ও মনা। আমাদের রূপকের বান্ধবী।

মীরান যেন আকাশের চাঁদ দেখছে নিজের বাসায়। বিস্ময় নিয়ে মনার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মনা সামনে এগিয়ে আসে। কদমবুচি করে আংকেলকে।

আনন্দে মীরানের চোখে পানি আসে। সাথে সাথে চোখ ভিজে ওঠে কারিনারও। রুনিও কাঁদতে শুরু করে। আনন্দ পেলে এমন করে কাঁদতে পারে কেউ, জানা ছিল না মনার। মনার চোখেও আনন্দাশ্রু ছুটে আসে।

মা, তোমাকে এমন লাগছে কেন? এনিথি রং?

মনা বললো, না বাবা। ভালো আছি। সমস্যা নেই।

ঠিক বলছো? সমস্যা নেইতো? আহসান সাহেব আবারও প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মনা এবার হেসে দেয়। মাথা থেকে উদ্বেগ তাড়াতে চায়। উদ্বেগ সরছে না। উদ্বেগের গোপন ছোপ বসে আছে মুখে। বাবার চোখে ধরা পড়ে যায় সব চিহ্ন। বাবাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারেন তিনি ভেতরের অবস্থা।

মাই সুইট ডটার। ট্রাই টু সলভ ইওর প্রবলেম বাই ইওরসেলফ। নিজে সমাধা করতে না পালে আমার হেলপ্ নেবে। ঠিক আছে?

কথা শেষ করে মেয়ের মাথায় হাত রাখেন তিনি। বাহিরে বেরুনের জন্য দরজার দিকে এগিয়ে যান।

মনা পিছন পিছন আসে। দরজায় এসে বাবাকে বিদায় জানায়।

হাসি দেয়। মেয়ের হাসি মুখ দেখে বের হতে অভ্যস্ত। মেয়ের মলিন মুখ নিজের মনে অস্থিরতার গোপন বিষ ঢুকিয়ে দেয়। জানে মনা। ভেতরের উদ্বেগ চাপা দিয়ে তাই দরজার কাছে আসে। বাবাকে বিদায় দিয়ে ফিরে আসে টেলিফোন সেটের কাছে।

অনিককে ফোন করা দরকার। অনিক ওদের গ্রুপের একজন। রূপকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারও বন্ধু।

অনিকই জানবে রূপকের সব খবর।

রূপকের ভেতর যন্ত্রণা আছে। দুঃখ আছে। বুঝতে পেরেছে মনা। কারুর কষ্ট সইতে পারে না সে। রূপকের কষ্ট একদম সইতে পারে না। রূপককে ভালো লাগে। ভালোও বাসে। ভেতরের কোমল স্থান থেকে টের পেয়েছে।

ডায়াল একবার ঘুরিয়ে লাইন পেয়ে যায়।

হ্যালো। এটা কি অনিকদের বাসা?

জ্বি। একটি মেয়ে কণ্ঠের জবাব।

ওকে একটু দেওয়া যাবে?

ভাইয়া তো পড়ছে। পড়ার সময় ভাইয়াকে টেলিফোন দেওয়া নিষেধ।

তুমি কে? মনা প্রশ্ন করে। ভাইয়া শব্দটি শুনে ভেবেছিল ওর বোন।

আমি ওনাদের আত্মীয়। ঘর দেখা শোনা করি।

ওঃ। বুঝতে পারে মনা। কাজের মেয়ে হবে। কাজের মেয়েরা আজকাল নিজেদের বুয়া বলতে নারাজ। যারা এক বাসায় দীর্ঘদিন থাকে, নিজেকে পরিবারের সদস্য ভাবতে চায়। ভাবতে চায়, সে-ই বাড়ির দেখভাল করার কর্ত্রী। 'কাজের মেয়ে', 'কাজের বুয়া' ইত্যাদি শব্দগুলো তাদের ইগোতে টনটনা ক্ষোভ জাগিয়ে তোলে। তাদের বলতে হবে হাউস গভার্নেন্স।

মনা বোঝে। বুঝে বলে, আমার যে একটু জরুরি প্রয়োজন। আপনি কি একটু আমার কথা জানাতে পারেন?

'আপনি' শব্দটি শুনে মেয়েটি খুশি হয়। ছুটে যায় অনিকের রুমে। রুমে গিয়ে বলে, ভাইয়া আপনার জরুরি ফোন। একটা আফা ফোন করছে। খুউব ভাল আফা। কথা বলবেন?

অনিক টেবিল থেকে ওঠে, সেটের কাছে যায়।

হ্যালো। অনিক বলছি।

আমি মনা। ভালো আছিস অনিক?

হ্যাঁ। ভালো। ফোন করেছিস অসময়ে। ব্যাপার কি? কখনো তো তোর ফোন পাই নি।

এখন পেয়েছিস, কথা বল।

বল। কী উপকার করতে পারি?

রূপকের বিষয় একটু জানতে চাচ্ছি। কত ভালো ছেলে, অথচ কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। ওর কি কোনো সমস্যা হয়েছে? জানিস কিছু?

ওতো ডুবে গেছে। নষ্ট হয়ে গেছে। হুট করে বলে বসে অনিক।

ডুবে গেছে মানে কি? নষ্ট হয়ে গেছে মানে কি? উদ্বেগ বলসে ওঠে মনার প্রশ্নে।

মানে সহজ। হেরোইন ধরেছে। হেরোইন নেয়।

বলিস কি!

সত্যি বলছি।

ওর মতো ভালো ছেলে হেরোইন নেবে কেন?

সেটা আমি জানি না। এটুকু বুঝি ওর ভেতর প্রচন্ড একটা ঝড় ঢুকে গেছে। বলে না কষ্টের কথা।

ওকে ভালো করে তোলা যায় না? চিকিৎসা করানো যায় না?

যায়। ওর পরিবার থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। পরিবারে সমস্যা আছে মনে হয়।

মনা বলে, দেখ। আমি ওর পরিবারের সবাইকে চিনি। সুন্দর পরিবার। একটি সুখী পরিবার।

বাহিরে থেকে সব বোঝা যায় না। ভেতরে গিয়ে দেখ সমস্যা আছে।

আমরা কি ওকে হেলপ্ করতে পারি না?

হ্যাঁ পারি। উদ্যোগ নিতে পারি। আমাদের গ্রুপের সবার সাথে আলাপ করে নেই। দেখা যাক কী করা যায়?

প্লিজ। হেলপ্ কর। উদ্যোগ নে। ওর মতো ভালো ছেলে আর হয় না। এমন একটা ছেলে নষ্ট হয়ে যাবে ভাবতে পারি না। মনের সব কোমলতা নিয়ে অনিককে অনুরোধ করে মনা।

দেখ মনা, মাদক নিরাময়ে প্রয়োজন পরিবারের নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসা। আদর মমতা। আমাদের সহযোগিতাও দরকার। কেবল আমরা ওকে ভালো করে তুলতে পারবো না।

ওর পরিবারের বিষয়টি আমি দেখবো। তুই আমাদের গ্রুপের সবার সাথে আলাপ কর। কী করা যায় ঠিক কর।

আচ্ছা। দেখবো। অবশ্যই দেখবো। অবশ্যই আমরা এগিয়ে যাবো।

থ্যাংকস্ এ লট অনিক। মাইন্ড ইট, ইউ মাস্ট ডু সামথিং ফর হিম। বলেই ফোন রেখে দেয় মনা।

রূপক খারাপ ছেলে হতে পারে না। কিছুতেই বাজে ছেলে হতে পারে না। মন কিছুই মানছে না। হেরোইন খেলেই কি নষ্ট হয়ে যাবে? কষ্ট পেয়ে কষ্ট ভুলতে চাইছে রূপক। কষ্ট ভুলতে ভুল পথে পা ডুবিয়েছে। ওর পা তুলে আনতে হবে। ওই পায়ে পচন ধরতে দেবে না সে। কিছুতেই না।

বুকের ঘরে হাহাকার জেগে ওঠে।

ভালোবাসার গোপন ঘরে আগুন লেগে গেছে। আগুনের দহন বড় তীব্র। তীক্ষ্ণ জ্বালা। ভীষণ জ্বালা। রূপককে হেরোইন আসক্ত ভাবতে পারে না মনা। চোখ পানিতে টলমল করে ওঠে।

টলমল চোখে নিজের রুমে আসে। বোঝে সে, বাবা তাকে শিক্ষা দিয়েছে,

বিপদে ভেঙে পড়লে চলবে না। বিপদে শক্ত হতে হবে। শক্ত হতে হাল ধরতে হবে। সে ছাড়া আর এ মুহূর্তে কে হতে পারে কাজের মানুষ? তাকে উদ্যোগ নিতেই হবে। চিকিৎসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মাদক ছাড়ার জন্য রূপকের মনে জোর বাড়াতে হবে। রাজি করাতে হবে ওই পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য। লুকোছাপা করার সুযোগ নেই। যতো লুকোছাপা চলবে, ততোই ডুবে যাবে রূপক। খোলামেলা আলাপ করতে হবে। ওর পরিবারের সদস্যদের কাছে লুকালে ওরই ক্ষতি বাড়বে। রূপকের ভালো চায় সে। ওকে ডুবে যেতে দেবে না। কিছুতেই না। ভাবতে গিয়ে আবারো কেঁদে ফেলে মনা। ঝর ঝর করে কান্না চলে আসে। নিজেকে সামলে নিতে পারছে না।

অনেকক্ষণ পর সহজ হয় সে। কেঁদে কেটে শক্ত হয়। শক্ত হয়ে বের হয় বাসা থেকে। রূপকদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

বিধ্বস্ত মনার ভেতরটা শক্ত আছে। বাহিরে ফুটে আছে অন্তর্গত যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ। চোখফোলা। চুল অবিন্যস্ত। ড্রেসে অপরিপাটি।

সরাসরি বাসায় এসে হাজির হয়।

রুনি দরজা খোলে। খুলেই মনাকে দেখে। বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠে যায়। মনা'পার এই দশা কেন?

কারিনা এগিয়ে আসে।

মা। তোমার এ অবস্থা কেন?

মনা বলে, আংকেল বাসায় আছেন?

আছে।

ওনাকে নিয়ে আসেন। রুনির রুমে আসেন সবাই। কথা আছে।

মনার কতা ফেলতে পারে না কারিনা। কোনো দুঃসংবাদের আলামত আঁচ করতে পেরেছে মনার কথায়। আচরণে। বেশভূষায়।

দ্রুত বেডরুমে আসে কারিনা। অপ্রস্তুত মীরানের হাত ধরে নিয়ে আসে রুনির রুমে।

মনা বলে, রূপক কোথায়?

কারিনা বলে, ওতো ঘুমোচ্ছে।

ঘুমাক। আপনারা শোনেন। রুনি শোনো। আমি এখন কিছু কথা বলবো। কথাগুলো ভালো না। কঠিন কথা। কঠিন সংবাদ। ভয়াবহ খবরটি ইথার থেকে শুনতে হবে। নির্মম সত্যকে শক্তভাবে মোকাবেলা করতে হবে। রাজি সবাই?

কারিনা বলে, মা আমরা রাজি, বলো মা। বলো তুমি। অধৈর্য্য হয়ে ওঠে কারিনার মন।

রুনি থামছে ধরেছে মনার হাত।

মীরান সহজভাবে তাকিয়ে আছে মনার দিকে। মনে হচ্ছে দেবপরী নেমে এসেছে তার ফ্ল্যাটে। এসে ওদের ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। এতো ছোট একটি মেয়ে। মনে কত জোর। কত জোশ্। কত তেজোদীপ্ত তার ভঙ্গিমা।

মনা এবার কঠিন সত্য বলে যায়।

রূপক হেরোইন নিচ্ছে। হেরোইনে আসক্ত হয়ে পড়েছে। যেকোনো কারণেই হোক সে হেরোইনের পচা গর্তে পা দিয়ে ফেলেছে। আমি নিশ্চিত হয়ে এসেছি। ওকে গর্ত থেকে তুলে আনতে হবে। ওর মনের পচন ঠেকাতে হবে। ওর দেহের পচন ঠেকাতে হবে।

কারিনা দপ করে বসে পড়ে রুনির খাটে।

রুনির চোখ থেকে টলমল করে পানি নেমে আসে।

মীরান চৌধুরীর চোখে পানি নেই। গভীর শূন্যতা ভেসে ওঠে। মনে হচ্ছে, নিজের কেনা ফ্ল্যাটের সিমেন্টের অণুতে অণুতে ফাটল তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছে আগুন লেগে গেছে ঘরে। আগুন। মনে হচ্ছে ধ্বসে যাচ্ছে ফ্ল্যাট বাড়ি। ডুবে যাচ্ছে সে। মনে হচ্ছে শূন্যতার শূন্যে ভরে গেছে জীবনের সব অর্জন।

মনা বলে, ওর স্বীকারোক্তি বেশি জরুরি। মাদক নিচ্ছে বিষয়টি স্বীকার করতে হবে তাকে। এই দায়িত্ব আমি নিলাম। স্বীকারোক্তিই হচ্ছে ওকে ফেরানোর প্রথম ধাপ। মাদকাসক্তি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের লেখা একটি কলামে পড়েছিলাম কথাটি। স্বীকারোক্তির পর ওকে রাজি করাতে হবে, চিকিৎসার জন্য উদ্বুদ্ধ করাতে হবে। এই দায়িত্ব আমরা সবাই নেবো। আমাদের সব বন্ধুরা এগিয়ে আসবে। আপনাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। আপনাদের ভূমিকা প্রধান। আমিও আপনাদের পাশে আছি। বলতে বলতে কেঁদে ফেলে মনা।

মনার শক্ত মনের বাঁধ ভেঙে সুনামির তান্ডবের মতো কান্না ধেয়ে আসে। কাঁদতে শুরু করে রুনিও। কারিনাও ডুকরে কেঁদে ওঠে।

কেবল মীরান চৌধুরী চোখে কান্না নেই। ভেতরের কান্নায় ধ্বসে যায় ভেতরের জগৎ। বাহিরে কেবল শূন্যতা।

সকলের কান্না জানান দিয়ে যায় ওরা রূপককে ভালোবাসে। এই ভালোবাসাই এখন রূপকের ফিরে আসার প্রধান শক্তি। সব ভালোবাসা এক হলে রূপক ফিরে আসতে বাধ্য।

সহজ হয়ে মনা রূপকের রুমে ঢোকে। রূপকের মাথায় হাত রাখে। ঘুমে হাত বোলায়।

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে, রূপক। আমি মনা। দেখো আমি এসেছি।

রূপক গভীর ঘুমে ডুবে আছে।

চুল ধরে ঝাঁকি দেয় মনা।

রূপক চোখ খোলে। তাকায় মনার দিকে।

মনা হাসি দেয়।

আমি মনা। ওঠো। চিনতে পারছো আমায়?

হ্যাঁ। চিনতে পারছি। ঘুম জড়ানো ভাঙা স্বরে বলে রূপক।

ওঠো। মনা ওকে টেনে তুলে বসায়।

মনা বিধ্বস্ত রূপকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি তাকিয়ে আছে।

রূপকের চোখে প্রতিক্রিয়া নেই। মরা মাছের চোখের মতো চাউনি।

মনা ওর চোখে চোখ রাখে।

মনার চোখ থেকে ছুটে যেতে থাকে বিদ্যুৎ তরঙ্গ। ভালোবাসার তরঙ্গ দ্যোতনা ছুটে যেতে থাকে রূপকের চোখের ভেতর। চোখ থেকে তরঙ্গ শক্তি ঢুকে যায় ব্রেইনে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে আলোড়ন তোলে তরঙ্গদ্যুতি। ভালোবাসার স্পন্দন ওঠে মনের গহীন কোণে।

রূপক নড়ে ওঠে। কেঁপে ওঠে। ভয়ে জরোসরো হয়ে যায়।

আমাকে ভালোবাসো তুমি? মনাকে জিজ্ঞাসা করে সে।

তুমি বোঝ না? একটুও বোঝ না? একটুও কি তোমার মনের কোণে আলো জ্বলে না। আমাকে দেখো না? বলতে বলতে কেঁদে ফেলে মনা।

রূপক বলে, আমি তোমাকে ভালোবাসি না। এজন্য বোঝার চেষ্টা করি না। অন্য কিছু ভালোবাসি আমি। মানুষ ভালোবাসি না। অন্য কিছু ভালোবাসি।

অন্য কিছু? কী সেটা?

বলবো না। কোনোদিন বলতে পারবো না। কোনোদিন তোমার কাছে বলতে পারবো না।

দেখো আমি কাঁদছি। আমার কান্না থামাবে না?

রূপক এবার মনার দিকে তাকায়। ভালো করে তাকানোর চেষ্টা করে। মনার চোখের পানি দেখে।

মনাকে সরিয়ে দেয় সে। মনার আবেগ স্পর্শ করে না তাকে। আবেগ পুড়ে গেছে। সরিয়ে নিতে চায় নিজেকে। সরাতে পারে না। মনা শক্ত করে জড়িয়ে আছে ওকে।

রূপক বলে, আমাকে তুমি খারাপ ভাববে। আমার সব কথা জানার চেষ্টা করো না।

মনা বলে, আমি তোমাকে খারাপ ভাবতে পারি না। শত বিপর্যয়েও আমি তোমার পাশে থাকবো। তোমার ভালো চাই।

আমাকে তুমি ঘৃণা করবে। বলেই রূপক উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে।

মনা বলে, না। আমি সব কিছুর উর্ধ্বে তোমার হাতে হাত রাখবো। তোমার পাশে থাকবো। তোমাকে সুস্থ করে তুলতে চাই।

মাদককে সবাই ঘৃণা করে। আমিও ঘৃণা করি। তবুও আমি মাদক খাই। মাদকাসক্তকে সবাই ঘৃণা করে। তুমিও করবে। বলতে বলতে জোর করে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করে রূপক।

পারে না উঠতে। আঁকড়ে আছে মনা। খুশি হয় মনার মন। স্বীকার করেছে রূপক। এটাই খুশির কারণ।

আমি ঘৃণা চুষে নেবো। তোমার মগজ থেকে মাদক চুষে নেবো। তোমাকে সবাই ভালোবাসে। তোমার মা, তোমার বোন, তোমার বাবা, তোমার বন্ধুরা সবাই তোমাকে ভালোবাসে। তোমাকে আমরা ফিরিয়ে আনবো। চিকিৎসা করাবো। মাদকাসক্তি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ মনোচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবো। আমাদের জন্য তুমি ফিরে আসবে না? চিকিৎসা করাবে না?

রূপক মনার চোখের দিকে তাকায়।

রূপকের মরা চোখে নাচন ওঠে। স্পন্দিত হয় চোখের মণি।

মনা ওই নাচন দেখতে পায়। দু'হাতে রূপকের মুখটা আলতো হাতের ছোঁয়াই তুলে ধরে।

দেখো। আমাকে দেখো। আমার চোখের মণি দেখো।

রূপক বলে, তোমার চোখের মণিতে আমার স্থান পাওয়ার অধিকার নেই। যোগ্যতা নেই।

মনা বলে, তুমি দেখো আমার চোখের মণি দেখো। ভালো করে দেখো। জোর করে বলতে থাকে।

রূপক তাকিয়ে থাকে।

দেখতে পায়, মনার চোখের মণির বৃত্তের পরিধি মসৃণ। মসৃণ মণিতে ফাটল

নেই। বৃত্তের কেন্দ্রে বসে আছে সে। পাশে আছে রুনি। পাশে আছে বাবা। বাবার পাশে হাত ধরে বসে আছে মমতাময়ী মা।

রূপক আশার আলো দেখে। তার ভবিষ্যৎ দেখে। বাঁচার হাতু দেখে। মনার মধ্যে দেখে নিজের বসবাস।

কতোক্ষণ নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। কল্পনায় দেখতে পায় মা বৃষ্টিতে ভিজছে। ধুয়ে যাচ্ছে মা। ভিজতে ভিজতে পরিষন্ন হয়ে হাসছে।

চোখ থেকে এবার অশ্রুকণা ধেয়ে আসে।

কান্না জড়ানো স্বরে ভেঙে ভেঙে বলে, আমি ভালো হতে চাই। তোমাদের মধ্যে ফিরে আসতে চাই।

মনা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ওকে।

রূপক আবার বলে, ফিসফিস করে বলে, গোপনে গোপনে আমি তোমাকে ভালোবাসতাম মনা। ভালোবাসার জন্য আমি ভালো হতে চাই। চিকিৎসা করাতে চাই। আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসি। ভালোবাসি।

রুনি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখে। দেখেই ছুটে যায় নিজের রুমে। ক্যাসেট প্লেয়ারটি চালিয়ে দেয়। হাই ভলিউমে বেজে ওঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত- ভালোবাসি.... ভালোবাসি....।

মনোবিশ্লেষণ ঃ মনোসামাজিক ব্যবচ্ছেদ

উপন্যাসের শুরুতে আমরা দেখতে পাই একটি দাম্পত্য জীবনের চিত্র। স্বামী স্ত্রীর কথোপথনের মাধ্যমে বোঝা যায়, মীরান চৌধুরীর স্ত্রী কারিনা ক্ষেপে আছে, কারিনার কথাবার্তায় ক্ষোভ ঝরে পড়ছে। রাগের মাত্রা এতোই প্রবল যে স্বামীকে ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে সে।

একটি সুখের ঘটনার শুরুতে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠেছে কারিনার মনে। সুখ চাপা পড়ে গেছে। ক্রোধ আধিপত্য বিস্তার করেছে। প্রভাবিত করছে পারিবারিক আবহ। জীবনকে টেনে নিয়ে গেছে অনিশ্চয়তার দিকে।

কোনো কারণ ছাড়া ক্রোধ তৈরি হয় নি। কারণ আছে। নতুন ফ্ল্যাটটি দু'জনের নামে রেজিস্ট্রেশনের কথা বলে রেখেছিল কারিনা। তার নাম বাদ গেছে। স্বামীর নামে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। এটিই ঘটনা। এই ঘটনাটি রাগ উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে। উদ্দীপকটি রাগ উসকে দিয়েছে। কারিনার মনের আবহ বদলে গেছে। শান্ত পুকুরে ঢিল পড়েছে। ঢেউ উঠছে পুকুরে। এই ঢেউ সারাক্ষণ বজায় থাকবে না, মিলিয়ে যাবে। এটাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক চক্রে বারবার ঢিল পড়ে। বারবার ঢেউ ওঠে। অশান্ত থাকে মনের পরিবেশ। ঢেউয়ের নীচে থাকে ক্রোধ। ক্ষোভ। রাগ ঘুণপোকার মতো খেয়ে চলে জীবনের গাঁথুনি। যেমনটি ঘটেছে মীরান এবং কারিনার জীবনে।

কারিনার দাবির পেছনে আছে একটি ঘটনার ফলাফল। ঘটনার মূল্যায়ন। স্বামীর মোবাইল বাতিক বেড়ে গেছে। প্রত্যক্ষ করেছে কারিনা। গৃহবধূ কারিনা একজন স্নেহপ্রবণ মা। সন্তানের মঙ্গলের জন্য সব কিছু করতে পারে। স্বামী সন্তান ঘিরে গৃহজীবনের সব ধরনের চাওয়া-পাওয়া গৃহিণীর মন দখল করে থাকে। এই অধিকার বোধের সামান্যতম বিচ্যুতি, ঘাটতি মন আলোড়িত করতে পারে, মনে শংকা জাগাতে পারে। মনে একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘটে এমন ঘটনা সেই ক্ষেত্রটিতে আগুন জ্বেলে দিতে পারে।

একদিকে মীরান ফোনে অন্য নারীর সাথে কথা বলছে, সংলাপ থেকে বোঝা যায়, অন্য নারীর সাথে মধুর আলাপের কথা টের পাওয়ার কারণে মনে মনে একটি নেতিবাচক গরম আবহাওয়া বজায় ছিল কারিনার মনে। কারিনার জানা আছে, বর্তমান সাংস্কৃতিক জীবনে মোবাইল কালচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব এনেছে। এই বিপ্লবের সুফলের পাশাপাশি কুফলও ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। পরনারী পরপুরুষ কণ্ঠের মাধ্যমে সহজে একজন অন্যজনের কাছাকাছি চলে আসার সুযোগ পাচ্ছে। এই সুযোগে গড়ে উঠছে অবৈধ মেলামেশা। নৈতিকতা বিরোধী অবৈধ সম্পর্কও গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। ফলে ভেঙে যাচ্ছে ঘর। ভেঙে যাচ্ছে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক। সামাজিক এই পূর্ব অভিজ্ঞতাটি কারিনা প্রত্যক্ষ করেছে সমাজ থেকে। এমনি অবস্থায় স্বামীর মোবাইল প্রীতি তাকে শংকিত করে রাখে। সচেতন করে রাখে। অতি সচেতনতার কারণে স্বামীকে বলে রেখেছিল ফ্ল্যাটটি উভয়ের নামে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য। এখানে শংকার উল্টো পিঠে রয়েছে নিরাপত্তাহীনতাবোধ। নিজের জন্য, সন্তানের জন্য নিরাপদ ভবিষ্যতের পথ নিষ্কণ্টক করাই ছিল কারিনার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যটি সামনে রেখে কারিনা স্বামীর প্রতি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে রেখেছিল। দাবি জানিয়ে রেখেছিল।

মীরান বিবাহিত জীবনে দেখেছে কারিনাকে। কারিনা স্বভাবে ভালো। মেজাজে অনিয়ন্ত্রিত। হঠাৎ মেজাজ চড়ে যায় তার। লক্ষ্মী বউ, স্বামীকে ভালোবাসে। মমতাময়ী মা। নিরাপদ প্রতিবেশী। সজ্জন কারিনা অনিন্দ্য সুন্দরী। এক্ষেত্রে কারিনার ইগো টনটনা। সামান্য বিচ্যুতি সইতে কষ্ট হয় তার। মীরানের স্বভাবের সাথে প্রায় দ্বন্দ্ব বাঁধে। দ্বন্দ্ব একটি ক্রোধের ক্ষেত্র কারিনার মধ্যে তৈরি করে দেয়। রাগ সামাল দিতে পারে না। প্রায় ছোটখাটো ইস্যুতেও বাপের বাড়ির দিকে ছুটে চলে যায়। এগুলো তার বৈশিষ্ট্য। বাজিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলোতেও মীরানের জানা হয়ে গেছে। ফলে অবচেতনে মীরান নিজেকে চালিত করেছে। বউকে ভালোবেসেও অবচেতন মনের গোপন মনোভাবের কারণে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে নিজের নামে। অর্থাৎ গোপনে একটি অদৃশ্য দ্বন্দ্বে ডুবেছিল মীরান। বউ তাকে ভালোবাসে বিষয়টি যেমন সত্য, বউ তাকে ছেড়ে যেতে পারে এমন একটি অগ্রিম শংকাও তার মনে বাসা বেঁধে ছিল, এটিও তার চোখে সত্য। মোবাইল প্রীতিটির কুফল সে আমলে আনে নি। নেহায়েত কথা বলতে ভালো লাগে এমনি একটি অনুভূতি ভেতরে ছিল। এ কারণে পরকীয়ায় জড়িয়ে যাবে, নারী ঘটিত কেলেংকারী ঘটবে ইত্যাদি বিপর্যয়ের কথা মনে রেখে মোবাইল প্রীতিটিতে জড়ায় নি সে। অর্থাৎ নিজের কাছে নিজে স্বচ্ছ ছিল। স্বচ্ছতার ফাঁকফোকর দিয়ে মানুষ

অবচেতনে অস্বচ্ছতায় ডুবে যেতে পারে। জানা থাকলেও কথাটি তার মনে আসে নি, সচেতন স্তরে পৌঁছে নি। ফলে নিজের অবস্থান দৃঢ় রাখার জন্য অবচেতন মনে রেজিস্ট্রেশন থেকে কারিনাকে বাদ দিয়েছে। এখানে ছিল বিশ্বাসের ঘাটতি। কারিনার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য মীরানের মনে বিশ্বাসের ঘাটতি তৈরি করে রেখেছিল।

মূল কথা হচ্ছে, কারিনার আবেগ জমা হয়েছে। আশা পূর্ণ হয় নি। সে অবিচারের স্বীকার হয়েছে। ইত্যাদি বিষয়গুলো কারিনার চিন্তনের বুনোটে ধাক্কা দিয়েছে। পরিস্থিতির নেতিবাচক মূল্যায়ন নিজের মনে আসন গেঁড়ে বসেছে। ফলে তার আচরণে পরিবর্তন হয়েছে, দেহের পেশীতে পরিবর্তন হয়েছে, পেশী টানটান হয়ে যায়, এমন অবস্থায় হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, রক্ত চাপ বেড়ে যায়। সর্বোপরি মেজাজে পরিবর্তন আসে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো রাগ ঝলসে ওঠে।

মনস্তত্ত্বে রাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাগ জীবনের গতি-প্রকৃতি নানান ঢঙে বদলে দেয়, প্রভাবিত করে জীবন যাপন। সাহিত্য-উপন্যাস কিংবা গল্পে রাগের উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য আছে, জীবনধর্মী সাহিত্য রচনা করতে হলে তাই জানতে হবে রাগের ভেতর বাহির। রাগের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ জানা থাকলে সাহিত্য জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। বিপরীতভাবে বলা যায়, জীবনের অন্তর্নিহিত গূঢ় সত্যে ঢুকতে পারলে, উন্মোচিত হবে রাগ বা ক্রোধের আসল স্বরূপ। উন্মোচিত হবে জীবনের চিত্র। গল্পকার বা উপন্যাসিক এ কারণে সৃজনশীল। তারা জীবনের চিত্র খুঁড়ে খুঁড়ে মনের মৌলিক স্তরে পৌঁছে যেতে পারেন। মনের প্রধান একটি স্তম্ভ– আবেগ বিশ্লেষণ করে শব্দের বুনোটে জীবন প্রতিবিম্বিত করতে পারেন। এই ব্যাঞ্জনময় উপস্থাপনার মাধ্যমে সৃজনশীল মেধার স্ফূরণ ঘটে। সৃজনশীল সাহিত্য এবং শিল্পকর্মের বিস্তৃতি দেখতে পাই আমরা। জীবনের আদিকাল থেকে এই বিস্তার ঘটছে ধাপে ধাপে।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, আসুন– আমরা রাগ সম্পর্কে জেনে নেই, মনস্তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদের ওপর চোখ রাখি।

রাগ বা ক্রোধ এক ধরনের আবেগ। নেতিবাচক আবেগ।

প্রতিদিন আমরা রাগ করি। রাগ ভোগ করি। জীবন যাপনে রাগের প্রকাশ ঘটাই। যদি দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করা যায়, রাগ অনিষ্টকর নয়। যদিও রাগ একটি নেতিবাচক আবেগ, ক্ষেত্র বিশেষে রাগের প্রয়োজনও আছে। রাগ সহজাত, নেচারাল। রাগ মঙ্গলজনকও হতে পারে। নিয়ন্ত্রিত রাগ উন্নতির জন্য সহায়ক। অনিয়ন্ত্রিত রাগ ধ্বংস বয়ে আনে, দেহ-মন, সমাজ এবং আইনের জন্য ক্ষতিকর।

ইমোশনের শ্রেণী বিন্যাসে, রাগ নেতিবাচক আবেগ। মৌলিক আবেগ। প্রাথমিক আবেগ। মিশ্র আবেগেও রাগ থাকতে পারে। যেমন জেলাসি বা ঈর্ষা। ঈর্ষা করে তাকে যাকে ভালোবাসে মানুষ। ভালোবাসার সাথে রাগ মিশে থাকার কারণে ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

নানানভাবে রাগের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা যায়।

মনস্তাত্ত্বিক ডালেন এবং ডিফেন ব্যাচার (২০০১) এর মতে, রাগের রয়েছে তিন ধরনের উপাদান। প্রথমতঃ রাগ উসকে ওঠার জন্য থাকতে হবে কোনো উদ্দীপক। উদ্দীপক রাগ উসকে দেয়। বাহিরের উদ্দীপক হচ্ছে বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, ফ্লাট রেজিস্ট্রেশনের ঘটনা। এটি বাহিরের উদ্দীপক। কারিনাকে বঞ্চিত করা হয়েছে মালিকানা থেকে। কারিনার ক্রোধ উসকে উঠেছে ঘটনাটির কারণে। ভেতরের উদ্দীপকও থাকতে পারে। ভেতরগত বা ইন্টারনাল স্টিমুলাস রাগ উসকে দিতে পারে, যেমন যে কোনো অন্তর্গত আবেগীয় ক্ষত রাগ সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয়ঃ রাগ তৈরি হওয়ার জন্য একটি ক্ষেত্র থাকতে হয়। পূর্বেই ক্ষেত্রটি তৈরি হয়ে থাকে। পরিস্থিতির সার্বিক মূল্যায়ন– চিন্তনের ধরন, আবেগ, দৈহিক অবস্থা, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন ধারা ইত্যাদি বিষয়গুলো ক্রোধ তৈরির জন্য মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখতে পারে। ফলে যে কোনো প্ররোচনায় কেউ ক্ষেপে উঠতে পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে রেগে ওঠা এবং মানিয়ে নেওয়ার ভিন্নতা ঘটে থাকে মনে পূর্বে তৈরি হয়ে থাকা ক্ষেত্রটির কারণে। রাগের ক্ষেত্র সহজে প্ররোচিত হয়। রাগের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়। উপন্যাসের শুরুতে আমরা দেখতে পাই কারিনার মনে রাগের একট উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। ইতিপূর্বেই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ব্যক্তিগত সামর্থ্যের তারতম্যটিও গুরুত্বপূর্ণ। নিজস্ব মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা প্রভাবিত হয় রাগ জাগানিয়া ঘটনাটির মূল্যায়নের মাধ্যমে। মূল্যায়ন নেতিবাচক হলে মানিয়ে নেওয়ার সামর্থ্যের দেয়ালে ধস নামে। অথবা মানিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য কম থাকলেও কম মারাত্মক ঘটনাও রাগ ঝলসে দিতে পারে। আলোচিত এই তিন ধরনের উপাদানের মিথস্ক্রিয়ায় মূলত মনের ক্রোধ তৈরি হয়ে যায়। কারিনা চরিত্রটির মধ্যে এই মিথস্ক্রিয়ার অনুষঙ্গ দেখা যায়। রাগ উসকে ওঠার ক্ষেত্রটি এতোই উত্তপ্ত ছিল যে নিজের বঞ্চনা এক সময় পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, রাগের তীব্র বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

রাগ বজায় থাকে এমন চারটি ক্ষেত্র শনাক্ত করেছেন ডালেন এবং ডিফেন ব্যাচার (২০০১)।

আবেগ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র : রাগ হচ্ছে এক ধরনের ব্যক্তিগত অনুভূতির বিষয়। অনুভূতির মাত্রা মৃদু বিরক্তি থেকে শুরু করে তীব্র ক্রোধ বা উন্মত্ততা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এই অনুভূতি আমরা কারিনার মধ্যে দেখেছি। তার সন্তান রূপকের মধ্যেও দেখেছি। স্বামী মীরানের মেজাজে ও রাগের বিভিন্ন মাত্রা দেখেছি।

ফিজিওলজিক্যাল বা শারীরবৃত্তীয় ক্ষেত্র : রাগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে এড্রিনাল গ্রন্থির নিঃসরণ, পেশীর টানটান অবস্থা এবং স্নায়ুতন্ত্রের স্বয়ংক্রিয় অংশের সিমপ্যাথেটিক অংশের আলোড়ন। এই আলোড়ন দেহের মধ্যে নানা ধরনের উপসর্গের জোয়ার বইয়ে দেয়।

কগনিটিভ বা অবহিতি ক্ষেত্র : ইনফরমেশন প্রসেসিং এ বিশেষ পক্ষপাত দুষ্টতা বা পরিস্থিতি মূল্যায়নে চিন্তনের বিশেষ প্রভাবের সাথে রয়েছে রাগের অন্তর্গত সংশ্লিষ্টতা। মূল্যায়নের এই ত্রুটি আমরা কারিনা মীরানের দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখতে পাই। রূপকের চরিত্রেও এর প্রভাব স্পষ্ট।

আচরণ ক্ষেত্র দু'ধরনের হতে পারে– ফাংশনাল এবং ডিসফাংশনাল। দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া কিংবা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতায় নিজেকে সেঁটে রাখা ফাংশনাল অবস্থার উদাহরণ। পক্ষান্তরে এগ্রেসিভ হওয়া, নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া অথবা মাদক সেবন করা ডিসফাংশনাল অবস্থার উদাহরণ। এই উদাহরণটি রূপক চরিত্রের বৈশিষ্টে গেঁড়ে বসতে দেখেছি আমরা, বারবার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ দেখেছি। একই সাথে মাদক গ্রহণের মতো ভুল পথে পা দিতেও দেখেছি।

রাগ বুঝতে হলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বুঝতে হবে।

রাগের সোর্স বা উৎস কী? বহিঃপ্রকাশের ধরনটি কী?

এটা কি তীব্র?

নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট?

রাগ কি দীর্ঘমেয়াদি? সব অবস্থার সাথে কি জড়িত?

রাগের বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি কতোটুকু?

সহজে দ্রুত গতিতে ক্রোধের তীব্র অনুভূতি কি উচ্চমাত্রায় উঠে যায়?

রাগের সাথে কি সহিংস আচরণের বিস্ফোরণ ঘটে?

এটা কি অনিয়ন্ত্রিত?

রাগের তলে কী চাপা থাকে?

এটা কি অন্তর্গত ভয় চাপা দিয়ে রাখে?

রাগের আড়ালে কি লুকোনো থাকে নিজস্ব দুর্বলতা কিংবা নিরাপত্তাহীনতা বোধ?

প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেলে রাগ বোঝা সহজ হবে। রাগ বোঝা সহজ হলে হাতের মুঠোয় চলে আসবে রাগ সামাল দেওয়া বা নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল।

রাগের প্রকাশ নানাভাবে ঘটতে পারে।

রাগ প্রকাশের কয়েকটি গতানুগতিক পথ হচ্ছে :

গালাগাল করা, প্রতিরোধ করা, প্রতিশোধ নেওয়া, অপছন্দের কথা জানান দেওয়া, রাগের সোর্স এড়িয়ে চলা, অন্যের সাহায্য কামনা করা (মারিওন '৯৭)। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন ধারায় শিক্ষা দেওয়া হয়, অ্যাংজাইটি কিংবা ডিপ্রেশনের প্রকাশ ঘটানো যাবে, রাগের প্রকাশ করা যাবে না।

শিক্ষা দেওয়া হয় 'রাগ তোমাকে নিয়ন্ত্রণের আগে তুমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করো।' ফলে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী জানে না কীভাবে রাগ সামাল দিতে হবে, কীভাবে রাগের ইতিবাচক দিক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হবে, চ্যানেলিং করতে হবে।

গোর্কিন (২০০০) রাগের উদ্দেশ্য এবং রাগ প্রকাশের উপকারিতার মধ্যে ব্যবধান খুঁজে পেয়েছেন। যেখানে তাগিদ থাকে সেখানে রাগের প্রকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, উদ্দেশ্য প্রণোদনায়ও রাগের প্রকাশ ঘটতে পারে। উদ্দেশ্য প্রণোদনায় রাগ প্রকাশে থাকে ইচ্ছেকৃত মনোবৃত্তি। এ ধরনের মনোবৃত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাবোধ এবং ক্যালকুলেশন থাকে। বিবেচনাবোধ ব্যক্তির জীবনে টেনে আনে উচ্চ মার্গের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।

রাগের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে যেতে পারে। আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ এখানে নেই বললেও চলে। মাঝারি ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়ও এখানে চলে আসতে পারে।

রাগ প্রকাশের উপকারিতার পাশাপাশি অপকারিতাও আছে।

গঠনমূলক পথে রাগ প্রকাশ করা যায় আবার ধ্বংসযোগ্য ভুল পথেও রাগের প্রকাশ ঘটতে পারে। গঠনমূলক পথে রাগ প্রকাশিত হলে ব্যক্তির চারিত্রিক সরলতা, সততা, অখন্ডতা কিংবা অভেদ্যতার চিত্রটি অন্যেরা দেখতে পায়। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য অন্যের জন্য নিরাপদ। অন্যের অধিকার এদের দ্বারা লঙ্ঘিত হয় না বা তারা সীমা লঙ্ঘন করে না।

নিজের আত্মরক্ষার বিষয় সামনে চলে এলেও ধ্বংসযোগ্য পথে রাগ প্রকাশে অন্যের দুর্বলতার হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থেকে যায়, অন্যের সীমা বা অধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনাও ঘটে যায়।

রাগ প্রকাশে উপরোক্ত দু'ধরনের পথের ফলাফলের ব্যবধান রাগের চার প্রকার প্রকাশ ভঙ্গির চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে :

উদ্দেশ্য প্রণোদনায় ধ্বংসযোগ্য পথে পরিচালিত রাগ অন্যের সাথে বৈরিতা বা শত্রুতা বাড়ায়, অন্যের বিরুদ্ধে নিজেকে যুদ্ধংদেহী করে তোলে, বিপক্ষ শক্তির জন্ম দেয়।

উদ্দেশ্যমূলক পথে প্রকাশিত গঠনমূলক রাগ ব্যক্তির দৃঢ় মনোভাবের প্রতিফলন ঘটায়, নিজের অধিকারের বিষয় জোরালো ভাবে তুলে ধরতে পারে, নিজের অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারে, অন্যের অধিকার বা সীমা পদদলিত করে না।

স্বতঃস্ফূর্ত গঠনমূলক রাগ প্রবল আবেগপূর্ণ অনুভূতির প্রকাশ ঘটায়, প্রবল ঘৃণা, উৎসাহ বা প্রেমের যে কোনো একটি বা দু'টি অনুভূতির তীব্রতর চাপে পড়ে যায় মানুষ। আবেগপূর্ণ অনুভূতির অতিপ্রাবল্য বা অতিরিক্ত আবেগের ঘোরে সেঁটে যাওয়ার কারণে নিজের মাঝে তীব্র উত্তেজনা বা উদ্দীপনা বজায় থাকে। ব্যক্তির যাতনা বাড়ে, দুর্ভোগ বেড়ে যায়। উপন্যাস খণ্ডে কারিনার মেজাজের মধ্যেও আমরা এ ধরনের ভোগান্তির চিত্র দেখেছি। কারিনার রাগ যদিও আপাত দৃষ্টিতে যৌক্তিক, নিজের অধিকারের কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুলে ধরে। তবুও বলা যায় অতিরিক্ত অনুভূতির ঢেউ তাকে বিপর্যস্ত করে রাখে। পরবর্তীতে ভুল পথে ঠেলে দেয়। এমনটি ঘটেছে নিজের মধ্যে সার্বক্ষণিক বড় কিংবা ছোটখাটো বিষয়-আশয় থেকে রাগের অতিরিক্ত আলোড়ন বজায় থাকার কারণে। এমন অবস্থায় যৌক্তিক চিন্তা শাণিত থাকে না, ইতিবাচক সমাধান পাওয়া যায় না। সমস্যার আরো গভীরে তলিয়ে যেতে থাকে মানুষ। যেমনটি ঘটেছে কারিনা এবং মীরানের জীবনে।

স্বতঃস্ফূর্ত ও ধ্বংসযোগ্য পথে প্রকাশিত রাগ ব্যক্তির মধ্যে দুর্বার ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটায়, ক্ষিপ্তাবস্থা তৈরি করে, উন্মত্ততার পথে ঠেলে দেয়, সহিংস আচরণ করতে উসকে দেয়, অন্যকে আক্রমণ করতে বাধ্য করে, নিজের মাথা দেয়ালের সাথে ঠোকাতে প্ররোচিত করে অথবা প্রবল উত্তজনায় চেঁচিয়ে উঠতে পারে। তীব্র চিৎকার করে ছোটাছুটি করতে পারে বা আর্তনাদও করতে পারে। উন্মত্ত অবস্থায় কেউ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে জোরালো স্পষ্ট দাবী পূরণের লক্ষ্যে কারুর ভেতর অন্তর্গত উন্মত্ততাও তৈরি হয়ে থাকতে পারে, গোপন উন্মত্ততা জেগে থাকার একটি কারণ অমীমাংসিত অন্তর্গত জখম ও অপমান বোধ।

উপন্যাসে আমরা আরো লক্ষ্য করি, কারিনা অপমানিত হয়েছে। অন্তর্গত অপমানবোধ দ্বন্দের গিট শক্ত করে রেখেছিল। সেই গিট থাকা অবস্থায় সে

দরজায় লাথি দিয়েছে, চিৎকার চেঁচামেচি করেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। দ্বন্দ্বের গিট শক্ত থাকায় নতুন সংকটের জালে জড়িয়ে গেছে। নাঈম আহমেদের সাথে জড়িয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে এই দ্বন্দ্বের গোপন দহনের কারণে। পারিবারিক আবহ কেবল এতে বিপর্যস্ত হয় নি। সামাজিক সংকটও ঘনীভূত করেছে। নাঈমের পরিবারে ধ্বস এসেছে, নিজের পরিবারের ভিতও ভেঙে গেছে।

জীবন চিত্রে মীরানের একটি ঘটনার দিকে তাকাতে পারি আমরা। অফিসে চাপে ছিল মীরান, পথে জ্যামে পড়েছে। বাসার গেইটে সিকিউরিটি গার্ড যথাসময়ে গেইট না খুলে তৈরি হয়ে থাকা রাগের ক্ষেত্রটিকে উসকে দিয়েছে। এখানে মীরান নিয়ম ভঙ্গ করেছে, হর্ণ না বাজানোর আইন ভেঙেছে সে। লিফটে উঠতে পারে নি, কারেন্ট ছিল না, চাপ আরো বেড়ে যায়। বাসায় এসে দেখে দরজার মুখে জুতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তৈরি হয়ে থাকা চাপের ক্ষেত্রটিতে যেন দিয়াশলাই-এর কাঠি জ্বেলে দিয়েছে। তার স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বংসাত্মক রাগের বহিঃপ্রকাশ দেখেছি আমরা, চিৎকার চেঁচামেচি দেখেছি। এক্ষেত্রে কারিনার প্রতিক্রিয়া ক্রোধের মাত্রায় ঘি ঢেলে দেয়। উন্মত্ত শব্দে বাসার পরিবেশ মাথায় তুলে দেয়। ঘরে সন্তান আছে ভুলে যায় তারা।

মীরান বাসার ডমিনেন্ট চরিত্র। পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবোধ তার বৈশিষ্ট্যের অন্য একটি দিক। বাহিরের চাপের প্রতিক্রিয়া ঘরে দেখায় সে। ইচ্ছেকৃতভাবে এমনটি করে না। এক ধরনের ইগো ডিফেন্স মেকানিজম স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাগ ঝাড়িয়ে তার ইগো সুরক্ষা করতে চায়। ঘর তার জন্য নিরাপদ জায়গা। এই জায়গায় উন্মত্ততা তাকে বিপদে ফেলবে না। এটি এক ধরনের প্রতিস্থাপন ইগো মেকানিজম। মনস্তাত্ত্বিক এই বিষয়টি নিরাপদ জায়গায় রাগ ঝাড়িয়ে তাকে সুরক্ষা করতে চায়। যেহেতু আগে থেকে রাগের ক্ষেত্র তৈরি ছিল, মীরানের বাড়তি সর্তকতার প্রয়োজন ছিল। এই সতর্কতার অভাব অচেতনে তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বাহিরের চাপ মোকাবেলা করে এসে ঘরে ঘরে পুরুষেরা এমনি করে মেজাজ ঝাড়ে। এসময় গৃহিণীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিস্থিতি মূল্যায়নের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সুখী ঘর নির্মাণ করতে হলে এই দৃষ্টিভঙ্গি বাড়াতে হবে। রেগে থাকলে, ক্ষেপে থাকলে, সংকটে থাকলে, দ্বন্দ্বের গোপন ছোবলে বিপর্যস্ত থাকলে অশান্তির আগুন জ্বলবেই। যেমনটি জ্বলেছে কারিনা ও মীরানের ঘরে। ফলাফল হচ্ছে নিজেদের বিপথগামী করা, লাবণ্যের সাথে মীরানের জড়িয়ে যাওয়া। নাঈমের আবেগের টানে কারিনার ছুটে চলা। সর্বোপরি রূপকের জীবনের

প্ল্যাটফর্মের গাঁথুনি দুর্বল করে দেওয়া। রুনির মতো লক্ষী মেয়ের মনে যন্ত্রণার বিষ ঢেলে দেওয়া।

রূপকের ব্যক্তিগত মেজাজেও আমরা উন্নতভা দেখতে পাই। সে খাটের উপর ঝাঁপ দিচ্ছে। রুনিকে মারছে। ক্ষিপ্তাবস্থা বজায় থাকছে তার মনে। এমনটি ঘটেছে সার্বক্ষণিক পারিবারিক আবহের কারণে। বাবা-মার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত মেজাজ সন্তানের মাঝে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের বীজ রোপণ করে দিয়েছে। সর্বোপরী বলা যায় রূপকের মাদকাসক্ত হওয়ার পেছনে রয়েছে বাবা-মার অশান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন, বাবার রুঢ় আচরণ। মা-র পরকীয়ার দৃশ্য। সন্তানের প্রতি বাবার সময় না দেওয়া ইত্যাদি সব ঘটনার মিথষ্ক্রিয়া জীবনের অর্থালী অর্জনের অতলে বীষের বীজ গেড়ে বসেছিল। সেই বিষে ছারখার হয়ে গিয়েছিল পারিবারিক পরিমন্ডল।

ক্রোধের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করার কৌশল কি?

প্রধান শর্ত হচ্ছে ক্রোধ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভ করতে হবে। এই জ্ঞানই ক্রোধের ব্যাপারে আমাদের মনোভাব পাল্টাতে সাহায্য করবে, সতর্ক হতে শক্তি যোগাবে। সর্বোপরি আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। সচেতনতার মাধ্যমে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

নিয়ন্ত্রিত ইতিবাচক ক্রোধ দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়ার পথ সহজ করে দেয়, সার্বিক মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগীয় সমৃদ্ধির জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার অর্থ ইতিবাচক পথে এগিয়ে যাওয়া, অযৌক্তি দাবি প্রতিহত করা। কী চাই, কী চাই না, কী চাওয়া উচিত নয়, বিষয়টি সম্পর্কে নিজের নিকট নিজেকে স্বচ্ছ রাখা।

আমরা লক্ষ্য করি, উপন্যাসের চরিত্রগুলোতে ক্রোধ প্রকাশের এই অনুষঙ্গগুলো প্রথমদিকে অনুপস্থিত ছিল।

রাগের সঙ্গে 'মোটিভেটেড' আচরণের মিলিত ধারায় আমাদের মাঝে এগ্রেসিভ বিহেভিয়ার জেগে ওঠে। এ সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লোপ পায়, অন্যকে জোরপূর্বক ভূপাতিত করা হয়, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার শক্তি হারিয়ে যায়। উদ্ভূত সমস্যা থেকে সমাধানে পৌঁছানো যায় না।

ডোপামিন নামক নিউরো ট্রান্সমিটারের কারণেও এগ্রেশন রিলিজ হতে পারে। সেরোটোনিনের মাত্রা কমে গেলেও এগ্রেশন হতে পারে। টেস্টোস্টেরনের কারণেও এমনটি ঘটতে পারে।

ব্যক্তিগত হতাশা, সামাজিক শিক্ষণ, কিংবা ব্যক্তি বিশেষের কথার খোঁচায়ও এগ্রেশন রিলিজ হতে পারে। যেমনটি আমরা দেখেছি কারিনা, রূপক এবং মীরান চরিত্রে।

রাগ প্রকাশের অধিকার আছে প্রতিটি মানুষের।

যিনি অন্যের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার করেছেন, তার সামনে খোলামেলাভাবেই রাগের প্রকাশ ঘটতে পারে। এই প্রকাশের অর্থ আলাদা। এর ফলে ক্ষোভ উবে যায়, ব্যবধান কমে আসে। সুসম্পর্ক বজায় রাখার সকল বাধা দূর হয়।

এক্ষেত্রে 'ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স' (ইকিউ) বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আবেগীয় সমস্যা সমাধানে আইকিউ-এর চেয়ে ইকিউ বড় টুলস। এটি ডেনিয়েল গোলম্যান-এর কথা। তিনি আবেগীয় সমস্যা ও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেই, বই লিখেছেন।

তাঁর মতে, ইকিউ হলো কিছু দক্ষতার সমাহার যেটির সাহায্যে মানুষ অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে, নিজেদের মাঝে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান টানতে পারে, দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করতে পারে।

মূলত ইকিউ-এর মাধ্যমে নিজের আবেগীয় প্রতিক্রিয়ার দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়।

উপন্যাসের শেষের দিকে এই দায়িত্বভার তুলে নিতে দেখি রুনির, কারিনা এবং মীরানের চরিত্রে।

আবেগের প্রতিক্রিয়ার দায়িত্ব নিজে বহন করতে পারলে, নিজের ক্ষমতা নিজেই ব্যবহার করার কৌশল আয়ত্তে নিয়ে আসে, ব্যক্তিগত অনুভূতিই তখন নানা দিক থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করে।

এ কারণেই বলা হয়েছে, ইকিউ টুলসটি ব্যবহারের প্রথম ধাপ হচ্ছে নিজের অনুভূতির প্রতি মনোযোগী হওয়া, অন্যের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক আচরণের উৎস বের করা, নিজের আগ্রাহী মনোভাব শনাক্ত করা।

ক্রোধান্ধ মুহূর্তে করণীয় কি?

অপেক্ষা করতে হবে, কমপক্ষে তিন থেকে ছয় সেকেন্ড।

অপেক্ষা করার অর্থ রাগ অবদমন নয়।

এই অপেক্ষার অর্থ ক্রোধের সময় ব্রেইনে যে ইলেকট্রো কেমিক্যাল পদার্থের নিঃসরণ ঘটে, সেটির বিক্রিয়া নিষ্ক্রিয় হতে সময় দেয়া, মাত্রা কমাতে সুযোগ তৈরি করা। ফলে রাগ থেকে সে সহিংসেতা বা এগ্রেসিভ আচরণের সম্ভাবনা ছিল সেটি কমে যায়।

প্রকৃতি পক্ষে এ সময় 'অপেক্ষা করা' দুরূহ একটি কাজ।

কিন্তু মানসিক চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে কৌশলটি রপ্ত করা যায়।

মন যখন শান্ত হতে থাকে নিজের প্রতিক্রিয়া নিজেই বোঝা যায়। এ সময়

ভুক্তভোগীর বোঝা সহজ হবে কী ধরনের নেতিবাচক বিভ্রমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

এই নেতিবাচক ইস্যুটি বুঝতে পারলেই, পরিস্থিতি মূল্যায়নের ক্ষমতা বেড়ে যাবে, প্রকৃত মনোভাব বা আচরণ কী হওয়া উচিত ছিল এই উপলব্ধি এবং শিক্ষা দুটোই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সমৃদ্ধ করবে, ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে নিজের আবেগ নিজেকে রক্ষা করবে।

নিজেই পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে, মানসিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে বাড়াতে হবে গণ সচেতনতা।

কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি (মনোথেরাপি) প্রটোকলের মূল ইস্যু ঃ

রাগ প্রশমনের জন্য নিম্নলিখিত ইস্যুগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

ক্রোধান্ধ ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া মনিটর করা। ক্রোধ উসকে ওঠার কারণগুলো শনাক্ত করা।

ব্যক্তির সামগ্রিক সমস্যাটি কীভাবে মোকাবেলা করবে সেই বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া হয়। রাগ নয়, রাগের প্রতিক্রিয়াটিই গুরুত্বের সঙ্গে ট্রিট করা হয়।

উদ্যত মেজাজের সময় ব্যক্তি যেভাবে ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করেছেন, একই ঘটনাটি ওই ব্যক্তিকে পুনরায় মূল্যায়নের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

সাধারণত রাগের সময় পরিস্থিতি সঠিকভাবে মেপে দেখা যায় না, ভুলভাবে কিংবা বিকৃতভাবে মানুষ পুরো পরিস্থিতি তাৎক্ষণিক জরিপ করে নেয়, ফলে হঠাৎই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগ্রেশন জেগে ওঠে নিজের ভেতর।

সঠিকভাবে এই নেতিবাচক ইস্যুগুলো ধরার জন্য কগনিটিভ থেরাপিতে উৎসাহিত করা হয়। ইস্যুগুলোর অন্তর্নিহিত কারণগুলো অনেক সময় চ্যালেঞ্জ করা হয়। ফলে ভুল ব্যাখ্যা বা নেতিবাচক ধারণাগুলোর খোলস নিজের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। এভাবেই নিউট্রাল বা ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। ইতিবাচক মূল্যায়নের ক্ষমতা নিজের মাঝে বেড়ে যায়। রাগ বাগে আনা তখন মোটেই কঠিন বিষয় বলে মনে হবে না। নিজেকে অনেক বেশি দৃঢ় ও প্রত্যয়ী মনে হবে। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার শক্তি এভাবেই রপ্ত করা যায়।

ক্রোধের কারণে দেহের ভেতর সক্রিয় আলোড়িত অবস্থা সৃষ্টি হয়। রিলাক্সেশন টেকনিক চর্চার মাধ্যমে সেই আলোড়ন ভিন্ন খাতে সরিয়ে দেয়া যায়। নিজের দেহকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা যায়।

ক্রোধের আড়ালে অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন কিংবা ম্যানিয়ার মতো মানসিক রোগ লুকিয়ে থাকতে পারে। এসব রোগগুলো রাগের তীব্রতা নানাভাবে জটিল করে তুলতে পারে। সমস্যার জট থেকে হঠাৎই যেন অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরাই পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন করে ওষুধ ব্যবহার করে চিকিৎসা করবেন।

পরিস্থিতি সরাসরি মোকাবেলা করতে হবে ঃ

অধৈর্য বা বিরক্তি সৃষ্টি করে এমন ঘটনাগুলো প্রথমে নিখুঁতভাবে শনাক্ত করতে হবে। নোট করে রাখতে হবে। পরবর্তীকালে শান্ত থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে হবে। তাড়াহুড়ো বা সজোরে পরিস্থিতির ভেতর নিজেকে ছুঁড়ে দেয়া নয়, অপরকে দোষারোপ করাও নয়, এমনকি বিতর্কিত শব্দ ব্যবহার করা থেকেও নিজের জিহবাকে শাসন করতে হবে এ সময়।

মনে রাখতে হবে, ক্রোধের সময় ছুঁড়ে দেয়া শব্দগুলো দেহ ও মনে স্ট্রেস রিঅ্যাকশন ঘটায়। এই রিঅ্যাকশন মানেই দেহের ক্ষতি, মনের ক্ষতি, ব্রেইনের ক্ষতি, হার্টের ক্ষতি।

ধীরে ধীরে উচ্চারণ করতে হবে ওম ম মা রিলাক্স। রিলাক্স।

এভাবে চর্চা করতে শিখতে হবে। হাস্যকৌতুকের কিছু নেই এতে। পুরো প্রক্রিয়াটিই বিজ্ঞান নির্ভর। চর্চার মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বাড়ানো যায়। নিজেকে বিব্রত করে, নিজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় এমনি পরিস্থিতিতে যদি কৌশলটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, নিজের দক্ষতা শাণিত হবে। ক্রোধ উসকে ওঠার ঘটনাগুলো তখন বিপর্যস্ত করতে পারবে না, দেহে সক্রিয় আলোড়ন তুলতে ব্যর্থ হবে।

দাম্পত্য সম্পর্কের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাগের সময় করণীয় কী?

উত্তেজিত পার্টনারকে বলতে হবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না শান্ত হবে, আমাকে সম্মান দেখাতে যতোক্ষণ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে, ততোক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না। কথা বলতে চাই না।

যতোক্ষণ পর্যন্ত পার্টনারের উদ্যত মেজাজ কমে না আসে, সেই ফাঁকে সমস্যা সম্পর্কে খানিকটা ভেবে নিতে হবে।

কেন রাগ হলো? কী করা উচিত? কীভাবে কম্প্রমাইজ বা সমঝো তো করা যায়? পুরো ঘটনা মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখতে হবে।

সঙ্গি বা সঙ্গিনীর দোষ ধরার চেষ্টা চলবে না। যতোই দোষ হয়ে থাকুক ব্যাপারটি নিয়ে ঘাটা-ঘাটি না করে খোলামেলা নিজের অনুভূতির কথা তুলে ধরতে হবে। আলাপ করতে হবে।

'আমি ফীল করছি', 'আমি চিন্তা করছি', 'আমি চাই' ইত্যাদি ঢংয়ে আলাপ শুরু করতে হবে। দোষ ধরার প্রবণতা পরিহার করতে হবেই। নৈতিকতার প্রশ্ন তুলেও বকাঝকা চলবে না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে অপরকে হাস্যস্পদ করার পথে কখনই এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

কী চাচ্ছেন? কী চাচ্ছেন না?

পার্টনারের কাছে খোলামেলা বিষয়টি নিয়ে আলাপ করতে হবে।

মনে মনে কিছু একটা চাচ্ছেন, মুখ ফুটে সঙ্গিকে কখনই বলেন নি। আশা নিয়ে বসে আছেন, নিজে থেকেই সঙ্গি আপনার চাওয়ার বিষয়টি বুঝে যাবে, সেই হিসাবে পদক্ষেপ নেবে। অগ্রিম এমন তরো আশা করে বসে থাকা উচিত হবে না।

বরঞ্চ অপরের বক্তব্য শুনতে হবে। নিজের সব কথা তাকে খুলে বলতে হবে। এই প্রচেষ্টা হয়ত অভিমানের তাপদাহে চাপা পড়ে থাকে। চাপা পড়লেই ভুল হবে। সংঘাত বাড়বে।

সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে, ক্রোধ তরল হবে না। উত্তরোত্তর রাগের তীব্রতা ও মেয়াদকাল বাড়তেই থাকবে।

এই ধরনের বাড়তি প্রবণতা দাম্পত্য সম্পর্কে ধস নামিয়ে দেয়। বিপদ অবশ্যম্ভাবি পথে ছোবল বসায়। যেমনটি আমরা দেখেছি কারিনা-মীরান চরিত্রে।

নিজের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে, রাগ সামাল দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কে মধুর আবহ বজায় রাখার জন্য কাউন্সিলিং-এর আশ্রয় নিতে হবে।

কুনিকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছে মীরান, কারিনা।

গাড়িতে বসা অবস্থায় ফোন আসে নাঈমের। বিষয়টিতে কারিনার কোনো অপরাধ নেই। যে কেউ ফোন করতে পারে তাকে। ফোনে পাওয়ার পর অপরাধ বোধে জড়িয়ে যায় সে। মীরানেরও ফোন আসে, ডলির ফোনে সেও নিজেকে অপরাধী ভাবে। চোরের মন পালাই পালাই– একটি প্রবাদ আছে। প্রবাদটি মনস্তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক বিষয়টি তুলে ধরে। পালানোর মনোবৃত্তি অপরাধীর মনে কাজ করে। নিজেদের গুটিয়ে নেয় তারা। একটি আনন্দময় ঘটনায়ও বাধা এসে সামনে দাঁড়ায়। আনন্দে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ করতে পারে না কেউ।

ল্যান্ড ফোন পূর্বেও ছিল। মোবাইলের যাত্রা শুরু হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। মোবাইল জীবন যাত্রায় উন্নতি এনেছে। একই সাথে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখতে পাচ্ছি আমরা। পুরো উপন্যাসে মোবাইল সংস্কৃতির কুফল উঠে এসেছে। কুফলটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে মোবাইল ব্যবহারকারী এটিকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করেন। মোবাইল সংস্কৃতির কারণে মানুষ যেমন আবেগীয় চাপ রিলিজ করে স্বস্তি পেতে পারেন, তেমনি আবেগের জোয়ারে ভেসে জীবন ছারখার করে দিতে পারেন। যেমনটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি উপন্যাসে। মোবাইল সংস্কৃতি সমাজের একটি স্তরে পরকীয়ার সুযোগ বাড়াচ্ছে। বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। প্রফেশনাল মনোচিকিৎসক হিসেবে সমাজের ভেতর থেকে এই চিত্র দেখতে পাচ্ছি। বিষয়টি উদ্বেগজনক।

মোবাইল ফোন ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে। অফ টাইমে রাত জেগে কথা বলছে

কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণীরা। ফ্রি কথা বলার সুযোগে ঘন্টার পর ঘন্টা তারা আলাপে মেতে ওঠে। যৌন উত্তেজক কথাবার্তাও চলে। দেহে বায়োলজিক্যাল উত্তেজনার পাশাপাশি আবেগীয় উত্তেজনাও স্ফীত হয়ে থাকে। ফলে মনোযোগের ঘাটতি তৈরি হয়। এই ঘাটতিতে পড়ায় মন বসে না। রাত জেগে কথা বলে। দিনভর ঘুমায় তারা। প্রায় মা-বাবা মনোচিকিৎসকের চেম্বারে ছুটে যান। আশংকা, উদ্বেগে কাটে তাদের দিন। বিপর্যস্ত হয় সন্তানের ভবিষ্যৎ, বিপর্যস্ত হয় সন্তানের মেজাজ। বিপর্যস্ত হয় সামাজিক চিত্র। মোবাইল কালচারের বিরুদ্ধে এটি বক্তব্য নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, সমস্যাটি তুলে ধরা। সমাধানের বিকল্প পথ খুঁজে বের না করলে, বিশেষ করে উঠতি তরুণ তরুণীর হাতে মোবাইলের ছড়াছড়ি বাড়তে থাকলে, বিপর্যয় রোধ করার সুযোগ বা পরিকল্পনা তৈরি করা যাবে না। বিপদ ভয়াবহ হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট কোম্পানী এবং নীতি নির্ধারক সর্বোপরি মা-বাবাকে সতর্ক হতে হবে।

উপন্যাসের এক অংশে আমরা দেখতে পেয়েছি কারিনা সেট থেকে সীম কার্ডটি খুলে কমোডে ছুঁড়ে দিয়ে ফ্লাশ করে দেয়। এটি একটি উপলব্ধি। নিজের নৈতিক শক্তিকে শাণিত করার উপলব্ধি। সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজেকে ফিরিয়ে নেওয়ার উপলব্ধিটি প্রকৃত অর্থে কোনো সমাধান নয়। সীম ফেলে দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যার সমাধানের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিক মনোবলই এখানে প্রধান শক্তি। সামাজিক শৃঙ্খলা নির্মাণের জন্য নৈতিকতার কোনো বিকল্প নেই। তবুও নৈতিক শক্তিতে ফাটল আসে। ফাটলে আটকে যায় অসংখ্য জীবন। সন্তানের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্টের ভিত নিজেদের অজান্তেই দুর্বল করে তোলে পারিবারিক বিশৃঙ্খল পরিবেশ। রূপকের মনস্তাত্ত্বিক গড়নের মধ্যে এই চিত্র দেখতে পাই আমরা। লাবণ্য, নোশিন এবং রুনির চিন্তা, চেতনা এবং কথোপকথনে তাদের মনের চিত্রটিও আমাদের সামনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, কিশোরী সমস্যা গভীরতা। সমাজের নানান স্তরে কিশোরীরা গোপনে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। এতে পুরুষের যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি রয়েছে দৈহিক ও মানসিক সেনসেশনের প্রতি কিশোরীদের অজ্ঞতা। অনেক কিশোরী উঠতি বয়সের যৌন অনুভূতির গোপন কষ্টে বিপর্যস্ত হয়ে মামক নেয়। ভুল পথে একটি নেচারাল সেনসেশনকে তারা চালিত করে। ভুলের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে যথাযথ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকল্প নেই।

আড্ডাবাজ নারীরা পুরুষের পুরুষ সত্তা নিয়ে আড্ডায় নানাবিধয় তুলে ধরেছে। নোশিন, রুনির সংলাপের মধ্যেও দেখা যায়, উভয়ে ব্যাককে ঘৃণা করে।

ঘৃণার উল্টো পিঠে রয়েছে পুরুষ সত্তা। এই সত্তাটি নারী লোভী। বাবার বয়সী পুরুষকে তারা দেখেছে নিজেদের দিকে এগিয়ে আসতে। রুনি বাবাকে দেখেছে অল্প বয়সী লাবণ্যের প্রতি আসক্ত হতে। নোশিন শুনেছে অন্য নারীর প্রতি বাবার গোপনচারীয়ার চিত্র। তারা নিজস্ব অভিভূতির আলোকে পুরুষ থেকে পুরুষ সত্তা আলাদা করেছে, পিতৃত্বের সত্তাটি মহান মনে করে। উভয়ের মধ্যে বাবাকে ঘৃণা না করে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। নিজের মনোজগতের চাপ এভাবে কমে গেছে। 'সেলফ রিয়ালাইজেশন' ভেতর থেকে আসতে হয়। কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপির অনুষঙ্গগুলো উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে শব্দ বিন্যাসের মাধ্যমে, প্রেক্ষাপট নির্মাণের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, সামাজিক চিকিৎসার পথ দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মনোথেরাপির এই পথ বেয়ে ফিরে এসেছে রুনি। মাদক থেকে সরে থাকার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছে। পারিবারিক সুখী আবহই রুনিকে রক্ষা করতে পারে। নইলে রুনির পরিণতি হবে নোশিনের মতো, লাবণ্যের মতো বুকে পুরনো ক্ষত বয়ে বয়স্ক পুরুষের ভালোবাসার খপ্পরে পড়ে যেতে পারে, অথবা অন্য বয়স্ক পুরুষের সাথে সখ্যতা, অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলতে প্ররোচিত হতে পারে। নিজস্ব নেচারাল গোপন দানব অবচেতন থেকে এই ড্রাইভ তৈরি করে দিতে পারে। বাবা-মার সতর্কতার বিকল্প কিছু নেই। নিজেদের জীবন সুখী করে সন্তানের সুখী ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথ প্রশস্ত করতে হবে বাবা-মাকে।

কাবিনা এবং মীরানের যৌন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। মাসের পর মাস তারা মিলিত হচ্ছে না। পাশাপাশি শুয়ে আছে খাটে। ইচ্ছে হচ্ছে হাত বাড়াতে। ইচ্ছে চুপসে যায়। এক্ষেত্রে দ্বন্দ্বটিই প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করেছে। ক্রোধ কাজ করেছে। ক্রোধের কারণে ইচ্ছে জাগেনি বা জাগা ইচ্ছে অবচেতন স্তরে ঢুকে গেছে। জীবনের বহির্জাগতিক বিষয় মনোজগতের অন্তর্গত বিষয় টিকে অস্বচ্ছল করেছে। ব্রেইনের জৈব রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণের মাত্রা বিশৃঙ্খল হয় অস্বচ্ছলতার কারণে। বিজ্ঞান বলছে, যৌনতা মানুষের সুস্থতা নিয়ন্ত্রণ করে। আনন্দ নিয়ন্ত্রণ করে। সুখ নিয়ন্ত্রণ করে। ভালোবাসা প্রেম, যৌনতা এবং পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ আবহ সব দিক থেকে সুখ বয়ে আনে। ভালোবাসাবিহীন যৌনতার প্রয়োজন দৈহিক টেনশন কমানের হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োজন কতোটুকু, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ বলে, সুস্থতার জন্য ভালোবাসাবিহীন সেক্সও প্রয়োজন রয়েছে। তবে সার্বিক সুস্থতার জন্য, সুখের জন্য নৈতিক সেক্স, টেনশন মুক্ত নিরাপদ সেক্সের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সেক্সের জন্য পারস্পরিক স্পর্শের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা লক্ষ্য করি, রাগ এবং দ্বন্দ্বের কারণে কাবিনা এবং মীরান একের প্রতি অন্যের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে বা আগ্রহে বাধা এসে দাঁড়ায়। অথবা উভয়েই অন্য পুরুষ বা নারীর প্রতি উদ্দীপ্ত হয়। আলোড়িত হয়। সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। জড়ানোর বিস্তৃত বাধা উপন্যাসে অনুক্ত থাকলেও অস্পষ্ট বোঝা যায় তারা ভেসে গিয়েছিল পর পুরুষে পর নারীতে। অর্থাৎ দৈহিক কোনো ত্রুটি তাদের ছিল না। ছিল মানসিক যোগসূত্রের স্রাবলীল গতিধারার অভাব। এই ঘাটতির কারণে পারস্পরিক স্পর্শ পাওয়ার বিষয়টি চাপা পড়ে থাকে। অথচ স্পর্শ যৌনতার একটি বহির্জাগতিক ভাষা। এই ভাষা অন্তর্গত জগতে আলোড়ন তোলে। পূর্বে মীরান কাবিনাকে বুকে জড়িয়ে ঘুমাতো, তাকে বুকে জড়িয়ে না ধরলে ঘুম হতো না। জীবনের বাস্তব সংঘাতের ফাঁকফোকর দিয়ে সেই ইচ্ছেটি পুড়ে যায়। একদম ঝলসে যায়। দূরত্ব বেড়েই চলে। স্পর্শহীন সংসার যাপনে দেহমন আলোড়িত হওয়ার সুযোগ ঘটে নি। এজন্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু যৌনতা নিয়ে ভাবলে চলবে না। সেক্সুয়ালিটি নিয়ে ভাবতে হবে, অর্থাৎ সেক্সের জন্য একটি মানসিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটের অভাব উপন্যাসের বিভিন্ন সিকুয়েন্সে দেখা যায়।

যৌনতার গতি-প্রকৃতি নির্ণিত হয় ব্রেইনের নিউরোট্রান্সমিটারসহ দেহে বিভিন্ন ধরনের হরমোনের নিঃসরণের মাধ্যমে।

এগুলোর কয়েকটি নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

ডোপামিন ॥ এটি মনের অবস্থাসহ যৌনাকাঙ্খা তৈরিতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। রোমান্স এবং সেক্সি মেজাজ নির্মাণের জন্য ডোপামিনের অবদান অত্যধিক। মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় এলাকার ডোপামিনার্জিক নিউরোন থেকে ক্ষরিত এই পদার্থটি যৌনতার দিকে গোপনে নারী পুরুষকে ঠেলে দেয় বা চিন্তন প্রক্রিয়াতে গোপন 'ফুয়েল' ঢুকিয়ে দেয়।

সেরোটনিন ॥ মনে বিষাদ তৈরি হয় সেরোটনিনের ঘাটতির কারণে। মনে উল্লাসও আসে বাড়তি সেরোটনিনের কারণে। একই সাথে যৌন কামনা বাসনা তৈরি করে সেরোটনিন। মাত্রা কমে গেলে যৌন অনুভূতিতে ঘাটতি আসে। সেরোটনিনের স্বাভাবিক মাত্রায় যৌন অনুভূতি স্বাভাবিক মাত্রা বজায় থাকে। পরিবেশ এবং পার্টনার থাকলে এমনি অনুভূতির জোয়ার সামাল দিতে কষ্ট হয় টীনএজে। পরিণত বয়সেও কামনা বাসনার টানে এগিয়ে যায় নারীপুরুষ। মস্তিষ্কে উৎপন্ন হওয়া এই পদার্থটি কেন বাড়ে, কেন কমে? বলা হচ্ছে নেতিবাচক চিন্তনের কারণে নিঃসরণ কমে যেতে পারে। আবার এও বলা হচ্ছে নিঃসরণ কমে গেলে

নেতিবাচক চিন্তা বেড়ে যায়। অর্থাৎ বিষয় দু'টো ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। মানসিক চাপ, দ্বন্দ্ব, সংঘাতে মনে বিষাদ আসে। বলা হয় এ সময় সেরোটনিনের মাত্রা কমে যায়। যৌন অনুভূতিতে বিপর্যয় আসে। কারিনা এবং মীরানের ব্যক্তিগত জীবনের নেতিবাচক ইস্যুতে সেরোটনিন একটি বড় ভূমিকা রেখেছে বলা যেতে পারে।

অক্সিটোসিন ॥ প্রেমের সাথে জড়িত আছে অক্সিটোসিনের রাসায়নিক খেলা। মস্তিষ্কের নিপুণ কারসাজিতে অন্যের প্রতি আকুল অনুভূতি তৈরি করে অক্সিটোসিন। যে কারুর সান্নিধ্যে অক্সিটোসিন দেহ মনে শিহরণ জাগিয়ে তুলতে পারে। এ কারণে দেখা যায় কারিনা আকৃষ্ট হয়ে যায় নাঈমের প্রতি। নাঈম আকৃষ্ট হয় কারিনার প্রতি। লাবণ্য ঝুঁকে যায় মীরানের প্রতি। মীরানের মতো ব্যক্তিত্বের পতন ঘটে লাবণ্যের মতো ধারালো তরুণীর উদ্দীপনায়। প্রেমের পরতে পরতে অক্সিটোসিনের গোপন লীলায় ভরে যায় জীবন। কারিনার কাছে অপূর্ণ থাকলেও মীরান পূর্ণ হয় লাবণ্যের কাছে। উপন্যাসে বিষয়টি অনুচ্চ শব্দ নির্মাণের ভেতর দিয়ে রচিত হয়েছে। কিন্তু ক্যামিকেল সিস্টেমে বিষয়টি অনুচ্চ থাকেনি। নীরব কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছে। নিয়মিত যৌনতা দেহে অক্সিটোসিনের মাত্রা বাড়িয়ে রাখে। মায়ার বাঁধন গাঢ় করে। যতো বেশি অক্সিটোসিনের নিঃসরণ ঘটবে ততো বেশি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছে থাকবে। অক্সিটোসিন তখন এন্ডোরফিনস-এর নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়। মন তখন শান্ত থাকে। উদ্বেগ ও রাগ দূর হয়। কারিনা এবং মীরানের দাম্পত্য জীবনে এটির ঘাটতি দেখতে পাই আমরা। অনিয়মিত যৌনজীবন দেহের অক্সিটোসিন নিঃসরণের মাত্রায় ভাটির টান তৈরি করে। ফলে একে অপর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

'প্রেমিক-প্রেমিকার হাত ধরাধরি, নিবিড় আলিঙ্গন, এক সঙ্গে বসে রোমান্টিক সিনেমা দেখা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অক্সিটোসিন লেভেল বেড়ে যায়।' মনোবিদ ক্যাথলিন লাইট এর এই বিশ্লেষণটি তুলে ধরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'সানন্দা'। বলছে, 'বেরসিক স্বামীটিকে দোষ দেবেন না। দোষ দিন তার দেহে ক্ষরিত অক্সিটোসিন লেভেলকে।'

'সানন্দা' দোষ না দিতে চাইলেও কারিনা দোষী ভেবেছে মীরানকে। মীরানের দূরভিসন্ধিকে ইস্যু করার কারণে যাতনায় পড়ে স্বামীর প্রতি আকুলি বিকুলিভাব ভিন্ন খাতে চালিত হয়েছে।

এই প্রবাহমান ভুল খাত থেকে ফিরে এসেছে কারিনা। সন্তানের ইস্যুতে তারা আবার একত্রে মিশেছে। মাতৃত্ব এবং পিতৃত্ববোধের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত

হয়েছে মীরান। মহান হয়েছে কারিনা। মাতৃত্বের জয় ঘোষিত হয়েছে। পিতৃত্বের জয় ঘোষিত হয়েছে। এই জয় কেবল উপন্যাসের শব্দময় ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত হয় নি। উভয়ের দেহ মনে যে নিউরোক্যামিকেল রাসায়নিক খেলা চলেছে সেটিও বিজ্ঞানের ভাষাকে বিজ্ঞান হিসেবেই চিত্রিত করে। এখানে কেবল নৈতিক শক্তির বোধোদয় দেখানো হয় নি, এখানে দেখানো হয়েছে একদম ভেতরের কলকব্জার গোপন খেলায় জীনের কোডে বয়ে আসা আরএনএ, ডিএনএ মৌলের মৌলিক বিস্ময়। নিজেদের মধ্যে বিভেদ চাঙ্গা হলে পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ববোধের জয়গান আবার চাপা পড়ে যেতে পারে। অন্যের নিউরোক্যামিকেলের গোপন টানে হারিয়ে যেতে পারে মীরান। হারিয়ে যেতে পারে কারিনা। মৌলিক বন্ধনই উভয়ের মূল বন্ধনের গিট সজীব রাখতে পারে। শক্তিশালী করতে পারে। বিষয়টি মনে রাখতে হবে উভয়কে। তাই নিজেদের যৌনজীবন আবার চাঙ্গা করে তুলতে হবে। চাঙ্গা রাখার জন্য শুধু ইচ্ছে থাকলে হবে না। ইচ্ছে সফল করার পদক্ষেপ থাকতে হবে। নিজেদের দ্বন্দ্ব সংঘাত লাঘব করে নিজেদের ঘরে ফিরে আসতে হবে। নিজের দৈহিক সম্পদ ব্যবহার করে মনের সম্পদের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে হবে। অথবা মনের সম্পদের ঔজ্জ্বল্য দিয়ে নৈতিক দেহ কামনা পূরণ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ফিটনেস। দৈহিক ফিটনেসের পাশাপাশি মনের ফিটনেসও গুরুত্বপূর্ণ।

ফিটনেস বজায় রাখা জরুরী মনে করে মীরান।

প্রতিদিন ভোরে হাঁটতো সে। ধানমন্ডির লেকের পাড়ে হেঁটে বেড়িয়ে স্বাচ্ছন্দবোধ করতো। হাঁটার মাধ্যমে টেনশন লাঘব হয়। মনের পরিবর্তন ঘটে। ফলে নিজেকে দেখতে ভালো লাগে। আত্মবিশ্বাস বহু গুণে বাড়ে। হাঁটার মাধ্যমে দেহে প্রচুর অক্সিজেন প্রবেশ করে। কোষ উজ্জীবিত হয়, ক্লান্তি ঝরিয়ে দেহ তখন তাজা হয়ে ওঠে। হার্টের অসুখ, পিঠের ব্যথা, ফুসফুসের অসুখ, পেটের অসুখ, টেনশন কমাতে হাঁটার কোনো বিকল্প নেই। মানসিক অস্থিরতা এবং অবসাদ কাটাতে প্রত্যেক মানুষকে হাঁটা উচিৎ।

ধানমন্ডির লেকের পাড়ে নৈসর্গিক শোভা দেখে মনে ভরে যেতো। প্রকৃতির নিপুণ পরিবর্তনের সাথে নিজের দেহ মনের পরিবর্তনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতো।

উপন্যাস চিত্রে সেটিতেও বাধা পায় মীরান। চাঁদাবাজদের খপ্পরে পড়ে। ছিনতাই এর শিকার হয় সে। সামাজিক এই চিত্রটি ভোরের হাঁটুরেদের কেমন সমস্যা করে না। মীরানকে স্ট্রেসে ফেলে দেয়। সামাজিক এই সংকটও মীরানের মনের গতিপথ বদলে দিয়েছে অনেকখানি। পারিবারিক চাপ, সামাজিক

নিরাপত্তাহীনতা বোধ মনের স্বাস্থ্যে ধস নামায়। মন খারাপ হয়। দীর্ঘদিন চাপে থাকে। দীর্ঘ চাপ মনোযাতনা বজায় রাখে মনে। এ ধরনের মনোযাতনা মনে বিরক্তি জাগিয়ে রাখতে পারে। ফলে কারিনার মনের কোমল অনুভূতির অনেক কিছুর দিকে নজর দিতে পারে নি মীরান।

পুরাতন পাতা ঝড়ে যায়, প্রকৃতিতে নতুন পাতা গজায়। সবুজ রং হলুদ হয়ে যায়। ঝড়ে যায়। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর খেলার মতো মানব জীবনও ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র জীবনে যতোটুকু পারা যায় স্বাচ্ছন্দে চলতে পারাটাই সুখ। এই সুখের সন্ধান দিতে প্রতিদিন সকালে হাঁটার জন্য মীরান উজ্জীবিত ছিল।

মীরান ফিরে এসেছে আবার, কারিনার বুকে ফিরে এসেছে। উপন্যাসের শেষ চিত্রটি জীবন চিত্রের মতো সজীব হবে যদি উভয়ে দেহমন ফিট রাখার চর্চায় সময় ব্যয় করে। নইলে জীবন আবার ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। বিপর্যয় হানা দিতে পারে আবার। মনে রাখতে হবে মীরানকে এবং কারিনাকে। যৌন জীবনের ফিটনেস ধরে রাখতে এসব মৌলিক বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত যত্নের প্রয়োজন।

মন্দা চরিত্রটি উপন্যাসের বাঁক ঘুরিয়ে দিয়েছে।

উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মনে মমতা ফিরিয়ে দিয়েছে। ভালোবাসার তারুণ্যময় দ্যুতি সব জঞ্জাল ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দিতে পারে মনের কালিমা। ভালোবাসার জয় হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জয়। ভালোবাসার শক্তি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি।

যদিও আবেগ, যদিও কোনো আবেগই চিরস্থায়ী নয়, যদিও বদলে যায় ভালোবাসা, তবু বলা যায় ভালোবাসার ওই মুহূর্তের তীব্রতার সাথে যুক্ত থাকে অন্তর্গত প্রেষণার নীরব খেলা। সেই খেলায় যে কোনো জয় সম্ভব। শাব্দিক অর্থে, উপন্যাসের অর্থে এই শক্তি অলৌকিক, এই শক্তির বেগবান গতি অপরিসীম। বিজ্ঞানও এই অপরিসীম শক্তির তেজ ম্লান করে দিতে পারে না। বরং বিজ্ঞান উপন্যাসের পদতলে এসে পড়ে থাকে। কারণ ভালোবাসার সাথে জড়িয়ে আছে মস্তিষ্কের রাসায়নিক পদার্থের অদৃশ্য আকর্ষণ, টান। এমফিটামিনস, ফিনাইল-ইথাইলেমিন (পী পদার্থ), এন্ডরফিনস, অক্সিটোসিন জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলোর মিলিত ফলাফলই চেতরগত শক্তির উৎস।

মনা ভালোবাসার শক্তি নিয়ে কারিনা-মীরানের পরিবারে দেবপরীর মতো সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে মাদকাসক্তকে ফেরাতে কেবল মনার ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়। এই ভালোবাসার সাথে যোগ হতে হবে পরিবারের সুখ, পরিবারের সবার ভালোবাসা। বিয়ে দিয়ে কোনো মাদকাসক্তকে ভালো করা যাবে না। কেবল নারীর ভালোবাসা কোনো মাদকসেবীকে ফেরাতে পারবে না।

মনার মতো একটি মেয়ের জীবনের পুরোটা এই অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে না। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের চেয়ে উপন্যাস অর্থে ভালোবাসার শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভাষা বেশি সমৃদ্ধ, বিজ্ঞানের ভাষা ততো জোড়ালো নয়। তবে মনার উদ্যোগ বিজ্ঞানের ভাষাকে জোরালো করে, শক্তি জোগায়। মনোচিকিৎসার জন্য এমন উদ্যোগই জরুরী, বৈজ্ঞানিক বিষয়টি খোলাসা হওয়া দরকার।

পাঠক। চলুন আর একটু এগিয়ে যাই। মাদক নিয়ে দুটো কেস স্টাডির দিকে নজর দেই। একটু মনোযোগ দিলে বুঝতে পারবো মাদকের ভয়াবহতা কতো ব্যাপক, জানতে পারবো মাদকের অতলে ডুবে থাকা জীবনের কঠিন আর্তনাদের কথা। পুনরায় মাদকাসক্তি প্রতিরোধের উপায়ও আমাদের সামনে ফুটে উঠবে ঃ

জীবনের গল্প–১ ঃ 'কেঁদো না মাম্মি, কেঁদো না বাপ্পি'

সেন্ট্রাল হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে সামাদ (ছদ্মনাম)। ৩২ বছরের সামাদের তারুণ্য পুড়ে ঝলসে গেছে। চোয়াল বসে গেছে, চোখের নিচে কালি, চোখজোড়া ভেতরে ঠেসে গেছে। এখনো দেখলে বোঝা যায়, এক সময় সামাদ ছিল তারুণ্যদীপ্ত সুঠাম পুরুষ। স্যালাইন চলছে। স্যালাইন স্ট্যান্ডের পাশে চেয়ারে বসে আছে কেয়া, সামাদের স্ত্রী। ২৫ বছরের কেয়া স্যালাইন ব্যাগের দিকে তাকিয়ে আছে। উদাস চোখ। বিষণ্ন মুখ। স্যালাইন ড্রপ দেখছে। মনে হচ্ছে প্রতিটি ড্রপের সাথে ঝরে যাচ্ছে জীবনের নির্যাস, ঝরে যাচ্ছে মায়া মমতা, ভালোবাসা।

ওদের একটি মেয়ে মুনমুন। তিন বছরের মুনমুন পাশের বেডে শুয়ে আছে।

সামাদ ভর্তি হয়েছে লিভারের সমস্যা নিয়ে। লিভার ঠিকমতো কাজ করছে না। খেতে পারে না সে। বমি আসে কেবল। জন্ডিসের মাত্রা বেড়ে গেছে। রক্তে লিভার এনজাইম এসজিপিটির মাত্রা অনেক বেশি। একজন লিভার বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ভর্তি আছে সে। চিকিৎসা চলছে।

গত রাত বারোটার সময় ডিউটি নার্স এসেছে ওষুধ দিতে। কেয়া ঘুমে। মুনমুনকে বুকে জড়িয়ে গভীর ঘুমে ডুবে আছে। এ সময় সামাদ নার্সের পা জড়িয়ে ধরে। পাঁচশ' টাকার দু'টি নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করে। অনুনয় করে বলতে থাকে, প্লিজ সিস্টার আমাকে বাঁচান। এই মুহূর্তে আমাকে দুটি প্যাথেডিন ইনজেকশন দেন। নইলে আমি পাগল হবো, এখন ইনজেকশন দিলেই হবে আমাকে। দেখেন শরীর কাঁপছে আমার। হাড়ের ভেতর থেকে শিরশির একটা ব্যথা জেগে উঠছে। এই ব্যথা আরো তীব্র হবে। জীবন কষ্ট হবে। প্লিজ

সিস্টার, কষ্ট থেকে আমাকে বাঁচান। বলতে বলতেই হড়হড় করে বমি করে সামাদ।

সিস্টার ভড়কে যায়। ডিউটি রুমে ফিরে আসে, কর্তব্যরত চিকিৎসককে জানায় ঘটনাটি। একজন মনোচিকিৎসক, মাদকাসক্তি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞকে 'কল' দেওয়া হয়। জরুরী চিকিৎসার পর মনোচিকিৎসক এসে সামাদের এক হাত ধরেন। পালস দেখে পাশের চেয়ারে বসেন। শরীরের অবস্থা জানার পর তিনি সামাদের মনের খবর জানতে চান। সামাদ উত্তর না দিয়ে চুপচাপ থাকে। একটু পর তার চোখে পানি আসে। কিছু সময় চুপ থেকে বলতে শুরু করে তার কষ্টকর জীবনের কথা :

ভালোবেসে বিয়ে করেছে কেয়াকে। বাবা-মার অমতে। কেয়াদের ফ্যামিলিও রাজি ছিল না। ভীষণ কষ্ট করেছে সে। সংসার জীবনের শুরুতে কষ্টটি সামাল দেয়। একটি ভালো চাকরি পেয়ে যায়। এদিকে বিয়ের দুই বছরের মধ্যে মুনমুন এসেছে সংসারে। চাকরির সুবাদে ট্রেনিংয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যায় সামাদ। সুযোগ হাতছাড়া করে নি। জীবনকে বর্ণাঢ্য করার সব প্রেরণায় ছিল কেয়া, মুনমুন। অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায় সে। কলাবাগানে আলাদা বাসা ভাড়া নেয়। যাওয়ার সময় সামাদ তার বন্ধু জামানকে বলে যায় কেয়ার খোঁজখবর রাখতে। এটাই কাল হয়ে দাঁড়ায়। জামানের যাতায়াত বাড়তে থাকে। তলে তলে কেয়া-জামানের সখ্যতা বাড়ে। অস্ট্রেলিয়ায় বসে এসব খবর শোনে সামাদ। কেয়াকে অবিশ্বাস করতে পারে না। তবুও কথাগুলো মন থেকে তাড়াতে পারে না। কষ্ট হতে থাকে। ভীষণ কষ্ট। কেয়াকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। প্রতিদিন ফোনে কেয়ার সঙ্গে কথা হয়। কেয়া কথায় কথায় জামানের প্রশংসা করে। সাংসারিক জীবনে তার বিভিন্ন সহায়তার কথা তুলে ধরে। লুকায় না কিছু। সামাদ নিজে থেকে জামানকে দায়িত্ব দিয়ে এলেও ভেঙে পড়ে মানসিকভাবে। ধীরে ধীরে সে অ্যালকোহলে ডুবে যেতে থাকে সেখানে। এক সময় অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসে সামাদ। যখনই বেডরুমে খাটে শুতে যায় সে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এই খাটে জামান শুয়েছে কেয়ার সঙ্গে। ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে থাকে কেয়া জামানের সঙ্গে এই টেবিলে বসে খেয়েছে। বাথটাবে গোসল করতে যায়, মনে হয় কেয়া এখানে গোসল করেছে জামানের সাথে। কষ্ট ভোলার জন্য সে এক সময় প্যাথেডিন নেওয়া শুরু করে। ড্রাগসেবী এক গ্রুপের সঙ্গে মিশে যায়।

আসলে কি জামানের সঙ্গে কেয়ার অবৈধ সম্পর্ক হয়েছে? জিজ্ঞেস করেন তুমি? মনোচিকিৎসক জানতে চাইলেন।

হ্যাঁ। কেয়া বলেছে অন্তরঙ্গতার কথা। শারীরিক সম্পর্কের কথা বলে নি।

তোমার প্রতি কি কেয়ার ভালোবাসা নেই? কী মনে হয় তোমার?

এখন ও আমার সেবা করছে। ভীষণভাবে কাঁদে আমার জন্য। কেঁদে কী হবে। আমি তো আর আমিতে নেই। নিঃশেষ আমাকে দিয়ে ওর আর কী হবে!

তবুও জানতে চাচ্ছি, কেয়ার ভালোবাসা আছে কি না? কী মনে হয় তোমার?

সামাদ কিছু বলে না। বিশাল শূন্যতায় ডুবে থাকে তার দুটি। অসহনীয় জীবনের সব কিছু অর্থহীন তার কাছে। ব্রেইনের কোষে ভালোবাসার স্মৃতি নেই। স্নায়ুকোষগুলোর গ্রাহকযন্ত্র এখন দখল করে আছে মাদকের নেশা। মাদকের টান। মাদকের উন্মাদনা। কেয়ার ভালোবাসা নিয়ে ভাবতে পারে না আর। তবুও শুমড়ে কেঁদে ওঠে সামাদ, পাশে বসে কাঁদতে থাকে কেয়া।

ছোট্ট মুনমুন হেলে-দুলে হেঁটে আসে। মায়ের চোখের পানি মুছে দেয়। আধো আধো বোল তার মুখে 'কেঁদো না মাম্মি, কেঁদো না প্লিজ।'

জীবনের গল্প-২ ঃ নষ্ট মেয়ে।

আমি শান্তি (ছদ্মনাম)। আমার বয়স ২২। আমি ব্রাউন সুগার মানে হেরোইনে অভ্যস্ত। আমার একটি মেয়ে আছে। মেয়েটির নাম সবুজ। প্রকৃতির গাছপালা যেমন সবুজ আমার মেয়েটি তার চেয়েও বেশি সবুজ। সতেজ। কিন্তু আমি অযোগ্য মা। কারণ হেরোইন ছাড়া আমার চলে না। সবাই আমাকে বাজে মেয়ে বলে। নষ্ট মেয়ে বলে। আমি বাজে কি না জানি না। নষ্ট কি না জানি না। তবে জানি আমি হেরোইনখোর। হেরোইন না পেলে দেহে মাতম ওঠে। অসহ্য কষ্ট বয়। পেশিতে, হাড্ডিতে পিন ফুটানোর মতো ব্যথা হয়। ছুরির ফালা দিয়ে মাংসে টান দিলে যে ব্যথা, এই ব্যথা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। হেরোইন নিলে আমার ভেতর আনন্দের জোয়ার আসে, পুরো দেহে উষ্ণতা ধেয়ে বেড়ায়। রিলাক্স থাকি আমি। উদ্বেগ, বিষাদ, কষ্ট কিংবা ব্যথা তখন আমাকে ছুঁতে পারে না। পূর্বের ডোজে এখন চলে না আমার। মূল অ্যাকশন পেতে পুরিয়ার মাত্রা বাড়াতে হচ্ছে। দিন দিন মাত্রা বেড়েই চলেছে। আমি নিকট জন সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। আর নিকট জনই বা কে আমার। কেউ নেই সবুজ ছাড়া। একজন অবশ্য আছে যে আমার ভালো চায়। এখন মাদকখোর এক সার্কেলের সঙ্গে মিশে গেছি। ওদের ছাড়া চলে না। আমাদের কাজই হচ্ছে হেরোইন জোগাড় করা। বসে বসে টানা। যখন ভালো থাকি ছুটে যাই সবুজের কাছে। সবুজ আমার বোনের বাসায় থাকে। ওর বাবা ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। যখন আমি গর্ভবতী, ওর বাবা মাদে

আমার ভালোবাসার স্বামী আমাকে সন্দেহ করা শুরু করে। বলে এই সন্তান তার না। বলে ভ্রূণটি নষ্ট করে দাও। আমি রাজি হই নি। কারণ সবুজ আমার ভালোবাসার ফসল। ওর বাবাই আমার ভালোবাসার মানুষ। মিথ্যে সন্দেহের কারণে কেন আমি ভ্রূণটি নষ্ট করবো? নষ্ট করি নি।

নিজের ভেতর তিলে তিলে বেড়ে উঠেছে সবুজ। সবুজের জন্ম হয়েছে অনাদরে, অবহেলায়। ওর বাবা আমাকে ছেড়ে গেছে। পাড়ি জমিয়েছে স্বপ্নের দেশ আমেরিকায়। শুনেছি সে আবার বাংলাদেশী এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমি দেশে পড়ে আছি। ওর বৈধ স্ত্রী আমি। আমার খোঁজ নেয় না। সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে না। এই পাষণ্ড অবিশ্বাসী স্বামীটি সবুজের বাবা। আমার স্বামীকে ঘৃণা করি আমি। সবুজের বাবা হিসেবে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কারণ ওই সময় তার মমতার কোনো ঘাটতি ছিল না। তবুও রাগ হয় আমার। সবুজ বড় হলে কী বলবো তাকে। ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে যাই। হেরোইন নিলে সব চিন্তা মাথা থেকে উবে যায়। শান্তি। উম শান্তি! হেরোইনই পারে সব শান্তি ফিরিয়ে দিতে। আর একটি কথা বলে রাখি, আমি খুবসুরত লাড়কি। সবাই আমার দেহের দিকে তাকায়। দেহের রঙ মেটে হয়ে গেলেও দাম কমে নি। সবাই তাকায়। সুযোগ পেলে পেতে চায়। আমার নেশাখোর বন্ধুদের অবশ্য এদিকে ঝোঁক নেই। তাদের মজা হেরোইনে। হেরোইনের টাকা জোগাড় করতে ওরা আমার দেহ বেচতে চায়। এর-ওর কাছে পাঠাতে চায়। আমি রাজি হই না। কারণ দৈহিক ক্ষুধা আমার নেই। মরে গেছে সেই ক্ষুধা। পুড়ে গেছে। অঙ্গার হয়ে গেছে। শরীর বেচে টাকা জোগাড়ের খায়েস আমার নেই।

অনেক জ্বালার মাঝেও দেহটাকে আমি রক্ষা করে চলি, আমি সবুজের মা। এই বোধটি আমার ধ্বংস হয়ে যায় নি। তবে আমাদের দলে আরো কয়েকটি মেয়ে আছে। তারা টাকা রোজগারের জন্য নয়, হেরোইন পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে পাজেরো গাড়িতেও চড়ে বসে। ভালো মাল জোগাড় করে। খেয়ে আমরা ভালো থাকি। ভালো থাকার জন্যই তো হেরোইন চাই। ভদ্রলোকেরা বলে আমরা খারাপ।

এদের মধ্যে একজন আমার বাবা। একজন আমার বাবার ছোট বউ। একজন আমার আপন মা। একজন আমার আপন মায়ের দ্বিতীয় স্বামী। যখন আমার বয়স পাঁচ, আমার বোনের বয়স সাত, তখন বাবা-মা'র ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

ছোটবেলার যতোটুকুন মনে পড়ে, বাবা-মা ঝগড়া করতো। মারপিট করতো। অশান্তি। অশান্তির বুনিয়াদ নিয়েই আমি বড় হয়েছি।

বাবা আবার বিয়ে করে। মা আবার বিয়ে করে। আমাদের দু' বোনের স্থান জোটে নানার বাড়িতে। কুকুর-বেড়ালের মতো বড় হয়েছি।

একটু দুরন্ত ছিলাম শৈশবে।

মামারা মারধর করতো, মামীরা নির্যাতন করতো। বাবা হঠাৎ একদিন এসে নিয়ে গেল দু' বোনকে। আদর করতো বাবা। বাবার আদর পেয়ে কী যে ভালো লাগতো। না, সেখানেও বেশিদিন থাকা হতো না। সৎ মায়ের নির্যাতন চলতো এবার। সেই নির্যাতন সয়ে উঠার মতো নয়। দু' বোন আবার পালাতাম। নানার কাছে ফিরে আসতাম।

কখনো কখনো আপন মা এসেও আমাদের নিয়ে যেত। সেখানেও সমস্যা। আমার সৎ বাবার শ্যেনদৃষ্টি। বড় বোনের প্রতি তার অশুভ চাহনি। অশুভ হাত বাড়াতো আমার উঠতি বয়সী বোনটির প্রতি। আমি দস্যি টাইপের ছিলাম। আমাকে ভয় পেতো। একদিন বোনের প্রতি হাত বাড়ানোর কারণে লাঠি দিয়ে সৎ বাবাকে আঘাত করেছি। মা, আমার মা, না বুঝে আমাদের মেরে নানার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। মাও সুখী ছিল না। অসুখী ছিল। কাঁদতো। আমি সবুজের তেমন মা হতে চাই নি। সুখী হতে চেয়েছি। সুখ আমার কপালে সয় নি। কোনো বাড়িই আমার আপন মনে হতো না। নানার বাড়ি না, বাবার বাড়ি না, মার বাড়ি না। সবখানে ছিলাম পরগাছা। সবার কাছে পর। সবার কাছে মেহমান। উহ! কষ্ট! মাগো এতো কষ্ট দিয়ে কেন জন্মালে আমাদের! বলে বলে কাঁদতাম।

নানার বাড়িতে আসার পর আবারও অশান্তি।

আমার এক খালার বাচ্চা হচ্ছিল না। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। খালু আমাকে মেয়ের মতো মমতা দিয়েছেন। দেরিতে হলেও পড়ালেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই সুখও আমার সইল না। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় খালু মারা গেলেন। খালাকে নিয়ে আমরা আবার ফেরত এলাম নানার বাড়িতে। নানার বাড়িতে থেকে এবার সাহসী হয়ে উঠলাম। মামীদের কঠোর চোখ এড়িয়ে ইন্টার পাস করলাম। তারপর পাড়ার এক সুবোধ ব্রিলিয়ান্টের সঙ্গে ভালোবাসায় জড়িয়ে গেলাম। বিয়ে করলাম। সবুজের মা হলাম। সেই ব্রিলিয়ান্টও আমাকে ছেড়ে গেল। আমি কোথায় যাবো! কেউ নেই আমার। বোনটির ভালো বিয়ে হয়েছিল। স্বামীটি ভালো। আমাকে কখনো জোগায় নি। তবে মনে হয় আমার বোনটি সুখে নেই। কার জন্য নেই, আমার জন্য?

হতে পারে, হেরোইনখোর বোন যার আছে, সে কীভাবে সুখী হয়। তার দিকে চেয়ে আমি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছি বললে ভুল হবে।

সবুজের জন্য আমি ভালো হতে চাই। ভালো মা হতে চাই। আমি কি ভালো মা হতে পারবো? আমি কি সবুজকে মানুষ করতে পারবো? সবাই আমাকে নষ্ট বলে বলুক। সবুজ বড় হয়ে আমাকে নষ্ট বলবে না তো? আসলে কি আমি পচে গেছি? শেষ হয়ে গেছি? আপনারা কি আমাকে নষ্ট মেয়ে উপাধি দেবেন? ভালো মা হওয়ার সুযোগ দেবেন না?

মাদকাসক্তি ঃ পুনরাসক্তি প্রতিরোধের উপায়

মাদক গ্রহণের ইচ্ছায় আচ্ছন্ন থাকে একজন মাদকাসক্তের মন। মাদক গ্রহণের মুর্নিবার একটি ইচ্ছা সব সময় তাড়া করে ফেরে। যে কোনো উপায়ে মাদকদ্রব্য পাওয়ার চিন্তা গ্রাস করে সব কাজের গতি-প্রকৃতি। মাদক গ্রহণের মাত্রা বাড়ানোর প্রবণতা বাড়তে থাকে দিন দিন। মাদকের ওপর মানসিক নির্ভরতা প্রকট হয়ে ওঠে। মাদক ছাড়া দেহ চলে না, মন চলে না। মাদক গ্রহণ বন্ধ হলে প্রত্যাহারজনিত তাৎক্ষণিক ভয়াবহ যাতনা বাড়ে। এই যাতনায় দেহমনে উপসর্গের জোয়ার আসে। ব্যক্তিজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পারিবারিক সম্পর্ক বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বাড়তে থাকে সামাজিক সংকটও।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া মাদকাসক্তির ব্যাখ্যাটা এ রকমই।

তীব্র একটি আকাঙ্ক্ষা মাদকসেবীর মস্তিষ্কে আসন গেড়ে বসে। মাদক গ্রহণের সময় এই আকর্ষণ বা টান যেমন থাকে বেগবান, মাদক ছাড়ার পরও এই টানে ব্রেইন থেকে সিগনাল আসে। মাদক প্রত্যাহারজনিত উপসর্গে মুক্তি ঘটার পর তীব্র টানে ভাটা পড়তে পারে। বন্ধ হতে পারে বেগবান ইচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছেটি সমূলে বিনাশ হয়ে যায় না। মাদক গ্রহণের বিশেষ স্থানে গেলে, বিশেষ বন্ধুদের দেখলে এবং সিরিঞ্জ হাতে পেলে দানবীয় ইচ্ছেটি আগের মতোই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। অন্তর্গত অবস্থা, যেমন– ডিপ্রেশনও ইচ্ছেটি জাগিয়ে তুলতে পারে।

যে ট্রেগারপটগুলো তীব্র ইচ্ছেটি জাগিয়ে তোলে, ধীরে ধীরে সেগুলোর মুখোমুখি হতে হবে। এ সময় প্রয়োজন সুদৃঢ় সমর্থন। সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে ধীরে ধীরে ইচ্ছেটির তীব্রতা কমানো যায়। এমনকি ক্রেভিং বা প্রবল আকর্ষণের কারণগুলো ভেতর থেকে নিষ্ক্রিয় করা যায়।

মাদক ছেড়ে দেওয়ার পরিপূর্ণ মোটিভেশনের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করা সহজ হয়। 'পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাহারই' দ্রুত এবং নিশ্চিতভাবে ক্রেভিং নিষ্ক্রিয় করার জন্য ভেতর থেকে শক্তি জোগায়।

লাইফ স্টাইল পাল্টানোর প্রয়োজন রয়েছে। নতুন বন্ধু পেলে ভালো হয়।

বিশ্লেষণ করার কৌশল রপ্ত করে জীবনের ব্যর্থতা এবং হতাশাগুলো মোকাবিলা করতে হবে। নিজেকে বিনোদনমূলক, সৃজনশীল কিংবা উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করা গেলে ক্রেভিং শাসন করা সহজ হতে থাকে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কিংবা শাসনের যথাযথ শক্তি ধীরে ধীরে অর্জিত হয়। প্রয়োজন অন্যের সমর্থন এবং পরামর্শ।

আসক্তি বা পুনরাসক্তি জন্মালে আসক্তজনের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা দেখানো চলবে না। মারধর কিংবা জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া মোটেও উচিত নয়। আসক্তি থেকে মুক্তির জন্য লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে। অভিভাবকদের ভুলে গেলে চলবে না। সবার সাপোর্ট এবং গাইডেন্স ছাড়া 'দানবীয় ইচ্ছে' থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। রুপকের মাদক মুক্তির জন্য পুরো চিত্রটি মনে রাখতে হবে মা-বাবাসহ সবাইকে।

চিকিৎসার পর মাদক ছেড়ে দিয়েছে, দীর্ঘদিন মাদক গ্রহণ করে নি। কিন্তু আবার মাদক নেওয়া শুরু করেছে। এমন অবস্থাকে বলে পুনরাসক্তি। এটি একটি প্রক্রিয়া। এ চলমান অবস্থাটি বিশেষ সময়ে থামিয়ে দেওয়া যায়, বদলানো যায়, বিনাশও করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বারবার আসক্ত হওয়ার পেছনে রয়েছে নিজের মধ্যে গেড়ে বসা অনড় এবং স্থায়ী কিছু মনোভাব, নিজস্ব মূল্যবোধ এবং 'থট প্রসেস' বা নিজস্ব চিন্তনের দুষ্টচক্রের প্রভাব।

পুনরাসক্তির প্রথম ধাপেই চিন্তনে পরিবর্তন আসে। 'চিন্তা' হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই স্তম্ভে মাদকনির্ভরতার সময়কার পুরনো চিন্তাগুলো জেঁকে বসে। অর্থাৎ, সে অনবরত ট্রাগস নেওয়ার দিনগুলোর কথা ভাবতে থাকে। লাইফ স্টাইল আবার বদলাতে থাকে। মাদকসেবী বন্ধুর সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করতে থাকে। এটি হচ্ছে পুনরাসক্তির দ্বিতীয় ধাপ। এই ধাপে মাদকাসক্তদের আড্ডায় যাওয়া-আসা শুরু করে এবং মাদক গ্রহণকালের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেলে।

তৃতীয় ধাপে পুনরায় মাদক নেওয়া শুরু করে। অথবা বিকল্প ট্রাগসে আসক্ত হতে থাকে।

দেশে সফল চিকিৎসার পর কয়েক জনকে বিদেশে পাঠানো হয়। বিদেশে গিয়ে তারা অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে দেশে ফেরে। এ ক্ষেত্রে অ্যালকোহল হচ্ছে বিকল্প মাদক। বিদেশে একই মাদকে আসক্ত না হলেও দেশে ফিরে আবার তারা পুরনো বোতলে মুখ ডোবায়। আবার আসক্ত হয়ে যায়।

পুনরাসক্তির কারণ নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

ড্রাগসের কাছে থাকা, সামনে থাকা। মাদকাসক্ত সঙ্গীর সঙ্গে মেলামেশা করা, কিংবা অতীতের মাদক গ্রহণের স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকা।

নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন- ক্রোধ, বিষাদ, একাকিত্ব, অপরাধবোধ, ভীতি কিংবা উদ্বেগের জালে সেঁটে থাকা।

কাউকে সেলিব্রেট করার ইতিবাচক অনুভূতিতে একদিনের জন্যও মাদক গ্রহণ করা।

দৈহিক উপসর্গ, যেমন- ব্যথা, জ্বালা-যন্ত্রণায় ভোগা।

ক্লান্তি বা এক ঘেঁয়েমিতে থাকা।

হঠাৎ হাতে প্রচুর টাকা চলে আসা।

পুরো ভালো হয়ে গেছি। এক-দু'বার নিলে এমন আর কী হবে- এ ধরনের আত্মবিশ্বাসের ফাঁদে পা দেওয়া।

প্রয়োজন আসক্তজনের প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণের জন্য নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।

মাদকাসক্তকে 'ক্রেভিং' মোকাবিলার জন্য দক্ষ করে তুলতে হবে। 'টান' এড়িয়ে চলার শক্তি অর্জনের মাধ্যমে সফলতার দিকে এগোনো যায়। ভালো বন্ধু তৈরিতে সাহায্য করতে হবে। নতুন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে গাইড করতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে। উপন্যাস চিত্রে আমরা দেখেছি রূপকের ভালো বন্ধু অনিকরা তার পাশে এসে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা করছে। মনা সাহসের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভালো বন্ধুদের সান্নিধ্য বাড়াতে হবে। আসক্তি এবং পুনরাসক্তি প্রতিরোধে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

নেশাগ্রস্ত বন্ধুদের এড়িয়ে চলা সহজ নয়। এদের এড়িয়ে চলতে হবে। এভাবে আসক্তিমুক্ত জীবন বজায় রাখা সম্ভব।

স্মরণ করিয়ে দিতে হবে- অনৈতিক জীবনে অভ্যস্ত বন্ধুরা ফাঁদে ফেলে তাকে আবার ওই পথে টেনে নিতে পারে। এ ধরনের বিপজ্জনক বন্ধুদের টেলিফোনে যোগাযোগ কিংবা বাসায় আসা-যাওয়ার বিষয়টি প্রতিরোধ করার শক্তি ঢুকিয়ে দিতে হবে রিকভারি ব্যক্তির মধ্যে।

জীবনের স্বাভাবিক বিনোদনের পথগুলো সেরে উঠতে থাকা মানুষটির সামনে তুলে ধরতে হবে। মনে রাখা জরুরি, নেশার সময় মাদকই বিনোদনের প্রধান উৎস হিসেবে ব্রেইনে আসন গেড়ে বসে। এই অস্বাভাবিক বিনোদন পাওয়ার শেকড় উপড়ে ফেলতে হলে সহজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে তাকে নতুন

বিনোদন পাওয়ার পথ উন্মোচন করে দিতে হবে। এ ধরনের বিনোদন না পেলে নিজের অজান্তে সে আবার একঘেঁয়েমিতে ডুবতে পারে, নেশার বিনোদনের দিকে ছুটতে পারে। পারিবারিক প্রেক্ষাপট যদি বিনোদনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে, বেশি দূর ছুটতে হয় না কাউকে। মনে রাখা জরুরি, যে ধরনের বিনোদনের সঙ্গে নেশার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ থাকে, যেমন- জুয়া ইত্যাদি এড়িয়ে চলতে হবে।

মানসিক চাপে পড়লে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। দৈহিক যন্ত্রণা এবং মনোযাতনায় ভুগলে তারা সহজে ভেঙে পড়ে। এই অবস্থাগুলো সফলতার সঙ্গে মোকাবিলা করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। রূপক মানসিক কষ্ট সইতে পারে নি। মাদকের সাথে সখ্যতা করে কষ্ট ভুলতে চেয়েছে। ভুল পথে পা বাড়িয়ে আসক্ত হয়েছে পুনরাসক্তি রোধের সময় বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে।

রিকভারিকে নিজস্ব মূল্যবোধ এবং আত্মমর্যাদার ব্যাপারে সচেতন করে দিতে হবে। নিজস্ব মূল্যবোধে ঘাটতি হলে আত্মমর্যাদাবোধেও ধস নামে, হীনম্মন্যতায় ভোগে। এ অবস্থায় নিজের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় না। যে কোনো অশুভ শক্তিকে মোকাবিলার সামর্থ্য কমে যায়। সহজে প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। নিজেকে যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাবোধ বাড়াতে হবে। 'না' বলার শক্তি এভাবে অর্জন করা সম্ভব।

উপরের বিষয়গুলো অর্জনের জন্য রিকভারি ব্যক্তিকে নিয়মিত ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং সেশন কিংবা গ্রুপ থেরাপি সেশনে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই সেশনগুলোতে যে কোনো 'সংকট' নিয়ে আলোচনা করা হয়। ইতিবাচক অর্জনের মাধ্যমে অতীতের গ্লানিকর জীবনের কালো পর্দা সরিয়ে মন আলোকিত রাখা সহজ হয় তখন।

আসল কাজটা পরিবারের মনে রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে।

সন্তান মাদক ছেড়ে দিয়েছে। চিকিৎসার পর ভালো আছে। তারপরও পারিবারিক প্রেক্ষাপটে ক্ষতিকর কিছু সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

এ ক্ষেত্রে প্রথম কারণ হচ্ছে সন্দেহ, অবিশ্বাস। দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয় সন্তানের চারপাশে। কড়া চোখে রাখা হয়। এদিক-ওদিক সামান্য অনিয়ম ঘটলেই আক্রমণের শিকার হয় সন্তান। অবাস্তব অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা লক্ষ্য থাকে। এই লক্ষ্য অর্জন করার সম্ভব হয় না। ফলে বকাঝকা, মারধর, গালাগালি চলতেই থাকে। এ ধরনের সংকীর্ণতায় কোণঠাসা হয়ে পড়ে রিকভারি ব্যক্তি। এর প্রধান কারণ-

পরিবারের সদস্যরা জানেন না কীভাবে এদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। মূল বিষয় হচ্ছে সন্দেহ, অবিশ্বাস।

আগে আর দেখা যায় নি, এমন একটি সমস্যায় ডুবে যেতে পারে পরিবার। কীভাবে মোকাবিলা করবে তাও বুঝে উঠতে পারে না তারা।

এখানে মনে রাখা দরকার, সন্তান ভালো হওয়ার চেষ্টা করছে, সংগ্রাম করছে। অযৌক্তিক সন্দেহ তার সেই প্রচেষ্টায় আঘাত করতে পারে, ভেঙে পড়তে পারে সে। তার মনে হতে পারে, ভালো থেকে লাভ কী! এমন ভাবনা পুনরায় ক্ষত জাগিয়ে তুলতে পারে।

এ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের আসক্তির ব্যাপারে 'জ্ঞান' নিতে হবে।

বিশ্বাস দিয়ে শুরু করতে হবে। পরিবারের সদস্যরা তাকে বিশ্বাস করছেন, এমন মর্যাদা নিজের মনে স্থান পেলে বিশ্বাস রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে, নেশা পুনরায় শুরু করলে লুকোতে পারবে না, ধরা পড়বে এবার সতর্ক চোখের সামনে। ধরা পড়লে তাকে সরাসরি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা যেতে পারে। সেরে উঠতে থাকা ব্যক্তির ভালো কাজের প্রশংসা করতে হবে। প্রশংসা তার আত্মবিশ্বাসকে সুসংহত করবে। তাকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। আলাপচারিতার পরিবেশ সহজ রাখতে হবে। নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে হবে। তবে খোঁজখবর নেওয়ার অর্থ এই নয়, গোয়েন্দাগিরি করা। কোনো ভালো কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। মন খুলে তার কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। এ অবস্থায় সন্তানের সঠিক খাবারের প্রতি নজর দিতে হবে। সুষম খাবার, পানি এবং মনোচিকিৎসকের পরামর্শ মতো নিয়মিত ওষুধ সেবনের ব্যাপারে দায়িত্ব রাখতে হবে। কাউন্সেলিং সেশনে অংশ নিতে হবে।

চিকিৎসা শেষ হতে না হতেই বিয়ের জন্য ঝাঁপ দেওয়া উচিত নয়। 'বিয়ে' তাকে চাপে ফেলে দিতে পারে। বিষাদ ঘনিয়ে উঠতে পারে তখন। অতীতের কোনো ভুলভ্রান্তি নিয়ে রিকভারি সন্তানটিকে দোষ দেওয়া চলবে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে, ব্যক্তির দাবি পূরণের ব্যাপারে সংযত হতে হবে। হাতে যেন টাকাপয়সা সহজে চলে না আসে, খেয়াল রাখতে হবে।

মাদকাসক্ত থেকে সদ্য সরে এসেছে এমন সন্তানকে সামাজিক দক্ষতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং চাপ সামলানোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে পুনরায় আসক্ত হওয়ার পথ বন্ধ করা যায়। মানসিকভাবে পুনর্বাসন করা সম্ভব। সম্ভব আয়-রোজগারের ব্যবস্থাও।

বিশ্বে এবং দেশে সাম্প্রতিক সফলতা চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ
পুনরাসক্তি প্রতিরোধে 'মেডিসিনাল ইমপ্লান্ট' ৯৫-৯৮ শতাংশ সফলতা দিচ্ছে।

মাইনর সার্জারির মাধ্যমে ত্বকের নিচে এটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ৩ থেকে ১২ মাসব্যাপী এটি ব্যবহার করে মস্তিষ্কের মাদক গ্রহণের সংকেত প্রতিহত করে সফলতা অর্জন সম্ভব। অত্যন্ত ব্যয়বহুল চিকিৎসাটি এখনো জনপ্রিয়তা পায় নি। মুখে খাবার বড়ি হিসেবে একই ওষুধ বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ব্যতীত এটির ব্যবহারে নিষিদ্ধ রয়েছে। এটি ব্যবহারের সময় পরিবারের সদস্যদের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। প্রয়োজন নিয়মিত বিশেষজ্ঞ মনোচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ। এই 'রকার' (মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের গ্রাহক যন্ত্র থেকে মাদক গ্রহণের যে সংকেত আসে সেটি আসার পথ বন্ধ করে) চলার সময় মাদক গ্রহণ দেহের জন্য ক্ষতিকর। কোনো কারণে মাদক খেয়ে ফেললে দ্রুতই চাপে ফেলে বন্ধ করে দিতে হবে। বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সম্ভব পুনরাসক্তি রোধ করা। ২৬ জুন, ২০০৪ সালে 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসের' প্রতিপাদ্য ছিল 'মাদকাসক্তি ঃ চিকিৎসায় মুক্তি'। ২০০৫ সালে এই দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'নিজেকে মূল্যায়ন করুন : মাদকমুক্ত জীবন গড়ুন।' ২০০৪ সালের প্রতিপাদ্যের সফলতা বর্তমানে সারা বিশ্বে অনেক হতাশার মাঝেও আশার আলো ছড়াচ্ছে।